প্রথম সংস্করণ
ফেব্রুয়ারী ১৯৬০

প্রকাশক
তপন মুখোপাধ্যায়
সৃজন পাবলিকেশনস্
৭বি, লেক প্লেস
কলিকাতা-২৯

মুদ্রণ :
সনাতন হাজরা
প্রভাবতী প্রেস
৬৭, শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলিকাতা-৬

পিতৃদেব ৺প্রসন্নকুমার দাসের
স্মৃতিতে

সূচীপত্র

ভূমিকা

বিপ্লবের ইতিকথা লেখার কোন পরিকল্পনা ছিল না আমার। আমার পক্ষে বিপ্লবের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা সম্ভবও নয়। এ দায়িত্ব ইতিহাসবিদেরাই সমাপন করবেন।

ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিকথা খুব বর্ণাঢ্য। উনিশ শতকের শেষার্ধে যার সূচনা, মহারাষ্ট্রের কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনায়। এরপর বিংশ শতাব্দীর সুরুতেই আকর্ষণ করে বাংলার ঘটনাবলী, বাংলার বিপ্লবী সমিতির অসমসাহসিক কর্মকাণ্ড সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৯০২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় অনুশীলন সমিতি—বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্বের অনুসরণে এই সমিতির আদর্শ হয়। তখনো কংগ্রেস শুধুমাত্রই এক সংগঠন, এর ভেতর জাতীয় আন্দোলনের গতিবেগ সৃষ্টি হয়নি, হয়নি পূর্ণ স্বাধীনতালাভের উচ্চাকাঙ্খা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের চার বছর পূর্বে সৃষ্ট এই বিপ্লবী দল কংগ্রেসের বিকল্প শক্তি হিসাবে জন্ম নিল। কোন্ কোন্ সামাজিক শক্তির জোরে এর সৃষ্টি, তৎকালীন সামাজিক শক্তি বিন্যাসের প্রকৃতি কী ছিল যার অভিঘাতে এই সংগ্রামী নবধারা গতি পেল? এ প্রশ্ন ইতিহাসের যেমন, আমারও। ব্যক্তিগত অভিব্যক্তিতে এর উৎস সন্ধানে প্রয়াস করেছি।

অনুশীলন সমিতি থেকেই সৃষ্ট হয়েছিল পুলিন দাসের মত সার্থক সংগঠক, মানবেন্দ্র নাথ রায়ের মতো তাত্ত্বিক, বাঘা যতীনের মতো বীর সংগ্রামী। এই সৃজনশীল পার্টির অভ্যুত্থান ও প্রসার ঐতিহাসিকের গবেষণার বিষয়বস্তু, সন্দেহ নেই। আমি এর প্রথম অধ্যায়ে প্রত্যক্ষ যুক্ত ছিলাম না। নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলাম ১৯২১ থেকে। আমার অনুধ্যান এই পর্ব থেকেই। এ কোনো ইতিহাস রচনা নয়, তৎকালীন সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের রেখাচিত্রনমাত্র। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ তথ্য জানার সূত্রে বিপ্লবী আন্দোলনের দর্শন ও কার্যধারা বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি। যেসব নীতি ও কৌশল নিয়ে মনে প্রশ্ন উঠেছে, তার উত্তর খুঁজেছি নেতাদের কাছে, দলের কাজে। সেই হিসাবে এ রচনাকে ঐতিহাসিক পর্যালোচনা আখ্যা দেওয়া হবে কিনা জানি না।

বিপ্লবীদের অসাধারণ নিষ্ঠা, ত্যাগ, তিতিক্ষা অতুলনীয়, সর্ব যুগে সমাদরের যোগ্য। মহাত্মা গান্ধী এঁদের বলেছিলেন, 'তোমাদের মতো কর্মী পেলে বিশ্ব জয় করতে পারতাম, কিন্তু তোমরা আমার সাথে এলে না!' ভারতবর্ষের

ইতিহাসে এইসব মৃত্যুঞ্জয়ী কর্মীদের অবদান, স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা পরিচালনায় এদের কতটা সাফল্য, কতটা ব্যর্থতা, তার ঐতিহাসিক মূল্যায়ণ প্রয়োজন। সেইজন্যই প্রয়োজন বিপ্লবী আন্দোলনের নৈর্ব্যক্তিক অনুধাবন, নির্মোহ সমালোচনা। বিপ্লবীরা সে কাজ করতে পারেন নি। বন্দী জীবনের কাহিনী আমরা পড়েছি, পেয়েছি বহু নেতার দলগত কাহিনীর উপস্থাপনা। কিন্তু ইতিহাসের পর্যালোচনায় তার স্থান কতটুকু? ইতিহাস রচনায় সেসব উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হবে হয়ত, কিন্তু প্রকৃত মূল্যায়নে আপন কর্মগাথা বা দলীয় কাহিনী যথেষ্ট নয়। এসব নানা কথা ভেবেই এই গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হই—পাঠক ইতিহাসবিৎ পরবর্তী প্রজন্মই বিচার করবে এর যথার্থতা।

বিপ্লবী দলে যোগ দেওয়ার সময় থেকেই আমার কাহিনী সুরু, কয়েকটা পর্বে স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘটনাবলীর মাধ্যমে আন্দোলনের ও নেতৃত্বের কার্যধারা তুলে ধরেছি। ঘটনার একজন হয়ে জাতীয় আন্দোলনের নানা ধারা—বিপ্লবী সমিতিসমূহ, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ, বাংলার নানা ধারা, সুভাষ কেন্দ্রিক ঘটনাক্রম, কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট, নেহেরুর ভিন্নমুখী ব্যক্তিত্ব, গান্ধী সুভাষ মতানৈক্য, ৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন, কংগ্রেসে দক্ষিণ পন্থীদের দাপট, কম্যুনিষ্টদের ভূমিকা, আর এস· পি· র উদ্ভব, দাঙ্গা ও দেশভাগ, ক্ষমতা লাভের জন্য পিছনের দরজা দিয়ে বৃটিশের সাথে বোঝা পড়ার প্রয়াস, এইসব কিছুর অনুধ্যানের প্রয়াস পেয়েছি।

এই গ্রন্থের মূল পুঁথি আরো বড় ছিল। কেননা অতীত তোলপাড় করে বহু রোমাঞ্চক ঘটনা ভেসে উঠেছে স্মৃতিপটে। সম্পাদকের কাঁচির সামনে হয়ত তার অনেকই অপ্রাসঙ্গিক হিসাবে পরিত্যাজ্য হয়েছে, কিছু পুনরুক্তিও যথার্থভাবে বাদ গেছে। তরুণ বন্ধু ডঃ সজল বসু এই দায়িত্ব পালন করেছেন তার স্বভাবজ কৃতিত্ব সহকারে। বই প্রকাশনা ও মুদ্রনে তরুণ প্রকাশক তপন মুখোপাধ্যায়ের নিরলস প্রয়াস তারিফযোগ্য। সর্বোপরি আন্তরিক ঋণ স্বীকার করি আমার নেতা ও সহকর্মী প্রয়াত জয়প্রকাশ নারায়ণের কাছে। অসুস্থ অবস্থায় তিনি আমার এই গ্রন্থ পুঁথির সব শুনে ছোট একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। কানাই সরকার এবং র‍্যাডিয়ান্ট প্রসেসের নীরোদ মুখার্জীর সহযোগীতা উল্লেখযোগ্য।
বন্ধুদের উৎসাহদানে ও অক্লান্ত চেষ্টায় বইটি প্রকাশের আলো দেখে।

নরেন দাস

১৯৩৯ সালের এক জনসমাবেশে ভাষণরত নেতাজী
এবং তাঁর বাঁদিকের সামনে বসে লেখক।

এক ঃ ইতিহাসের ছিন্ন পাতায়

এক সৃজনশীল যুগে আমার জন্ম। সমাজের জঠরে নবজাতকের আবির্ভাবের লগ্নে গৌরবান্বিত সে যুগ। আমি তখন সবেমাত্র কিশোর। তখনকার সামাজিক মন্থন আমারও চিত্তে গভীর রেখাপাত করে। সেদিন সমাজে যে জোয়ার আসে আমিও সাঁতার কেটেছি তার পুণ্য স্রোতে। থামিনি কখনও। তখন সমাজজীবন ছিল ঘটনাবহুল, তবে সব ঘটনা মনে নেই আমার। কারণ, সকল ঘটনাই রেখাপাত করেনি আমার চিত্তে। যা রেখাপাত করেছে তা আজও আমার চিত্তে অম্লান। সেইসব ঘটনা আমার ব্যক্তিগত সামগ্রী নয়, তা সমগ্র সমাজের। সেদিন যেসব ভাবনা দেশের চিত্ত মন্থন করে হংস বলাকার মতন পাখা মেলে দেশের প্রাণে সাড়া জাগিয়েছে, তা ইতিহাসের সম্পত্তি হোক। সেই সব ঘটনাই এই পুঁথির বিষয়বস্তু। যুগান্তকারী যেসব অধ্যায়ের আলোচনা এই বইয়ে স্থান পেয়েছে তা আমার পরিণত মনের জারক রসে রঞ্জিত। সুতরাং বিশ্লেষণে ফাঁক থাকবে না তা নয়, থাকতেই পারে।

বিপ্লবী দলের সভ্য আমি। এই পুঁথিতে স্বভাবতই বিপ্লবীদের কথা স্থান পেয়েছে বেশী। কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন রাজনীতির মৌল ধারা থেকে আলাদা কিছু নয়, তাই পারস্পরিক সম্বন্ধ খোঁজ করেছি সর্বদা। এ আমার বিপ্লবের কাহিনী বা বিপ্লবীর জীবনকথা নয়। আত্মজীবনী অনেকে লিখেছেন। লিখেছেন কারাজীবনের কথা। কেউ লিখেছেন বিপ্লববাদের কাহিনী। কেউবা আপন দলের কথা। এরই সংগে অন্য দলের নিন্দার কথা। এ সকল প্রকাশনা আপন প্রতিভায় ভাস্বর। ওদের নিশ্চয়ই স্থান আছে—কিন্তু তা ইতিহাস নয়।

সবচেয়ে অসুবিধা, বিপ্লবী দল কঠোর মন্ত্রগুপ্তির দ্বারা সুরক্ষিত। সমগ্র ইতিহাস ব্যক্তি বিশেষের জানা নেই। অতএব সে তথ্য পরিবেশন করা অসাধ্য। অন্যের কাছ থেকে শোনা কথার বিপদও অনেক। লোকমুখে শোনা কথার রঙ বদল হয়। গোপন কাজের বেশী সাক্ষী থাকে না। সে কাহিনীর সত্যাসত্য বিচার করাও শক্ত। প্রকাশ্য আন্দোলনের সে অসুবিধা নেই। তার সব কিছুই খোলাখুলি আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত হয় সকলের

উপস্থিতিতে। তার রেকর্ড থাকে। সে রেকর্ডের যতিচিহ্নটি বদল করা শক্ত। সুতরাং সে বিশ্লেষণ সহজসাধ্য।

ইতিহাস এক বিচিত্র সামগ্রী। সে চলার পথে অনেক কিছু গ্রহণ করে। আপন করে নেয়। আবার পথ বেয়ে বেয়ে বর্জনও করে অনেক কিছু। যা বর্জন করে তা একদিন প্রকৃত ঘটনা ছিল—হয়ত সত্য ছিল না ইতিহাসের মানদণ্ডে। অতএব মহাকালের ভাণ্ডারে তার স্থান সীমিত। তাই সব ঘটনাই ইতিহাসের সম্পত্তি নয়।

বিবর্তনের পথ বেয়ে ইতিহাস সকল কাহিনী বা ঘটনাবলীকে পরিমাপ করে নেয়, সে পরিমাপ সমকালীন মানদণ্ডে নয়। ইতিহাস কোন ছোট ঘটনাকে বড় করে দেখে, আবার বড় ঘটনাকে ছোট করে। এ এক বিচিত্র শিক্ষা। মাইকেল মধুসূদন বাংলার কবি। তাঁকে সমকালীন বাংলা সমাজ কি তাঁর নায্য আসন দিয়েছিল সেদিন? সেদিন বাঙালী কি দু'হাত তুলে বরণ করে নিয়েছিল ওই বর্ণাঢ্য মানুষটিকে। অন্তর দিয়ে বলতে পেরেছিল কি, "শ্রীমধুসূদন তুমি আমাদের প্রথম বিদ্রোহী কবি, তোমাকে প্রণাম"। পারেনি। কারণ সমকালীনদের চোখে মাইকেল ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ। তিনি ধর্মত্যাগী, ব্যক্তিগত জীবন কলংকিত। তাই সেদিন ওই অসামান্য প্রতিভার কোন সমাদর হয় নি। তাঁকে বরণ করেছেন একমাত্র সত্যদ্রষ্টা তাপস ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

কিন্তু ইতিহাস সংশোধন করেছে এ ত্রুটি, তার নির্মম পক্ষপাতহীন হাতে। ভারতের ইতিহাসে মাইকেলের আসন আলোয় আলোয় সুপ্রতিষ্ঠিত। এমনি আর একটি ক্ষুদ্র ঘটনা নজরে আসেনি সমকালীন ইয়োরোপীয় সমাজের। চার্টিষ্ট (Chartist) আন্দোলনের ভেতর হারিয়ে গেল দুজন জার্মান দার্শনিকের বৈপ্লবিক ঘোষণা। তা উত্তরকালের কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেস্টো নামে সুপরিচিত। আজ কিন্তু ইতিহাসের পথ বেয়ে ১৮৪৮ সালের চার্টিষ্ট আন্দোলন বা ফরাসী বিপ্লবের চেয়ে বিরাট স্থান অধিকার করেছে কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেস্টো। এই ঘোষণাপত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কত না বিপ্লব ঘটেছে—পতন হয়েছে কত না রাজমুকুটের। এই ঘোষণাপত্রের লুকানো অসাধারণ সৃষ্টিশক্তির কথা অনুধাবন করতে পারেনি তখনকার ইয়োরোপীয় সমাজ। ইতিহাস তার গতিপথে সব কিছু পরীক্ষা করে গ্রহণও করে, বর্জনও করে—বড়কে ছোট করে, ছোটকে বড়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আমি বালক। বালকের গ্রহণ করার ক্ষমতা প্রচণ্ড। বয়স্কদের চেয়ে কিশোর মন খুব নরম, সব কিছু জানার জন্য ব্যাকুল, গ্রহণ করার অসীম আগ্রহ। কত প্রশ্ন, কত না জিজ্ঞাসা। যুদ্ধের কারণ অনুসন্ধান করা বা সমকালীন সামাজিক শক্তিবিন্যাস বিচার করে দেখা কিশোর মনের ক্ষমতার বাইরে, কিন্তু যুদ্ধের প্রভাব তার উপর গভীর।

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে নিছক ব্যক্তিগত কথা বর্জন করতে চেয়েছি—আমার ব্যক্তিগত এবং অন্যেরও।

ব্যক্তির কথা এসেছে। ব্যক্তি এসে হাজির হয়েছে আন্দোলনের প্রতীক হিসাবে, সমাজ দেহে মন্থনের স্রষ্টা বা নিয়ন্ত্রক হিসাবে। আলোচনা করেছি দুটি মানুষের—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী আর সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯২১-৪৬ এই ২৫ বছরে প্রচণ্ড মন্থন সৃষ্টি করেছেন এ দুটি মানুষ। ওই যুগে আর যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ, বড় পণ্ডিত, দক্ষ প্রশাসক ও বিদগ্ধ ব্যক্তি সন্দেহ নেই। কিন্তু ওরা কেউই নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন নি ইতিহাসের গতি প্রবাহকে। কিন্তু ওই দুটি মানুষ ইতিহাসের স্রষ্টা। এঁরা একে অন্যের সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল ও গুণমুগ্ধ, কিন্তু এঁদের ব্যবধান দুস্তর। এদের মিলন অজানা সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার যজ্ঞে—আর বিরোধ কর্মহীন আলস্যের অধ্যায়ে। গান্ধী কর্ম তাপস, স্থিতপ্রজ্ঞ, সুভাষ অশান্ত চির বিদ্রোহী, যৌবনের দূত। একজন থেকে অন্যজন আলাদা, আবার দুজনায় মিলে একাত্ম।

এই পুঁথিতে সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা অপেক্ষাকৃত বেশী। কারণ তাঁর সংগে নিবিড়ভাবে কাজ করার দুর্লভ সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। গান্ধীকে দেখেছি দূর থেকে। একান্তভাবে সুভাষচন্দ্রের সংগে কাজ করেছি ১৯৩৮-৪০ সালে। তখনো নেতাজী হননি সুভাষ। এ দুটি বছর সুভাষচন্দ্রের জীবনে তথা জাতির জীবনে এক মহা সন্ধিক্ষণ। ওই সময় দ্বিজ হয়েছেন সুভাষ। তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দেখে লিখেছিলেন, "তোমার রাষ্ট্রীক সাধনার আরম্ভক্ষণে তোমাকে দূর থেকে দেখেছি, সেই আলো আঁধারের অস্পষ্ট লগ্নে তোমার সম্বন্ধে কঠিন সন্দেহ জেগেছিল, তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে দ্বিধা বোধ করেছি। কখনো কখনো দেখেছি তোমার ভ্রম, তোমার দুর্বলতা। তা নিয়ে মন পীড়িত হয়েছে। আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত তাতে সংশয়ের আবিলতা নেই। মধ্যদিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট।"

১৯৩৮-৪০ সালে স্থভাষচন্দ্র মধ্য গগনে। ঠিকই দেখেছিলেন সত্যদ্রষ্টা কবি তাপস। দুর্ভাগ্যের বিষয়, কবি জীবদ্দশায় এই মধ্যদিনের আলোকচ্ছটা দেখে যেতে পারেন নি, কিন্তু সব কিছু বুঝে গিয়েছিলেন তাঁর আলোক সামান্য অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। এই লগ্ন, সৃষ্টির আনন্দে ভরপুর। ওই ধ্যানমগ্ন মধ্যদিনে যখন আকাশ আলোয় আলোময়। তখন রাখাল তার ব্যাকুল বাঁশীটি বাজিয়ে আহ্বান করেছিলেন রুদ্রকে। সে মহান আহ্বানে যারা সাড়া দিয়েছিলেন তাদের দলে আমিও একজন। কিন্তু ওই রুদ্রা বীণায় সাড়া দেননি সকলে। তাদের ভেতর আছেন বড় বড় নেতা, আছেন বিপ্লবী, আছেন স্থভাষচন্দ্রের প্রাক্তন সহকর্মীরা।

১৫ বছর বয়সে গান্ধীর ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম আমি। ১৯২১ সাল এক আবেগময় যুগ। কিশোর, দশম শ্রেণীর ছাত্র আমি। গান্ধীর ডাকে গোলামখানা ছেড়ে স্বরাজ আন্দোলনের সৈনিক হই। এমনি সময় ডাক এল বিপ্লবমন্ত্রের। কাছের মানুষের ডাক। যাকে চিনি, যাকে জানি তার আহ্বান। তাকে অস্বীকার করার সাধ্য ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না। ওই অপরিণত বয়সে সভ্য হই বিপ্লবী দলে। সেদিন বিচার করার ক্ষমতা ছিল না। কেমন করে বিপ্লব হয় তা জানতাম না। জানতাম না বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের ইতিহাস। জানতাম না ইংরেজদের অসাধারণ সামরিক শক্তির কথা। কিশোর মন কতটুকু জানতে পারে! আবেগভরা প্রাণ। ওই ভরা প্রাণে উপ্ত হল বিপ্লবের বীজ।

ওই সময় বিপ্লবী দলের কেন্দ্র ছিল পূর্ব বাংলার সব বর্ধিষ্ণু গ্রামে। যেখানে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল সেখানেই বিপ্লবের শাখা। কলেজে এসে ১৬/১৭ বছর বয়সে সকলেই দীক্ষিত সভ্য। বিপ্লবী দলের সংগঠন শক্তি এমন সজাগ তা ভেবে আজও বিস্মিত হই। স্কুলের কোনও চরিত্রবান ছাত্র তাদের জাল এড়িয়ে যেতে পারত না। কোন কোন গ্রামে একাধিক দলের শাখা ছিল, শহরের ত কথাই নেই।

বিশ শতকের গোড়া থেকে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের স্থরু। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আগে থেকেই বিপ্লবীদের যাত্রা স্থরু, এ অধ্যায়ের সমাপ্তি হয় ১৯১৭-১৮ সালে। তারপর দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরম্ভ ১৯২০-২১ থেকে। তার সমাপ্তি হয়েছে কী না, বা হয়ে থাকলে কখন হয়েছে সেটাই আমার জিজ্ঞাসা।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দেশের বিপ্লবীদের পরিকল্পিত অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে

আসেনি। স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ট নেতা গান্ধী। বাংলার কোন বিপ্লবী দলই স্বাধীনতা সংগ্রামের চরম মুহূর্তে কার্যকরীভাবে সশস্ত্র বিপ্লবের চেষ্টা করেনি। ফলে সংগ্রামের চরম মুহূর্তে আন্দোলনের পুরোভাগে বাংলা তথা ভারতের বিপ্লবীদের দেখা যায়নি। এ তথ্যটি খুব দুঃখের হলেও সত্য।

আবার অন্যদিক দিয়ে দেখলে বিপ্লবীদের নেতৃত্বে লড়াই হয়েছে চূড়ান্ত সংগ্রামের দিনেও। সে লড়াই সশস্ত্র। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অবদান তুলনাহীন। ১৯৪১ সালের জানুয়ারীমাসের পর সুভাষচন্দ্র যা কিছু করেছেন তা ত তাঁর আপন অপরাজেয় শক্তির জোরে। সেখানে ভারতবর্ষের বিপ্লবীরা অনুপস্থিত। একমাত্র ব্যতিক্রম রাসবিহারী বসু। ভারতের বাইরে দীর্ঘদিন সুযোগের অপেক্ষা করেছেন রাসবিহারী। ১৯১৫ সাল থেকে ১৯৪১ সালে জাপানের যুদ্ধ ঘোষণা পর্যন্ত। জাপান যুদ্ধে সামিল হওয়ায় এসেছিল আকাঙ্খিত সুযোগ মুহূর্ত। দুহাত দিয়ে তা গ্রহণ করেন রাসবিহারী। রাসবিহারী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দ সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা। সার্থক বিপ্লবী রাসবিহারী জানতেন কেমন করে এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হবে পূর্ণভাবে, তাই তিনি ডেকে নিয়ে গেলেন নেতাজীকে ইয়োরোপ থেকে। ১৯৪৩ সালে নেতাজীকে আজাদ হিন্দ আন্দোলনের নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে এক ঐতিহাসিক, নির্ভুল কাজ করেন রাসবিহারী। এ কাজের জন্যে ভগ্নস্বাস্থ্য ও প্রবীন বিপ্লবী নেতাকে বারংবার প্রণাম জানাবে ইতিহাস। কিন্তু রাসবিহারীর এই বিপ্লবকর্ম কী বাংলা তথা ভারতীয় বিপ্লবীদের পরিকল্পনানুযায়ী হয়েছে? এ প্রশ্ন থেকেই যায়।

তিনি আমাদের দলের সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক ছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের সময়। আমরা তাঁর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছি মাত্র। সর্বদাই প্রদীপটি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন তিনি। তাঁকে সর্বশেষ খবর জানিয়েছি আমরা ১৯৪০ সালে। ওই খবর পাঠাতে সাহায্য করেছেন শান্তিনিকেতনের কালীমোহন ঘোষ। শান্তিনিকেতনে থাকার জন্যে তার পক্ষে খবর পাঠান ও গ্রহণ করা সম্ভব ছিল। কালীমোহনবাবুর এই নীরব ভূমিকার কথা অনেকের জানা নেই। আমাদের তরফ থেকে গোপন যোগাযোগ রাখতেন শ্রীনিকেতনের কর্মী মনীন্দ্র রায়। কালীমোহনবাবুর এ অবদান বিস্মৃত হওয়ার নয়।

রাসবিহারীকে সর্বশেষ খবরে ত্রিপুরী কংগ্রেসের থেকে সুরু করে সকল ঘটনা জানিয়েছি আমরা। প্রসংগত জানানো হয়েছে সুভাষ চন্দ্রের নেতৃত্বে

নতুন গোপন দল গঠনের কথা—যে দলে ছিল অনুশীলন, বি, ভি, মাদারীপুর দল, শ্রীসংঘ, উত্তর বংগের দল। সুভাষচন্দ্রের দেশত্যাগের পর সশস্ত্র যা কিছু ঘটেছে তা প্রধানত বাইরের বিপ্লবীদের কাজ।

বিপ্লবের প্রতীক সুভাষচন্দ্র। জাতীয় কংগ্রেসের অলস আপোষপন্থী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তাঁর চূড়ান্ত বিদ্রোহ ইতিহাসের সম্পত্তি। তাঁকে পর্যুদস্ত করার জন্যে কংগ্রেসের উচ্চতম কর্তৃপক্ষের জঘন্য চক্রান্তের কাহিনী পুরু কালো পর্দায় ঢাকা। সে পর্দা সরিয়ে সত্যিকার খবর কখনই বের হবেনা। সুভাষচন্দ্র যাতে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারেন তার জন্যে প্রচেষ্টা করেছে প্যাটেল গোষ্ঠী, আর বাংলায় তাকে মদত দিয়েছে খাদিগোষ্ঠী, কিরণশংকর রায় গোষ্ঠী, নলিনী সরকার সমর্থিত যুগান্তর দলের এক গোষ্ঠী। সুভাষচন্দ্র যাতে কোন আর্থিক সাহায্য না পান তার সকল চেষ্টা করেছেন ওরা। তারা জানতেন যে অর্থ ছাড়া রাজনৈতিক আন্দোলন অসম্ভব। এই দারুন দুর্দিনে কেবল বাংলার কয়েকটি দল তার যাত্রীদলের সংগী—আর ছিল ভারতবর্ষের অগুনতি সংগ্রামী মানুষ যারা কোনদিন ভোলেনি সুভাষচন্দ্রকে। পরিতাপের বিষয়, সুরেন ঘোষ, মনোরঞ্জন গুপ্ত, ভুপেন দত্তের মত মানুষ সেদিন সুভাষের সহায়ক ছিলেন না।

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের ও ১৯৩০-৩২ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নেতৃত্ব সুভাষচন্দ্রের হাতে ছিল না। নেতা ছিলেন গান্ধী। তার জন্যে প্রত্যক্ষ আন্দোলন সুরু করার উদ্দেশ্যে সুভাষ বারংবার গিয়েছেন গান্ধীর কাছে। তিনি সুভাষের কথা শোনেন নি। গান্ধী সংগ্রামের ব্যাপারে কারো সুপারিশ বা অনুরোধ শুনতেন না। কোথায় কখন এবং কীভাবে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ হবে তা নির্ধারণ করবেন স্বয়ং গান্ধী। এ ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। কারণ ভারতবর্ষে প্রত্যক্ষ গণসংগ্রাম পরিচালনা করার কৌশল অন্য কেউ জানত না, আর গান্ধীর ব্যক্তিত্ব ও অসাধারণ জনপ্রিয়তা ছিল না আর কারোরই।

এ অধ্যায়ে সুভাষ পণ্ডিত নেহেরুর মতনই গান্ধীর সংগ্রামী সাথী, তার থেকে আলাদা নন। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের গুণগত পরিবর্তন আসে ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর। তখন তিনি গান্ধী নেতৃত্বের আওতা থেকে মুক্ত। এ সুভাষ-চন্দ্রের এক নবজন্ম। ওই সময় থেকেই সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর বিকল্প। পণ্ডিত নেহেরুর কথা ওঠেনা। কারণ তিনি গান্ধীজীর ছত্রছায়ায় থেকেই তৃপ্ত। এ

ব্যাপারে পণ্ডিত নেহেরু তাঁর বামপন্থী মতবাদ ত্যাগ করতেও প্রস্তুত। এখানেই নেহেরুর দুর্বলতা। অন্যপক্ষে সুবিধাও। সুবিধা এ কারণে যে তিনি ছিলেন গান্ধীর সম্পূর্ণ আস্থাভাজন। এ জন্যেই তিনি গান্ধীর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী। সুভাষের সংগে নেহেরুর এখানেই মৌলিক প্রভেদ। সুভাষচন্দ্র নেহরুর মত হোলে, দেশ ত্যাগ করতে হত না তাঁকে। পরিস্থিতি বদল হওয়ার জন্যে গান্ধীর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী হতে পারতেন না সুভাষ। কিন্তু সে অন্য ইতিহাস। ১৯৪৬ সালে গান্ধী যখন আর একটা গণ-আন্দোলনের প্রস্তাব করেন, তখন নেহরু প্যাটেল তাতে রাজী হননি। কিন্তু সুভাষচন্দ্র তা গ্রহণ করতেন সানন্দে। কিন্তু এসবই অনুমানের কথা।

ত্রিপুরীর পরে সুভাষের মধ্যদিনে গান্ধীর বিকল্প নেতা সুভাষ। তখন সরকারী কংগ্রেসের অনুশাসনের ঔদ্ধত্যের জাল ছিঁড়ে দিয়ে সুভাষ আলোয় আলোময়। অনেকে তখন জালের ভেতর দিয়ে সত্যিকার রাজাকে চিনতে পারেনি। যারা পেরেছিলেন, সুভাষকে নেতা মেনে শপথ নিতে পেরেছিলেন, তাঁরা ভাগ্যবান। সে দিক দিয়ে সুভাষচন্দ্রের সৈনিক হিসাবে তাঁরা তাঁদের নেতার ইতিহাস সৃষ্টির ক্ষুদ্রতম অংশীদার। ইতিহাস রচনার সন্ধিক্ষণে তাঁরা সামান্য কর্মী হয়েও ভুল করেন নি।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র এক বর্ণাঢ্য মানুষ। অনেকেই তাঁর ভবিষ্যৎ চিন্তার ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সজাগ ছিলেন না। যেদিন রাত্রির অন্ধকারে আপন বাসভবন ত্যাগ করে ভ্রাতুষ্পুত্র শিশির বসুর পরিচালিত গাড়ীতে যাত্রা করেন সে-ত এক অন্তহীন নিরুদ্দেশ যাত্রা। এ যাত্রা নানা দেশ পরিক্রমার পর শেষ হোল সিংগাপুরে। এখানে রাসবিহারীর সংগে সুভাষচন্দ্রের মিলন। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় রাসবিহারীর প্রস্তুতির সংগে যুক্ত হলেন ভারতবর্ষের বিপ্লবী নায়ক সুভাষচন্দ্র।

এ সময় থেকে সুরু হোল নতুন যাত্রা। এই যাত্রা কেবলমাত্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করে নি, বাঁধ ভেঙে খুলে দিয়েছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার পরাধীন দেশের মুক্তি সংগ্রামের প্রচণ্ড ধারাপ্রবাহ। ওই কাহিনী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়। ওই সময় কিন্তু ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে বিপ্লবীদল ব্যর্থ হয়েছেন। কেন ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলন ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি তার কারণ খুঁজে বের করা উচিত ছিল। কোথায় এর ত্রুটি, কোথায় এর বিচ্যুতি। না হলে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে বিপ্লবের ইতিহাস।

ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক নীরব দর্শক হয়ে থাকবে না। বিপ্লবী আন্দোলনের অপূর্ণতার বিশ্লেষণ করার অর্থ বিপ্লবী আন্দোলনকে হেয় বা ছোট প্রতিপন্ন করা নয়। ১৭৮৯-এ ফরাসী বিপ্লব ব্যর্থ হলেও তা ইতিহাসের সম্পত্তি। ব্যর্থ বিপ্লবের অবদানও প্রচণ্ড।

বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ, নিষ্ঠা দুঃসাহস ও আন্তরিকতার তুলনা নেই। এক দুর্যোগপূর্ণ আধার রাতে, 'একলা চলরে' মন্ত্রে দীক্ষিত যাত্রীদল আপন রক্ত দিয়ে জাতীয় জাগরণের বুনিয়াদ রচনা করেছে, একথা অস্বীকার করার মানুষ ভারতবর্ষে নেই। বুনিয়াদ রচনা করে তার উপর ইমারত গড়ার কাজে তারা সক্ষম হন নি, যেমন সক্ষম হয়েছিলেন লেনিন, ডিভ্যালেরা, মাও সে তুং।

এ বিষয়ে খুব বেশী আলোচনা হয়নি। কারণ বিষয়টি খুব আবেগ-প্রবণ, তার জন্য আছে সংকোচ। আছে শংকা। যদি প্রাক্তনদের কেউ বলেন, ভারতের রাজনীতির প্রবাহ তারাই নিয়ন্ত্রিত করেছেন তা হলে তা হবে সত্য এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াস। কেউ কেউ একথা বলে আত্মপ্রশান্তি লাভ করেন যে বিপ্লবীরা গান্ধীকে এক বছর সময় দিয়েছিলেন এবং সময় দিয়েছিলেন বলেই গান্ধীর সার্থকতা, তা হলে ভুল করা হবে। যদি কেউ বলেন, দেশবন্ধু বিপ্লবী-দের নিয়ন্ত্রনাধীন ছিলেন তাহলে ঠিক কথা বলা হবে না। সুভাষচন্দ্র সম্পর্কেও ওই একই কথা। এরা সকলেই সিংহ। লেজ সিংহকে নাড়ায় একথা ঠিক নয়। বিপ্লবীদের দেওয়া এক বছর সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর—গান্ধীকে অপসারিত করে—ভারতবর্ষের নেতৃত্বের বল্গা আপন হাতে নিতে পারেনি বিপ্লবীরা। অতএব এসব কথা স্রেফ আত্মতৃপ্তির কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। দেশবন্ধু সম্পর্কেও ওই একই কথা। দেশবন্ধুর ফরিদপুর কনফারেন্সের পরিকল্পনা কি বিপ্লবীদের নিয়ন্ত্রণের ফলশ্রুতি? যারা সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক গুরু বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন, তারা কিন্তু উত্তরকালে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করার সময় সুভাষচন্দ্রের পাশে ছিলেন না, ছিলেন দক্ষিণ-পন্থীদের শিবিরে।

গান্ধী ও দেশবন্ধু হিংসার রাজনীতির বিরোধী ছিলেন। গান্ধী বিপ্লবীদের ত্যাগব্রতের প্রশংসা করেছেন অকুণ্ঠিত চিত্তে, কিন্তু হিংসাত্মক কাজ থেকে তাদের নিবৃত্ত করার জন্যে তাঁর চেষ্টা ছিল অন্তহীন। একমাত্র সুভাষচন্দ্র নিছক অহিংসায় বিশ্বাস করতেন না। অহিংস আন্দোলনের সৃজনী শক্তি ও অবদান সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত ছিলেন সুভাষচন্দ্র। ভারতবর্ষে সশস্ত্র

বিপ্লব রচনার পর্বত প্রমাণ বাধার কথাও জানতেন তিনি। একথাও জানতেন যে সার্থক বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া সশস্ত্র অভ্যুত্থান সম্ভব নয়। রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে নেহেরু প্রভৃতির মতন হিংসার ব্যবহার rule out করেননি সুভাষচন্দ্র।

গান্ধী ও দেশবন্ধুকে কখনই প্রভাবান্বিত করতে পারেননি বিপ্লবীরা। সুভাষচন্দ্রকে প্রভাবান্বিত করার গৌরবও বিপ্লবীদের নয়। সুভাষচন্দ্র যে নেতাজীতে রূপান্তরিত হলেন, তার নিয়ামক বাংলার প্রাক্তন বিপ্লবীরা নয়। সুভাষচন্দ্রের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য দায়ী ভারতবর্ষের রাজনৈতিক শক্তি বিন্যাস এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

এ সব প্রসঙ্গের অবতারণা করছি এইজন্যে যে কোন কোন বিপ্লবী নায়কদের অভিমত তারা গান্ধী, দেশবন্ধু ও বিশেষ করে সুভাষচন্দ্রকে প্রভাবান্বিত করেছেন। এ এক ধরণের বেদনাদায়ক আত্মতৃপ্তি। বিপ্লবীদের জাতীয় জাগরণের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু ভারতভূমিতে কেন তারা শেষ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেন নি সে কথাও নৈর্ব্যক্তিকভাবে আলোচনা করা উচিত।

ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠ গণ অভ্যুত্থান "ভারত ছাড় সংগ্রাম।" এ সংগ্রাম নিছক অহিংস সংগ্রাম নয়। অহিংসার গণ্ডি টেনে গান্ধী এ আন্দোলনকে বেঁধে দেন নি। 'করেংগে ইয়া মরেংগে' এ মরণ যজ্ঞে আত্মাহুতির জন্য উদাত্ত আহ্বান। সহিংস সংঘর্ষ বেশী হয়েছে এ আন্দোলনে। এ আন্দোলন অহিংসাত্মক হবে না তা অনুমান করেছিলেন গান্ধী। বারংবার বলেছেন, "short & swift movement" এক সপ্তাহের ভেতরেই শেষ হবে। এ সকল কথাই সহিংস সংগ্রামের প্ররোচনা ছাড়া আর কিছুই নয়। স্বয়ং গান্ধীর গঠনমূলক কেন্দ্রেও অহিংস আন্দোলন হয় নি।

এমনি উর্বর ও অনুকূল পরিবেশে বাংলার বিপ্লবীরা ব্যর্থ হয়েছেন জাতীয় বিপ্লবে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে। যুক্তি দেওয়া হবে যে '৪২ সালের বহু আগে গ্রেপ্তার হয়েছেন বিপ্লবী নায়কেরা। অতএব নেতৃত্ব গ্রহণ করার কোন সুযোগ ছিল না। নেতারা গ্রেপ্তার হলেও কেন্দ্রে কেন্দ্রে কর্মীর ত অভাব ছিল না। তাদের আশু বিপ্লবের কাজের জন্য প্রস্তুত করা হয়ে থাকলে তারা বৃটিশ সরকারের বিভিন্ন শক্তি কেন্দ্র আক্রমণ করে তা দখল করতে সক্ষম হোত। যখন তেমন সুসংঠিত সশস্ত্র সংগ্রাম হয়নি, তখন বুঝতে হবে যে এ ধরণের কোন

প্রস্তুতি ছিল না—ছিল না এ ধরণের মানসিকতা। জয়প্রকাশ সহকর্মীদের নিয়ে হাজারিবাগ জেল থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন—কিন্তু আমরা সে ধরণের চেষ্টা করেছি বলে প্রমাণ নেই।

১৯৪৩-৪৪ সালে বাংলার সকল বিপ্লবীরা একত্র হয়ে সংঘবদ্ধ আঘাত হানলে পূর্ব-ভারতে বৃটিশ শক্তি বিপর্যস্ত হত এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। বিপ্লবীদের সহিংস সংগ্রামের অভিজ্ঞতা সর্বজনস্বীকৃত। যে শক্তিজোট প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রাসবিহারী ও যতীন মুখার্জীর নেতৃত্বে স্বাধীনতার লড়ায়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সম্পূর্ণ অভাব ছিল সে ধরণের প্রচেষ্টার। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বিপ্লবের সহায়ক একথা অজানা ছিল না বিপ্লবীদের। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ওই ধরণের প্রচেষ্টা ছিল না কেন? সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা থাকলে আগষ্ট বিপ্লবের পথ বেয়ে বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর উপর চরম আঘাত হানতে পারত বিপ্লবীরা। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে প্রাণভয়ে পালিয়ে আসছে বৃটিশ বাহিনী। পলায়িত সৈন্যবাহিনীকে পরাস্ত না করতে পারলেও বিব্রত করতে সক্ষম হোত বিপ্লবী গেরিলা যোদ্ধারা।

১৯৪২ সালে জাপানী আক্রমণের ভয়ে মিত্র শক্তি পূর্ব ভারত ছেড়ে দিয়ে ছোটনাগপুরে ব্যূহ রচনা করেছিল, এ সামরিক খবর তখন সকলের জানা। ওই সময় আসাম ও বাংলাদেশে বৃটিশ বাহিনী পর্যুদস্ত করা শক্ত ছিল না। একটি বছর গেরিলা যুদ্ধ চালিযে গেলে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সংগে যুক্ত হত ভারতীয় গেরিলা যোদ্ধারা। ১৯৪৪ সালের ১৪ই এপ্রিল। মরণপণ সংগ্রাম করে পূর্ব ভারত বৃটিশ কবলমুক্ত করা হয়ত অসম্ভব হত না। তা সম্ভব না হলেও আসাম, মণিপুর, শ্রীহট্ট, মৈমনসিংহ, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে ব্যাপক গেরিলা সংঘর্ষ ঘটলে ক্যাবিনেট মিশনের কাছ থেকে স্বাধীনতার জন্য হাত পাততে হোত না। বৃটিশের সামরিক শক্তি প্রতিরোধের দুর্ব্বলতা আমরা মোটেই বুঝতে পারিনি। ১৯৪২ সালের মরণপণ লড়াই যেমন একটা বিস্ফোরণ, অন্যদিকে শাহনওয়াজ, সায়গল ও ধীলন এই তিনজন আজাদ হিন্দ নায়ককে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ গণবিক্ষোভের আর একটা বিস্ফোরণ। এর ফলে বিজয়ী বৃটিশ শ্রমিক দলকে একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করে ইজ্জৎ রক্ষা করতে হত। আর বিদ্রোহী ভারতবর্ষে যে নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি করত তাতে মোসলেম লীগের স্থান থাকতনা। হয়তো অবসান হত দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসীদের নেতৃত্বের। এমনি অবস্থায় ভারতবর্ষে প্রবেশ করতেন তার প্রিয় বিদ্রোহী

সন্তান নেতাজী। তেমন পরিবেশে না হত দেশ বিভাগ, না হত কোন আপোষ রক্ষার কথা। পূর্ণ হত রামগড় সম্মেলনের স্বপ্ন "All power to the Indian people।"

এ সকলই অনুমানের কথা। ভারতবর্ষে সুপ্ত ছাই চাপা গণ বিক্ষোভ (বিশেষ করে আগষ্ট বিপ্লবের পর) কী হোত, কী রূপ নিতে পারত, তা কেউ হাত গুনে বলতে পারে না। ইতিহাস এই ধরণের আকস্মিকতা ও অনিশ্চয়তায় ভরা। কিন্তু আসল কথা, আমরা পারিনি। বিশ শতকের আরম্ভক্ষণে যে আন্দোলনের যাত্রা সুরু, যে আন্দোলনের আত্মবলিদান তুলনাহীন, যে আন্দোলনে বাংলার শত শত তরুণ শহীদ হয়েছেন—ভারত-ভূমিতে যে আন্দোলন সৃষ্টি, তার পূর্ণ পরিণতি লাভ করতে ব্যর্থ হল—এ হচ্ছে দুঃখের কথা। যদি এ আন্দোলনে শেষ অবধি বিজ্ঞানসম্মত পথে পরিণতি লাভ করত তাহলে হয়ত দেশ বিভাগ হত না—অন্ততঃ পূর্ব বাংলা ভারতভূমি থেকে আলাদা হত না। এ ইতিহাসের এক বিরাট ট্র্যাজেডি।

দুই ঃ অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা

ছয় বছর বয়সে পিতার হাত ধরে গ্রাম ছেড়ে চলে যাই জুলুহারে। ১৯১৩ সাল। ওই গ্রাম আমার কৈশোরের চঞ্চলতায় মধুর কেন্দ্র। এখানে ১০ বছর কেটেছে আমার। এখানেই রচিত হয়েছে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তিভূমি। কৈশোর কাটে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়। বিশ্বযুদ্ধ মানুষের এক বিচিত্র শিক্ষক। লড়াই মানুষের দুয়ারে এসে বলে "আমাকে দেখ"। গ্রামের স্কুলের ছাত্র। ৮।৯ বছর বয়সে "এসডেনের" কাহিনী অনেক শুনেছি আমরা। শুনেছি মাদ্রাজ উপকূলে এসডেনের আবির্ভাব। বালকের শুভ্র মনে বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব প্রচণ্ড হওয়া স্বাভাবিক। কারণ ভারতও যুদ্ধরত দেশ। কোথায় ভারত আর কোথায় জার্ম্মানী। কিন্তু কেন এ যুদ্ধ? এ প্রশ্ন স্বতই মনে জাগে। রবার্ট সাদীর ছোট্ট শিশু পিটার-কীন তার দাদুর কাছে প্রশ্ন করেছিল "Now tell me, what it was all about: ব্রেসহাইম যুদ্ধে শিশুর মুখ দিয়ে কবি যে প্রশ্ন করেছিলেন তা অন্য বালকের মনে ওঠা স্বাভাবিক। এ প্রশ্ন শাশ্বত।

যুদ্ধে ইংরেজের পরাজয়ের কাহিনী তখন কি আনন্দ না দিত আমাদের। এ ধরণের ভাবনা কেবল আমার মনে ওঠেনি। সকল বালকের মনে একই কথা আসা যেন সহজাত। কারণ অনুধাবন করতে চেষ্টা করিনি তখন। স্কুলের পাঠ্য বই ইংরেজ ভক্তিতে সোচ্চার। বই খুলে হয় পঞ্চম জর্জের ছবি —না হয় তার স্ত্রীর। God save the King কবিতাটি পাঠ্য তালিকার প্রথম কবিতা। ইংরেজ প্রশস্তিতে কত লেখা! ইংরেজ সাম্রাজ্যে সূর্য্য কখনও অস্ত যায় না। কী পরাক্রমশালী শক্তি! এ সকল সত্ত্বেও আমাদের গোপন মনে ছিল জার্মান প্রীতি। পরোক্ষে ইংরেজ বিদ্বেষ, আমরা জার্মানীর বিজয় চাইতাম। বাল্যকালের এ এক বিচিত্র মানসিকতা। তার জন্তেই হয়ত স্কুলের ছাত্রাবস্থায়ই একটি মানুষের আহ্বানে কোন চিন্তা না করেই বিপ্লবী দলের সভ্য হই।

ভাগ্যচক্রে বাল্যকালে গ্রামজীবনে আমার বিকাশ খুব শুভ্র ও স্বচ্ছ। আমার দুজন শ্রদ্ধাবান শিক্ষক একটি ধর্মরক্ষিনী সভা গড়ে তোলেন। সেখানে প্রতি সপ্তাহে একদিন ধর্মপুঁথি পড়া হত। সভা ঘরে কেবল একখানি ছবি

ছিল। তা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের। রামকৃষ্ণ কথামৃত থেকে এবং কিছুটা বিবেকানন্দের বই থেকে পড়া হত। আর গান হত ব্রাহ্মসংগীত ও রবীন্দ্রনাথের পূজার গান। এর জন্যেই আমার ব্যক্তিগত জীবনের ধারা একটি বিশেষ খাতে বইতে শুরু করে।

বরিশাল জিলায় তিনটি মানুষের প্রভাব ছিল প্রচণ্ড। অশ্বিনী কুমার দত্ত, বি এস স্কুলের প্রধান শিক্ষক জগদীশ মুখোপাধ্যায় ও কালীশ পণ্ডিত। এ তিনটি মানুষের উচ্চ নৈতিক মান সারা জিলার মানুষের কাছে আদর্শস্থল। ছাত্রদের কাছে জপদীশ বাবু ছিলেন আদর্শ শিক্ষক। অকৃতদার। জগদীশ আশ্রম ছিল ছাত্রদের গুরুগৃহ। অশ্বিনীকুমারের অভিযোগ ছিল ছাত্র ও যুবকদের কাছে বেদের মতন। জগদীশচন্দ্রের জীবন ছিল তাঁর বাণী। কালীশ পণ্ডিত মহাশয় ছিলেন সেবাধর্মের পুরোভাগে। তাঁর "Little brothers of the poor" এ সংঘটি গঠিত হয় দুর্গতের সেবার জন্যে —খৃষ্টান মিশনারীদের আদর্শে গঠিত।

এ ছাড়া ভোলাগিরি ও জগৎগুরু জগদবন্ধুর আশ্রম কেবল প্রভাবশালী ছিলনা—ছিল সক্রিয়। ভোলানন্দ গিরি মাঝে মাঝে বরিশাল আসতেন। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। বহু মন্ত্রশিষ্য ছিল তাঁর। গ্রামাঞ্চলে তার সংখ্যাও কম নয়। রোজ ব্রাহ্ম মুহূর্তে জগবন্ধু আশ্রমের কর্মীরা সারা শহর ঘুরে প্রভাতফেরী উদযাপন করে শহরবাসীর ঘুম ভাঙতেন। এ ছাড়া ছিল রামকৃষ্ণ মিশন। প্রায় এ সময়েই স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রতিষ্ঠা করেন শঙ্কর মঠ। শঙ্কর মঠের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল কর্মী গঠন করা। কতকটা আধা ধর্মীয় ও আধা রাজনৈতিক। স্বামিজী নিজে সহিংস সংগ্রামে বিশ্বাস রাখতেন। এ ছাড়া সারা জিলার গ্রামাঞ্চলে স্বতস্ফূর্ত ভাবে গড়ে ওঠে হরিসভা আন্দোলন। এর প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন বলা শক্ত। কিন্তু সর্বত্রই এরা ছিল সক্রিয়। তাছাড়া চারণ কবি মুকুন্দদাস নিজেই এক ধরণের সচল প্রতিষ্ঠান। তার প্রাণ মাতান চারণ গানে সবাই মুগ্ধ। বরিশাল সহরে ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব ছিল বেশ। সহরের ব্রাহ্ম মন্দিরটির আকর্ষণ আজও মনে পড়ে। রুচি ও শালীনতার কেন্দ্র ছিল ব্রাহ্ম মন্দিরটি।

আমাদের বিদ্যালয়ের একজন তরুণ শিক্ষক ১৯২১ সালের জানুয়ারীতে আমাদের স্কুল ছেড়ে দিয়ে ভোলা জাতীয় বিদ্যালয়ে যোগ দেন। তখন গান্ধীজীর পরিচালিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের বিরাট ঢেউ। সারা

ভারত এক প্রচণ্ড অগ্নিগর্ভ অবস্থায়। হঠাৎ শিক্ষকটি ১লা আগষ্ট এসে উপস্থিত। তিনি কয়েকজন বাছাই করা ছাত্রদের আহ্বান করেন ধর্মরক্ষিনী সভায়। অসহযোগ আন্দোলনের সৈনিক তিনি। তার জন্য গোলাম খানার চাকরী পরিত্যাগ করেছেন, কিন্তু সহিংস বিপ্লবের পুরোহিতও। সভার সুরুতে দুটি গান গাইল :

"কে আছ মায়ের মুখপানে চেয়ে
এস কে কেঁদেছ নীরবে।"

যাদের অন্তর নীরবে কেঁদেছে তারা এসো। কী প্রাণ মাতান গান! তার পরের গানটি গাওয়ার সময় সকলকে নিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠেন তিনি। সমবেত ছাত্রদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে যাত্রা করেন গ্রাম্য পথ দিয়ে। পুরোভাগে "রাজ সমারোহে" চলছেন আর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের "একলা চলরে" গান। মন্ত্রশক্তিতে উদ্বুদ্ধ মানুষটি উদাত্ত কণ্ঠে বারংবার গাইতে লাগলেন "বজ্রানলে তোর বুকের পাড়ে জ্বালিয়ে একলা চলরে।" অজানা দুস্তর সাগরে পার হওয়ার জন্যে আহ্বান। দৃঢ়পদে চলছে যাত্রীদল। এ অভিযানের যেন শেষ নেই। যাত্রা হল সুরু। সেদিন গোধুলি লগনে আমার প্রিয় বন্ধু হরিভূষণ আমাকে একান্তে ডেকে বলে যে মাষ্টার মশাই বলছেন গুপ্ত বিপ্লবী দল গঠনের কথা। আমি প্রস্তাবে সম্মত হই। জুলুহার গ্রামে গুপ্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা হল।

পাশে বহু গ্রামে আমাদের শাখা গড়ে ওঠে। জুলুহার ও পাশের গ্রামগুলি বিপ্লবী আন্দোলনের একটি বড় কেন্দ্রে পরিণত হয়। উত্তর কালে ঐ অঞ্চল থেকে প্রায় ২০/২৫ জন কর্মীকে ইংরেজ সরকার গ্রেপ্তার করে। কিন্তু তাতেও সংগঠন দুর্বল করা সম্ভব হয়নি।

১৯২০-২১ সালে বরিশাল জিলায় কোন চরিত্রবান, সেবাধর্মী, প্রাণবন্ত বালকের পক্ষে গুপ্ত সমিতিতে যোগ দেয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল না। অনুশীলন ও যুগান্তর এ দুটি বড় দলের কর্মীরা ওৎ পেতে বসে থাকতেন যেন তাঁদের জালে সম্ভাব্য সকল বালকই ধরা পড়ে। যারা ধরা দেয়নি তারা ব্যতিক্রম।

পরিবেশ ও পরিস্থিতি ছিল এ আন্দোলনের অনুকূলে। যখন আমার ১১ বছর বয়স তখন যুদ্ধ চলেছে পুরোদমে। ইংরেজের সম্ভাব্য পরাজয়ের কথা সবার মুখে। আমরা বালকেরা এ সকল আলোচনা শুনতাম। হিতবাদী,

সঞ্জীবনী ও অর্ধ সাপ্তাহিক অমৃতবাজার পত্রিকা পড়ার জন্য মানুষের কী ব্যাকুলতা! আবার এ সকল খবর নানা রঙে অতিরঞ্জিত হয়ে সুদূর পল্লীতে ছিল আলোচনার বিষয়বস্তু। এর সাথে আলোচনা হত স্বদেশী ডাকাতির। কোন গ্রামের কোন যুবকটি ডাকাতি করতে গিয়ে পুলিশের সাথে লড়াই করে লুন্ঠিত অর্থ নিয়ে পালাতে পেরেছে, এ সবই অতিরঞ্জিত খবর। ডাকাতির সময় ডাকাতদের একজন বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছে যে তাঁরা এ অর্থ দেশের স্বাধীনতার কাজে ব্যয় করবেন। তাঁদের অর্থের প্রয়োজন। অস্ত্র জোগাড় করা ও দল চালনার জন্য প্রচুর অর্থ চাই। এছাড়া ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকি ও কানাইলালের কথা ঘরে ঘরে আলোচনা হত। ক্ষুদিরামের ফাঁসীর মধুর গানটি অনেকেরই কণ্ঠে। বৈরাগী এক মুঠো ভিক্ষার জন্যে গৃহস্থের দুয়ারে এ গানটি গাইত।

যুদ্ধের সময় সারা ভারতব্যাপী বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের ব্যর্থ প্রচেষ্টা, এবং বিপ্লবীদের সাথে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধের কথাও শিক্ষিত মানুষের অজানা ছিল না। বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও, বিপ্লবীদের কর্মপ্রণালীর প্রতি শ্রদ্ধা ছিল প্রচণ্ড। মানুষের ধারণা ছিল, আরও ব্যাপকভাবে সংগঠন গড়ে উঠলে স্বাধীনতা লাভ হবে সহজসাধ্য।

এ ধরণের উর্বর পরিবেশে গড়ে উঠেছি আমরা। ইংরেজ সাম্রাজ্যতন্ত্রের অনুকূলে শিক্ষা ব্যবস্থা। কিন্তু এ সাজানো শিক্ষাতন্ত্রের দুর্বল গ্রন্থি ছিঁড়ে আমাদের অন্তরে অনুপ্রবেশ করেছে স্বাধীনতার আকাঙ্খা। যে বীজ অন্তরের মনিকোঠায় লুকিয়ে ছিল তা মাটি ভেদ করে বেরিয়ে এল গান্ধীজীর উদাত্ত আহ্বানে। এ বিরাট নেতা সকল বাধা ছিঁড়ে ফেলে দেশের সামনে তুলে ধরলেন স্বরাজের কথা, সংগ্রামের কথা, আত্ম বলিদানের কথা। রাউলাট আইন ও জালিনওয়ালাবাগের অত্যাচারের কথা গান্ধীজী পৌছে দিলেন সাধারণ মানুষের দুয়ারে। হরতাল ও অরন্ধন এ সকল শব্দ বাংলা অভিধানে নতুন কথা। গান্ধী যেন যাদুকর। নতুবা সুদূর পল্লীগ্রামে অর্দ্ধশিক্ষিত আমার মা তাঁর নাম শুনলেন কেমন করে? কেমন করে বুঝলেন যে মহান নেতার আদেশ ভক্তিপ্লুত চিত্তে মানতে হবে? খবরের কাগজে তাঁর অদ্ভূত ছবিটি আজও মনে পড়ে, মাথায় পাগড়ি, গায়ে পাঞ্জাবী, চাদর ও ধুতি। তখনও গান্ধীজী কটিবাস পরতে সুরু করেন নি। কত আজগুবি কথা শুনেছি এ বিরাট পুরুষের সম্বন্ধে। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর ঐতিহাসিক কীর্ত্তি

পল্লীগাঁথার মতন মানুষের মুখে মুখে। কেউ কেউ বলতেন, গান্ধী হলেন দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ। তিনি অতিমানব। যুগাবতার।

মাকে জিজ্ঞাসা করি, আজ রান্না করছ না কেন? সহজ সরল ভাষায় মা জবাব দেন "গান্ধী না কে একজন বড় মানুষ এসেছেন। তাঁর হুকুম যে ঐ দিন রান্না বন্ধ।" আগের দিন সমস্ত রান্না করে রেখেছিলেন। আমরা ছোটরা কলরব করে পান্তাভাত ও বাসী রান্না খেলাম। এ খাওয়া নয়, যেন দেবতার পূজা! স্নান করে পূতশুদ্ধ হয়ে সেদিন অন্ন গ্রহণ করি। এ দেশের কাজ নয়। তবু মনটা যেন গান্ধীজীর কাজের পবিত্র মুক্ত ধারার সাথে যুক্ত হল। নিজেকে খুব পবিত্র মনে হল। মনে হল ধন্য আমি। কেউ আমাকে দীক্ষা দেয়নি—কেউ বলেনি "তুমি দেশের কাজে দীক্ষা নাও।" বয়স তখন ১৩-১৪ বছর মাত্র। কীই বা বুঝি? কিন্তু মন ছিল তৈরী। ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশবলী শুনেছি—শুনেছি স্বামীজীর ভুলিও না ভারত তোমার আদর্শ। স্বামীজীকে কিছুটা বুঝতাম—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে খুব বেশী নয়। ধর্ম্মাচরণের জন্য সংসার পরিত্যাগ করার প্রয়োজন নেই—একথা মনে খুব সায় দিত। স্বামীজীর কর্ম্মযোগ, পত্রাবলী বারংবার পড়েছি। পড়েছি স্বামী-শিষ্য সংবাদ। গান্ধীজীর কথার ভেতর বিবেকানন্দের ধারা খুঁজে পেতাম।

পিতার কাছে জালিওয়ানালাবাগের কাহিনী শুনলাম। জানতে পারলাম সে নৃশংস হত্যা কাহিনীর কথা। এর প্রতিবাদের জন্য গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের ও মুক্তির কথাও শুনি। কেমন যেন মনে হত। মনে হত গান্ধীর পিছে পিছে চলেছে অগুন্তি যাত্রী দল। বন্দরের বন্ধন ছিঁড়ে দিয়ে চলেছে সবাই। শরীর বা বুদ্ধির দিক দিয়ে না হলেও মনের দিক দিয়ে আমিও যাত্রীদলের একজন।

আমার দেশপ্রেম সৃষ্টি করার ব্যাপারে পিতার অবদান অপরিসীম। তিনি জেনেশুনে একাজ করেছেন কিনা বলতে পারিনা। যখন আমার বয়স ৮/৯ বছর তখন তাঁর মুখে মুখে রাজপুত কাহিনী ও শিবাজীর জীবন আদর্শের সাথে পরিচিত হই। এই ইতিহাস শুনে একদিকে যেমন রাণা প্রতাপ প্রভৃতি রাজপুত বীরদের বীরত্বে মুগ্ধ হয়েছি—তেমন আকৃষ্ট হয়েছি শিবাজীর চতুর রণ কৌশলের সাথে। তুলনামূলকভাবে ছত্রপতি শিবাজীর আবেদনই ছিল বেশী। রাজপুত বীরদের আত্ম বলিদানের জন্য চোখের জল ফেলেছি—কিন্তু

মোগলদের সাথে একজন মারাঠী যুবকের সার্থক লড়াইয়ের কাহিনী চিত্তে অনুপ্রেরণা জোগাত। পিতার কাছে এ সকল কাহিনী শুনে তাঁর নির্দ্দেশ মত 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' ও 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' পড়ি বারবার।

১৯২০ সালে ডিসেম্বর মাসে প্রবেশিকা শ্রেণীতে উঠি। ২১ সালের জানুয়ারী মাসে অসহযোগ আন্দোলনের সুরু। নাগপুর কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের কথা সব জানতাম না। কিন্তু জানলাম যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ঢেউ লেগেছে সারা ভারতবর্ষে। এ সময় কাছের মানুষ চিত্তরঞ্জন উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানালেন "গোলামখানা ছেড়ে দাও।" আইন ব্যবসায়ে বিরাট কীর্তি। মাসে ৪০,০০০ টাকা উপার্জ্জন। এক কথায় আইন ব্যবসা জীর্ণ বস্ত্রের মতন ত্যাগ করে এলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী শুনেছি তখন। এ যে সাক্ষাৎ হরিশ্চন্দ্র। চিত্তরঞ্জন ঘোষণা করলেন "Education may wait but Swaraj cannot." খুব স্বচ্ছ উক্তি। ১৯২১ সালের ভেতরেই স্বরাজ এনে দেবেন গান্ধীজী, যদি তাঁর কার্য্যক্রম মেনে নেয় দেশবাসী—আদালত বর্জন, বিলেতি দ্রব্য বয়কট, আইনসভা বর্জন। শিক্ষায়তন বর্জন আর একটি কার্য্যক্রম। ইংরেজী শিক্ষা জাতীয়তাবোধের পরিপন্থী। অতএব সর্বথা পরিত্যাজ্য। চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে হাজার হাজার ছাত্র স্কুল কলেজ ছেড়ে বেড়িয়ে এল—বেড়িয়ে এলেন অনেক অধ্যাপক।

ব্যবহারজীবীদের শিরোমণি দেশবন্ধু। তাঁর আদালত বর্জনের সাথে সারা বাংলায় সুরু হল আদালত বর্জনের ব্যাপক আন্দোলন। শত শত আইনজীবী ভবিষ্যতের দিকে দৃকপাত না করে ছেড়ে দিলেন আইন ব্যবসায়। কেউ ছয় মাস, কেউবা চিরাদনের জন্য। তখন বার লাইব্রেরী ছিল রাজনীতির কেন্দ্র। দেশবন্ধুর সর্বত্যাগী আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেন বড় বড় দিকপালরা। যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, বীরেন শাসমল, কিরণশংকর রায়, প্রভৃতি। উকিলরা অসহযোগ আন্দোলনে সামিল হওয়ায় রাজনৈতিক আন্দোলনের জোয়ার গ্রামাঞ্চলকে প্লাবিত করে আপন আপন মক্কেলদের মাধ্যমে।

১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বরিশাল শহর থেকে সতীশ সরকার নামে একজন আদালত বর্জনকারী উকিল ও খুলনার সেনহাটী নিবাসী রতিকান্ত দত্ত এলেন জুলুহায়ে। জনসভা করেননি তাঁরা। ষ্টীমার ষ্টেশনে অনেক মানুষ জমায়েত হয় তাঁদের অভ্যর্থনা করার জন্যে। তাঁরা প্রচারের জন্য বেড়িয়েছেন। অতএব বেশী সময় ছিল না হাতে। সাথে সাথে একটি বৈঠকে অসহযোগ

নীতি ব্যাখ্যা করে আবেদন রাখেন তাঁরা।

ওঁরা চলে যাওয়ার ২/৩ দিন পরে আমরা স্কুল বর্জন করি। গোলামখানায় আর পড়ব না, এ প্রতিজ্ঞা নিলাম ১৫ বছর বয়সে। পিতা স্কুলের সব চেয়ে প্রবীণ শিক্ষক। পিতা কিছুই বলেন নি। আমাকে নিয়ে বাড়ী চলে আসেন। আমি মার কাছে থাকি। স্কুলও কয়েকদিনের জন্য বন্ধ হয়। সমস্ত স্কুলেই ধর্মঘট। ৯/১০ বছরের বালকরাও বর্জকারী। কিছুদিনের ভেতর পরিবেশ শান্ত হয়। গোলামখানা বর্জন করবে কারা? স্কুলের ছাত্ররা, না কলেজের ছাত্ররা? সাধারণভাবে এ মতবাদ প্রাধান্য লাভ করে যে স্কুল ছাত্ররা ১৬ বছরের নীচে। নাবালক মাত্র। রাজনতির ঝড়ের জন্য তারা উপযোগী নয়। এ মতবাদ কীভাবে রচিত হয়েছিল ঠিক জানিনা। কিন্তু সর্ব্বত্রই স্কুলের ছাত্ররা বিদ্যালয়ে ফিরে গেল।

প্রায় সব জেলায়ই জাতীয় বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। কেবল দক্ষিণ কলিকাতার বিদ্যালয়টি শেষ পর্যন্ত খুব ক্ষীণভাবে বেঁচে ছিল। ১৯৩৮-৪০ সালে আমি এ স্কুলটির সাথে যুক্ত হই। অনুশীলন সমিতির সভ্যারা এ বিদ্যায়তনের কর্ম্মী অর্থাৎ শিক্ষক ছিলেন। চাঁদা তুলে স্কুল চালান হত। এ স্কুলটির সাথে অনেক প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ কোন না কোনভাবে যুক্ত ছিলেন। দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র, হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত, ত্রৈলোক্য মহারাজ এ বিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত ছিলেন। আমার বন্ধু শহিদ যতীন দাসও বোধ হয় এর পরিচালনার সাথে যুক্ত ছিলেন। সে দিক দিয়ে দক্ষিণ কলিকাতা জাতীয় বিদ্যালয় তীর্থস্থান। আজও সে বিদ্যালয় বিনা কলরবে রয়েছে।

বিপ্লবের স্বরূপ

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এক বিচিত্র সৃষ্টি। এরা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, কল্পনা-বিলাসী, আদর্শবাদী ও দুঃসাহসী। এরা হাসিমুখে ফাঁসির দড়ি গলায় পরে নিতে ভয় পায়না, শংকা বোধ করেনা আদর্শের জন্য প্রাণ দিতে। প্রয়োজনে নিজেরাই নিজের শ্রেণীস্বার্থ ঘুচিয়ে দিতে চায়। কেবল ঘুচিয়ে দেয়না—সবার নীচে সবার পিছে সবহারাদের সাথে আপনাকে একাত্ম করতেও পশ্চাৎপদ হয় না। এদের মনের ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার অফুরন্ত।

ভারতের বিপ্লবীরা এই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় থেকেই বেশী এসেছে। ভারত-বর্ষে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সাহস ও কল্পনাশক্তির পরিচয় পাই উনবিংশ

শতাব্দীর সত্তর দশকে। তখন জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়নি—রাজনৈতিক সচেতনতাও তেমন ছিল না। তবে মুষ্টিমেয় মানুষ এক ধরণের গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। রাজনারায়ণ বসু ছিলেন এদের পুরোভাগে। ঠাকুর পরিবারের বর্ণাঢ্য যুবক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি সঞ্জীবনী সমিতি প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীনতা লাভের কথাই আলোচনা করতেন। রবীন্দ্রনাথও "এক সূত্রে বাঁধিয়াছি" এ গানটি রচনা করেন। আর স্বাধীনতা পেতে হলে যে বিপ্লবের প্রয়োজন· সে কথা তাঁদের অজানা ছিল না। যদি এ স্রেফ কল্পনা বিলাস হয়, তা হলেও তারিফযোগ্য। সঞ্জীবনী সভার চিন্তাধারা যে উত্তরকালে বাংলার তথা ভারতের যুবকদের সঞ্জীবিত করেছিল সেকথা অনস্বীকার্য। ব্যারিষ্টার পি· মিত্রও একজন সঞ্জীবনী মন্ত্রের সাধক। তিনি আধুনিক উচ্চ-শিক্ষায় শিক্ষিত। পৃথিবীর ইতিহাসের ধারার সাথে পরিচিত। তাই ইউরোপের বিপ্লবী আন্দোলনের ভাবধারায় অবগাহন করে ইংরেজের জমিতে দাঁড়িয়ে ইংরেজ সাম্রাজ্যের অঙ্গচ্ছেদ করার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কয়েকটি বন্ধু শপথ নেন যে সশস্ত্র বিপ্লবই ভারত স্বাধীন করার একমাত্র পথ। তার জন্য চাই সংগঠন, চাই অস্ত্র। অস্ত্র যোগাড় করার দায়িত্বও নেন ভিন্ন ভিন্ন মানুষ। পি· মিত্র নেন দল গড়ে তোলার সুমহান দায়িত্ব। তার জন্যে চাই যুবকদের সামরিক শক্তির বিকাশ—চাই শরীর চর্চার প্রধান উপকরণ লাঠি। ভারতবর্ষে সরকারী লাইসেন্স ছাড়া অস্ত্র ব্যবহার করা বেআইনী। বেসরকারীভাবে সামরিক শিক্ষা দেওয়ার রাস্তা লাঠি খেলা। শরীর চর্চার জন্য লাঠি খেলা বেআইনী নয়। তার জন্যেই পি· মিত্র প্রতিষ্ঠিত অনুশীলন সমিতি (১৯০২) এতটা গুরুত্ব দিয়েছিল লাঠিখেলার উপর।

সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সুসম মানুষ ও সমাজ গড়ে তোলা। অনুশীলন নামটি খুব সম্ভব বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্বের আদর্শ অনুযায়ী নেওয়া হয়। অনুশীলন তত্ত্বে আদর্শ মানুষের ছবি এঁকেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। আদর্শ মানুষ গড়ে তুলবে আদর্শ সমাজ। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে শ্রীকৃষ্ণই আদর্শ মানুষ। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান নন—আদর্শ মানুষ। তিনি ধার্মিক, তিনি অপরাজেয় যোদ্ধা, বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ, ন্যায় ও সত্যের পূজারী। সম্ভাব্য সকল গুণের অধিকারী শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ মেনে নিয়ে মানুষ তৈয়ারী করার ব্রত গ্রহণ করে অনুশীলন সমিতি। অনুশীলনের ভাল ইংরেজী প্রতিশব্দ নেই। অনুশীলন কথার তাৎপর্য খুব ব্যাপক ও গভীর। এর উদ্দেশ্য মহৎ থেকে মহত্তর হওয়ার

যাত্রা। এ যাত্রা অন্তহীন। সমিতির সভ্যরা সকলেই যাত্রী যেন—"আলো হাতে আঁধারের যাত্রী"।

বঙ্কিমচন্দ্র পি মিত্রের কাছের গ্রামের মানুষ। একটি বিপ্লবী সমিতি গঠনের জন্ত অনুশীলনের নাম গ্রহণ করা খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ। একটি জঙ্গী নাম নিলে প্রথমেই ইংরেজের কোপদৃষ্টি পড়বে। সরকারের বিষদৃষ্টি আহ্বান করার লাভ নেই। আনন্দমঠের মতন ইংরেজ বিরোধী উপন্যাসের অপূর্ব পরিকল্পনা শেষ অধ্যায়ের একটি কথোপকথনের ভেতর দিয়ে মোলায়েম করা হয়েছে। এখানেও অনুশীলন করার উদ্দেশ্যে দল গঠন পুরোপুরি আইনসম্মত। বঙ্কিমচন্দ্র বেঁচে থাকার সময় হয়ত পি মিত্রের সাথে এ সম্পর্কে আলোচনা হয়ে থাকবে। তবে এ বিষয়ে কোন নির্ভুল প্রমাণ নেই। অনুমান হয়, অনুশীলন-তত্বই যে ভারতবর্ষের জীবনবেদ এ তত্ব বঙ্কিমের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন পি· মিত্র। আর পেয়েছিলেন আনন্দমঠ থেকে সন্তান দলের পরিকল্পনা। সেদিন বাংলার সকল জাতীয়তাবাদী মানুষের কাছে আনন্দমঠ ছিল একখানি আবশ্যিক পাঠ্যপুঁথি। বিপ্লবীদের ত কথাই নেই। তাদের কাছে আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী কেবলমাত্র অবশ্য পাঠ্য নয়—পথ নির্দেশকও।

বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া যুবকদের উপর আর একজন মানুষের প্রভাব পড়েছিল প্রচণ্ড। তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজীর প্রভাব আরও প্রত্যক্ষ, আরও গভীর। রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য কবিদের কাব্য বিপ্লবীদের ভাবধারাকে পরিশীলিত করেছে, করেছে আবেগময়। কিন্তু এঁরা কেউই তাদের আরাধ্য দেবতা ছিলেন না। স্বামীজী ছিলেন বিপ্লবীদের কাছে আদর্শ মানুষ। তারা প্রায় সকলেই স্বামীজীর মত হওয়ার উচ্চাশা পোষণ করতেন। আপন আপন জীবনযাত্রা রূপায়িত হত স্বামীজীর নির্দেশের পথে। সেদিন স্বামী বিবেকানন্দের জন্যে উন্মাদ হয়েছিল বাঙালী। বিপ্লবীরা ত বটেই। সেজন্য ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধ ধর্মভিত্তিক। কিন্তু এ ভাবধারা কোনক্রমেই সাম্প্রদায়িক ছিল না। এখানে কোন মুসলমান বিদ্বেষ ছিলনা—ছিল না কোন খৃষ্টান বিদ্বেষ। খৃষ্টান ও মুসলমান নেতৃবৃন্দও ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁদের কাছেও জাতীয়তা এক ধরণের ধর্ম ছিল। মুসলমানরা কোরাণ-শরীফ থেকে দেশাত্মবোধের শিক্ষা পেয়েছেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই যে ধর্মসঙ্গত এ কথাই তাঁরা প্রকাশ্যে জানিয়েছেন বারংবার। তবে প্রথম পর্যায়ে জাতীয় আন্দোলনের আবর্তে বেশী সংখ্যক মুসলমান অংশ গ্রহণ করেন নি।

তার কারণ হিন্দু বিদ্বেষ বা ইংরেজ প্রীতি নয়। তখনও মুসলমানদের ভেতর আধুনিক শিক্ষার প্রসার হয়নি বলে জাতীয়তার প্লাবনে তারা অবগাহন করার সুযোগ পায়নি। জাতীয় আন্দোলনের আদি পর্যায়ে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দেওয়া বা বন্দেমাতরম গান গাইতে তাদের ধর্মবুদ্ধিতে আঘাত করেনি। তখন তাদের মনে এটি হিন্দু এটি মুসলমান এ চিন্তা ছিলনা! রসুল সাহেব বা লিয়াকত হোসেনের মতো মানুষ মুসলমান নয়, ভারতবাসী। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব খৃষ্টান নন, ভারতবাসী। ভারতবাসীদের ভেতর সাম্প্রদায়িক ভাবনা ইংরেজের সৃষ্টি। আপন সাম্রাজ্য স্বার্থে ইংরেজ এ বিষ সৃষ্টি করেছিল, বাংলা ভাগের পেছনেও ঐ একই উদ্দেশ্য। কিন্তু বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয় তার ফলে অল্প সময়ের জন্য পেছিয়ে এল ইংরেজ। উত্তরকালে ভিন্ন পথে এ বিষ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেতনায় ছড়িয়ে দেয়। তার অনিবার্য পরিণতি পাকিস্তান।

বিপ্লবীদের কাছে জন্মভূমির শৃঙ্খল মুক্ত করাই ধর্ম। স্বামীজীর প্রধান শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা বিপ্লবীদের মনে এ ধরণের ভাবধারা সৃষ্টি করতে প্রয়াস পেয়েছেন। বিপ্লবীরা কর্মযোগীর ন্যায় স্বাধীনতা লাভের তপস্যাব্রতী। তাদের সরল অনাড়ম্বর কৃচ্ছ্র জীবন তার প্রমাণ। বিপ্লবীরা ধর্মতপস্বী।

ঐ সময়ে বৈপ্লবিক দলে সরাসরি একদিনে প্রবেশ করা ছিল অসম্ভব। দলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার ঠিক মুহূর্তটি কর্মীরা বুঝতে পারত না। এক সময় তারা বুঝতে পারতেন যে তারা গুপ্ত সমিতির সভ্য। তখন জল অনেক দূর এগিয়ে গেছে। একটি যুবক লাঠিখেলা বা শরীর চর্চার সমিতিতে ব্যায়াম করতে করতে বিপ্লবী ভাবধারায় দীক্ষা গ্রহণ করে ফেলেছে অজ্ঞাত-সারে। ধর্মপ্রতিষ্ঠানের মতনই ব্রহ্মচর্য পালন করা ছিল বিপ্লবীদের আবশ্যিক কর্ম। ব্রহ্মচর্য্য পালন করার অধ্যায়ে তারা নানান ধরণের পুঁথি পড়তেন। প্রথম পর্য্যায়ে স্বামীজীর লেখা পুঁথি, বিশেষ করে কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, বীরবাণী, পত্রাবলী প্রভৃতি পুস্তক পড়তে হত। এর সাথে ছিল গীতা। গীতার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় ছিল তাদের কাছে জীবনবেদ। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে অর্জুনের কাছে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশাবলী বিপ্লবীরা প্রাণ ভরে পান করত, তৃপ্ত হত, শক্তি সংগ্রহ করত। ধর্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ করাই ধর্ম। তার জন্যে স্বজন বধও অন্যায় নয়। ধর্ম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্যে সংগ্রাম ধর্মসংগত। শ্রীকৃষ্ণের এ অমোঘ বাণী ছিল বেদমন্ত্রের মতন।

ধর্মশিক্ষার সাথে সাথে পড়া হত ভারতবর্ষের আদি ইতিহাস কথা। ভারতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির কথা। ভারত যে এক সময় সভ্যতার উচ্চশিখরে ছিল, সে সম্পর্কে গর্ববোধ জাগান ছিল এ সকল পুঁথি পড়ার উদ্দেশ্য। পাঠ্য ছিল ভারতবর্ষের পরাধীনতার ইতিহাস। সাম্রাজ্যিক স্বার্থে ইংরেজের ভারতে নিপীড়নের ইতিকথা। রমেশ দত্তের অর্থনৈতিক ইতিহাস, সখারাম গনেশ দেউসকরের "দেশের কথা" এ সকল পুঁথির তাৎপর্য্য নেতৃত্ব ও স্থানীয় কর্মীরা বুঝিয়ে দিতেন। অনেক সময় বহু নতুন কর্মী একত্র হয়েই পাঠ গ্রহণ করত। আমার মনে আছে যেদিন "দেশের কথা" পড়া শেষ করি, সেদিন আমি পুরোপুরি বিদ্রোহী। আমার দৃষ্টি স্বচ্ছ, কর্তব্য নির্দ্ধারিত—পথ উন্মুক্ত। অজানা ভবিষ্যৎ যেন হাতছানি দিযে ডাকছে। যেন বলছে, এগিয়ে এস।

তরুণদের চিত্ত জয় করার জন্য এ এক অভিনব কর্মনীতি। একটি তরুণ স্কুল কলেজে পড়াশুনা করতে করতে যেন অজ্ঞাতসারেই দলের দীক্ষিত কর্মী বনে যেত। এ ভাবে এক ব্রতী দল গড়ে উঠত। Jesuitদের মত সুসংবদ্ধ সংগঠন। এর সব কিছুই গোপন। মন্ত্রগুপ্তি এদের ধর্ম। দলের কোন কথা কারো কাছে বলা নিষেধ। বাপ মা কত না আপনার। কিন্তু তারাও জানতেন না সন্তানের কাজের ধারা। দলের সকল সভ্যই ভাইয়ের মতন। একের জন্য অন্যের কত না মমতা! কিন্তু দলের নেতৃত্ব যাকে যে কাজ নির্ধারণ করবেন, সে কাজের খবর অন্য সহকর্মীদের কাছে বলা অপরাধ। যদি কোন তথ্য ফাঁস হয়ে যায় তা হলে দল বিপন্ন হবে। শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে কোন অভিযান চালাবার সময় অংশ গ্রহণকারীদের কেবল পূর্ব মুহূর্তে সে উদ্দেশ্য জানান হত। এক অপূর্ব শৃঙ্খলা ব্যবস্থা। পুরানো গ্রীসের Spartacus-দের মতন বিপ্লবীদের সংগঠন। এ সংগঠন কতকটা সামরিক কায়দায় পরিচালিত হত। গণতন্ত্রের লেশমাত্র স্থান ছিল না সংগঠনে। দলের মুষ্টিমেয় নেতা বা কোন কোন সময় একজন নেতাই সব কিছু নির্ধারণ করতেন। তবে পরীক্ষিত সহকর্মীদের সাথে আলোচনা হলেও action পরিচালিত হত সামরিক বাহিনীর অনুশাসনে। শুধু নেতার হুকুম মেনে চলা।

গোপনতার ত্রুটির দিকও অস্বীকার করার উপায় নেই। যখন অনেক কিছুই গোপনে হয় তখন সত্য আবিষ্কার করা খুবই শক্ত। কর্মীদের ত্রুটি বিচ্যুতি কিছুটা জানা গেলেও বড়দের দোষ ত্রুটি বিচার করা ছিল শক্ত। যেখানে

প্রকাশ্যে বিচারের অসুবিধা সেখানে নেতৃত্বের ত্রুটি আবিষ্কার করা খুবই শক্ত। এর অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি নেতৃত্বের অসহিষ্ণু হওয়ার প্রবণতা। কারো কারোর ভেতর এক ধরণের dictatorial ভাব দেখা দিত। মানুষের এ ধরণের ত্রুটি বিচ্যুতি হওয়া স্বাভাবিক। তবে বিপ্লবী নেতৃত্ব তাদের সীমিত শক্তি দিয়ে ও সীমিত পরিধিতে ভাল ভাবে কাজ করেছেন এ কথা বলা বাহুল্য।

বিপ্লবী নেতৃত্বের সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিচার করা অপ্রাসঙ্গিক নয়। প্রশ্ন উঠতে পারে যে বিপ্লবী নেতৃত্বের পরিকল্পনা কি ছিল? তাঁরা কি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা ভেবেই তাঁদের সংগঠন চালিয়েছেন? তাঁরা নিজেরা কি বিশ্বাস করতেন তাঁদের নেতৃত্বে ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীন মুক্তি আসবে?

আজ এ সব জটিল প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে। প্রথম সারির বিপ্লবী নেতারা এ সম্পর্কে কোন বক্তব্য রেখে যান নি। রাসবিহারী বসু, যতীন মুখার্জী বা পুলিন দাস এ তিনটি মানুষ ব্যাপক বিপ্লবী সংগঠনের রূপকার। যতীন্দ্রনাথ ও পুলিন বিহারীর সংগঠন বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা ও বিহারে সীমাবদ্ধ। কিন্তু রাসবিহারীর সংগঠন প্রতিভার তুলনা নেই। সারা উত্তর ভারত জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। এঁদের নিজস্ব সুচিন্তিত অভিমত আমাদের কাছে নেই। এঁরা কেউই ইতিহাস লেখেন নি। দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মীদের কেউ কেউ কিছু পুঁথি লিখেছেন। তাদের লেখা অনেকাংশে পক্ষপাত দুষ্ট এবং অত্যন্ত Subjective। অতএব তা ইতিহাসের অংশ নয়।

ইতিহাসের খাতিরে একটি কথা খোলাখুলি বলা ভাল। বিপ্লবীদের ছিল একাধিক দল। দুটি বড় দলের কথা আমরা জানি—যুগান্তর ও অনুশীলন। এ দুই দলের ভেতর বন্ধুভাব ছিলনা এমন নয়। কিন্তু বিরোধও ছিল খুব। এ বিরোধের কারণ কি তা অজানা। দুটি দলের লক্ষ্য ভারতের স্বাধীনতা —পন্থা সশস্ত্র বিপ্লব। যুগান্তর দলের আওতায় ছিল আলাদা আলাদা অনেক গোষ্ঠী। শংকর মঠ, মাদারীপুর, ময়মনসিংহ, সত্যাশ্রম, উত্তরবঙ্গ। এ ছাড়াও ছিল বিপিনদার গোষ্ঠি এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে ছিল বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স, শ্রী সংঘ, সূর্য্য সেনের দল। এরা যুগান্তর ও অনুশীলন কারো সাথেই যুক্ত ছিলনা। অনুশীলন দল সারা বাংলা দেশেই ছিল। সকল জিলায় এর শাখা সমিতি। যুগান্তরের সাথে এদের বিরোধ ছিল কোথায় তা বুঝতে পারিনি।

বিপ্লবী আন্দোলনের দ্বিতীয় অধ্যায় সম্বন্ধে জানি আমি। প্রথম মহাযুদ্ধের আগের পর্বের কথা পুঁথিতে পড়েছি, লোকমুখে শুনেছি, কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান

ছিলনা। আমার মনে হয়, আলাদা আলাদা দলের কারণ ঐতিহাসিক। স্বতস্ফূর্ত্তভাবে গড়ে উঠেছিল অনেক গোষ্ঠি ব্যক্তিগত নেতৃত্বে। তারা আলাদাই রয়ে গেল। কোন কোন ব্যক্তিত্বশালী নেতা এদের অল্পদিনের জন্য একত্র করতে সক্ষম হয়েছিলেন—কিন্তু তাও বেশীদিন টেঁকেনি। গোষ্ঠীমন বিচিত্র। এখানে ব্যক্তিগত নেতৃত্ব বড় হয়ে দেখা দেয়। একবার গোষ্ঠি মানসিকতা বাসা বাঁধলে তা আর দূর করা যায় না। এখানে কোন যুক্তি নেই। সকল দলেই আমরা যারা অপেক্ষাকৃত তরুণ ছিলাম, তারা নিজেদের ভেতর ব্যবধানের কারণ খুঁজে পায়নি। বড়দের গোষ্ঠিমন ছিল বদ্ধমূল। এক এক সময় মনে হত গোষ্ঠিকে বাঁচিয়ে রাখাই এদের উদ্দেশ্য। তার জন্যে সব কিছুই নিখুঁতভাবে করা হত। এও যেন এক ধরণের art। বিভিন্ন দলের পারস্পরিক Protocal ছিল অলিখিত। সমপর্যায়ের নেতারা ছাড়া একে অন্যের সাথে বৈপ্লবিক রাজনীতি ও সাংগঠনিক আলোচনা করতেন না। সকল দলেই এক ধরণের স্তরভেদ ছিল। সেই স্তর সম্পর্কে ছোট বড় সকলেই ছিলেন সজাগ। এমনই গোষ্ঠীমনের খেলা! বিভিন্ন গোষ্ঠীর চলাফেরা, এমনকি লেখাপড়ায় গোষ্ঠী বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ত। প্রত্যেক দলের সাধারণ কর্মীদের ধারণা তার দলের নেতারা সব চেয়ে ভালো, আমার দলের নেতাদের মতন অন্য দলে কোন নেতা নেই। এই গোষ্ঠী মনোভাব বিপ্লবী আন্দোলনের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছে এ কথা বলাই বাহুল্য। এর দায়িত্ব কর্মীদের চেয়ে নেতাদেরই বেশী। হয়ত তাদের অজ্ঞাতসারে নেতৃত্ব হয়েছিল এক ধরণের কায়েমী স্বার্থ। কারণ গোষ্ঠী বন্ধনের উপরে উঠতে দেখেছি কর্মীদের। ১৯২৯-৩০ সালে সকল দলের সজাগ কর্মীদের ভেতর এক আলোড়ন সৃষ্টি হয় আশু কার্য্যক্রম নিয়ে। তখন কিন্তু বিভিন্ন দলের থেকে বেরিয়ে এসে কর্মীরা একত্র হয়ে কাজ করেছে। তখন প্রত্যেকেই আপন আপন দল সম্পর্কে বিরক্ত। এরা বিভিন্ন গোষ্ঠী থেকে বেরিয়ে এসে যে একত্র হয়েছিল—তাতেই প্রমাণ করে কর্মীদের গোষ্ঠীমনের অভাবের কথা। কর্মীরা নেতাদের মতন গোষ্ঠী-মনে বন্দী ছিল না। বিপ্লবীদের ভেতর প্রতিভার অভাব ছিল না। কিন্তু গোষ্ঠী মানসিকতায় ছোঁয়াচ লেগে তা আর বাড়তে পারেনি। নেতাদের ভিতর চিন্তাশীল ও সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ দু' একজন ছিলেন যারা সারা ভারতের ক্ষেত্রে আপন আসন রচনা করতে সক্ষম হতেন। তার প্রমাণ দেশের বাইরে কয়েকজন বিপ্লবী উত্তরকালে অপেক্ষাকৃত বড় ক্ষেত্রে যে কর্মক্ষমতা

দেখিয়েছেন, তা সকলের জানা। তারা বিপ্লবী ছিলেন, কিন্তু গোষ্ঠীমন ছিলনা, এর উদাহরণ রাসবিহারী বসু ও মানবেন্দ্র নাথ রায়। তাই তারা সার্থক, বাংলার বিপ্লবীদের ব্যর্থতা এখানে। অনেক প্রতিভার অপচয় করেছে গোষ্ঠী মন।

১৯২১ সালের মার্চ মাস। গান্ধীজী ও দেশবন্ধুর ডাকে কি অভূতপূর্ব সাড়া! সারা দেশের মানুষ—বিশেষ করে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভেতর কী অভাবনীয় জাগরণ। একটা ঘুমন্ত জাতি যুগান্তের নিদ্রা থেকে উঠে দাড়িয়ে বলল "আছি।" আপনভোলা জাতি ফিরে পেল আত্মসম্বিৎ। এ জাগরণ হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মধ্যে।

তখন রেওয়াজ ছিল ইষ্টারের ছুটিতে সম্মেলন হবে। বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলন, আমরা কয়েকজন ছাত্রবন্ধু সম্মেলনে যাচ্ছি। হঠাৎ শুনলাম দেশবন্ধুও ঐ ষ্টীমারের যাত্রী। আমরা সভয়ে ছুটে গেলাম প্রথম শ্রেণীতে। সেদিন ষ্টীমারের প্রথম শ্রেণীতে যাওয়ার কোন বাধা ছিল না। আমরা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে সৌম্য ও শান্ত মূর্তির পায়ের ধুলো নিই। তিনি মাথায় হাত দিয়ে বললেন "তোমরাও যাচ্ছ?" আমাদের বয়স তখন ১৪।১৫ বছর। এত ছোট বালকেরা প্রাদেশিক সম্মেলনে যাচ্ছে দেখে তাঁর কী আনন্দ! অবাক বিস্ময়ে ব্যক্তিত্বশালী বিরাট পুরুষটিকে খুব কাছে থেকে মুগ্ধ নয়নে বারংবার দেখি। দেশবন্ধু আমাদের সাথেও কথা বললেন, এর চেয়ে আনন্দের কথা কী হতে পারে! লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগলাম। মাটিতে যেন পা পড়ছে না। ষ্টেশনে ষ্টেশনে বিরাট ভীড়। বরিশাল ষ্টেশনে হল রাজকীয় সম্বর্ধনা। মাদারীপুরে শান্তিসেনা সামরিক কায়দায় অভ্যর্থনা জানায় দেশবন্ধুকে।

পরের দিন সম্মেলন স্থরু হল বি, এম, স্কুলের মাঠে বিরাট প্যাণ্ডেলে। অশ্বিনীকুমার দত্ত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, শরৎ গুহ সম্পাদক। অভ্যর্থনা জানালেন অশ্বিনীকুমার। খুব বৃদ্ধ। মাইক্রোফোনের রেওয়াজ হয়নি তখনও। বক্তৃতা ভাল শুনতে পারিনি। কিন্তু বিপিনচন্দ্রের কণ্ঠস্বর মেঘ-গর্জনের মতন। মাইক্রোফোনকে হার মানিয়ে দেয়। জলদগম্ভীর স্বরে তাঁর বক্তব্য রাখেন। শুনে মনে হল কোথায় যেন স্থর কেটে গেছে।

সম্মেলনের সমাপ্তি হল এক বিয়োগ ব্যথার মধ্য দিয়ে। বালক আমরা। আমাদের গায়েও তার ছোঁয়াচ লাগে। এক হিসেবে ভারতের রাজনীতিতে বিপিনচন্দ্রের আকস্মিক বিদায় ছিল এ সম্মেলনে। স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পর বিপিনচন্দ্র। সর্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী। বিদগ্ধ রাজনীতিবিদ। উচুস্তরের সাংবাদিক। বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায়ই পারদর্শী। ১৯০৮ সালে চরমপন্থীদের নেতা ছিলেন বিপিন চন্দ্র। নির্যাতন ভোগ করেছেন তাঁর চরমপন্থী মতবাদ ও কাজের জন্ত। ইতিহাসের বিচিত্র গতি! একদিনের চরমপন্থী বিপিন চন্দ্র রাজনীতি থেকে বিদায় নিলেন নরমপন্থী হিসেবে। বরিশাল সম্মেলনের পর তিনি কংগ্রেসের আন্দোলনের ধারা থেকে দূরেই থাকেন। কেবল ১৯২৪ সালে দেশবন্ধুর সমর্থনে কেন্দ্রীয় আইন সভায় (Legislative Assemblv) নির্বাচিত হন।

প্রাদেশিক সম্মেলনের পর বরিশালে রাজনীতিতে নেতৃত্ব দেন শরৎকুমার ঘোষ, অশ্বিনী দত্ত তখন বৃদ্ধ। শরৎ ঘোষ সুবক্তা ধর্মপ্রাণ। পরিচ্ছন্ন রাজনীতির নাটক। ২১ সালে আমি ছাত্রকর্মী হিসাবে কংগ্রেসের সাথে যুক্ত, ঐ বছরই ১ আগষ্ট বিপ্লবী দলে যোগ দিই।

বিপ্লবী দলের তখন বক্তব্য· গান্ধীজীর আন্দোলনে দেশ স্বাধীন হতে পারে না। বিপ্লবের প্রয়োজন। আমিও সেই বাণী বহন করে নিয়ে যাই বিদ্যালয় থেকে বিদ্যালয়ে। কিন্তু মনে কোথায় যেন একটা অন্ত সুর লুকিয়ে ছিল। তা তখন খুঁজে পাইনি। উত্তরকালে সে সুরটি আবিষ্কার করি। আমি কয়েকমাস 'কংগ্রেসের সেবক ছিলাম। দেশবন্ধু, গান্ধীজীর কথা কাগজে পড়েছি। বিরাট মানুষ এঁরা। এঁদের বক্তব্যকে একেবারে ঠেলে দেয়া যায় না। তাই বিপ্লবী আন্দোলনের সাথে যখন নিবিড়ভাবে যুক্ত হই তখনও আমি কংগ্রেস ছাড়িনি। বিপ্লবী দলে যোগ দেবার মোটামুটি একমাস পরে গান্ধীজী আসেন বরিশালে। পিতার কাছ থেকে সামান্য খরচ নিয়ে আমার অন্তরঙ্গ সহকর্মী হরিভূষণ দাসের সাথে বরিশাল রওনা হই পায়ে হেঁটে। আমার তখন ১৫ বছর বয়স, প্রায় ২৫ মাইল যেতে হবে। এই কাজের জন্তই তখন কত না উন্মাদনা!

গান্ধীজীর আন্দোলন, বিপ্লবীদল সব মিলে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি। সৃষ্টি হয় এক বিচিত্র মানসিকতার। একদিকে চলছে গোপন দলের যাত্রা, আর অন্তদিকে চলছে অসহযোগ আন্দোলনের প্লাবন। এ দুটি ধারায় কখনও সংঘাত, আবার কখনও হয়েছে মিলন।

তিন ঃ অসহযোগ বনাম বিপ্লবী দল

কোন ঐতিহাসিক আন্দোলনের যেমন শুরু আছে, তেমনি আছে তার সমাপ্তিক্ষণ। বাংলা তথা ভারতের বিপ্লবী আন্দোলন এক বিরাট ঐতিহাসিক আবর্ত। ওই আবর্ত বাংলা তথা ভারতের যুবকদের খুব প্রিয়। ওই আবর্তের মধ্যে প্রাণ দিয়েছে শতশত বিপ্লবী নায়ক ও কর্মী। আন্দোলনের দাপটে কেঁপে উঠেছিল বৃটিশ সিংহ। কুখ্যাত রাউলাট এ্যাক্ট বিপ্লবী আন্দোলনের ফলশ্রুতি ছাড়া আর কিছু নয়। এই মহান আন্দোলনের ভূমিকা, এর সার্থকতা বা এর ব্যর্থতা ঐতিহাসিকদের অনুসন্ধানের বিষয়। এর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ বিপ্লবীদের আপন হাতে হওয়া ভালো। কারণ ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক নিষ্করুণভাবে এর বিচার করবে। সেই বিচার এখনো শুরু হয়নি। ওই বিচারের সময় বিপ্লবীদের হাতে রচিত তথ্য ও তত্ত্ব ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে বলে আমার ধারণা। এর অভাবে সত্য উদঘাটিত হবে না। বাংলার বিপ্লবী চিন্তানায়কদের কাছে এই জিজ্ঞাসা আমার।

ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর থেকে সুরু হয় বন্দী-নিবাস থেকে বিপ্লবীদের মুক্তি। কেবল বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি নয়, কোর্টে শাস্তিপ্রাপ্ত বন্দীদেরও। এদের ভেতর প্রথম সারির নেতা ছিলেন পুলিন দাস ও বারীণ ঘোষ। এ ছাড়া ছিলেন বহু কর্মী ও নেতা। তাঁরা মুক্তি পেলেন এই অস্থির অবস্থার মধ্যে। রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে ক্রমবর্দ্ধমান আন্দোলন। গান্ধী তার নেতা। হিংসায় বিশ্বাসী মানুষদের লক্ষ্য করে এ আইন রচিত হলেও তা ভারতবর্ষের সব সংবেদনশীল চিত্তকে নাড়া দেয় প্রচণ্ডভাবে। তখনকার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এ আইন মানুষের স্বাভাবিক অধিকারের উপর আঘাত হিসাবে গ্রহণ করেন। তারই সাথে এল Montagu-Chemsford Reform। এ দুটির বিরুদ্ধে সংগ্রাম দানা বাঁধে। এ সংগ্রামের ফলশ্রুতি জাতীয় সপ্তাহ উদযাপন ও জালিওয়ানালাবাগের বর্বর হত্যালীলা। তখনও Treaty of Severees সাক্ষরিত হয় নি। অতএব খিলাফতের প্রশ্ন ছিল না। তখনকার আন্দোলন পুরোপুরি রাজনৈতিক।

তখন বিপ্লবীদের বিরাট সমস্যা। রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম—সে ত তাদেরই সংগ্রাম। তার উপর পাঞ্জাবের সামরিক আইন ও

জালিনওয়ানালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। এ আন্দোলনের প্লাবনে যোগ না দিয়ে উপায় কি? বারীন্দ্রকুমারের পাশে তখন আর অরবিন্দ নেই। অরবিন্দ তখন শ্রীঅরবিন্দ। বারীন্দ্রকুমার মোটামুটিভাবে রাজনীতি থেকে বিদায় নেন। কিন্তু পুলিনবিহারী গণ আন্দোলনের প্লাবনের ধারাকে এড়িয়ে আবার বিপ্লবী দল সংগঠনের প্রয়াস পান। তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা মানুষ। যেন এক-খণ্ড পাথরে তৈয়ারী। বারীন্দ্রকুমারের মতন তিনি ততটা intellectual নন। কর্মবীর। অহিংসা বা Passive Resistance এ তাঁর লেশমাত্র আস্থা নেই। তিনি অনুশীলন দল পুনর্গঠনের কাজ সুরু করেন। কিন্তু গান্ধীর আন্দোলনের এমন আকর্ষণী শক্তি ছিল যে সব বিপ্লবী কর্মীই অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে বাধ্য হয়। বাংলায় জিলা পর্যায়ে বিপ্লবী কর্মীরা কর্মকর্তাও নির্বাচিত হন। গান্ধীজী পুলিনবাবুকে ডেকে স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের দায়িত্ব নিতে অনুরোধ জানান। দেশবন্ধুর পরামর্শ অনুযায়ী এই সাক্ষাৎকার। পুলিনবাবুর সংগঠন ক্ষমতা সম্বন্ধে দেশবন্ধুর ধারণা খুব উচ্চ। পুলিনবাবু তিনদিন গান্ধিজীর সাথে অহিংসা আন্দোলনের কার্যকারিতা সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেন। কিন্তু তিনি তাঁর আপন মতবাদে অটল। পুলিনবাবুর ভিন্ন মত সত্ত্বেও তাঁর অনুশীলন দলের অনেক কর্মী কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগ দেন। গণ জাগরণের তাগিদ অমোঘ। সে সময় বিপ্লবী-দের নিজস্ব বিকল্প আন্দোলন শুরু করার কোন পরিকল্পনা ছিল না। প্রায় সবাই প্লাবনে গা ভাসাতে বাধ্য হন।

যুগান্তর দলের অবস্থাও অনুরূপ। তারাও সাড়া দেন কংগ্রেসের ডাকে। এ এক বিচিত্র অবস্থা। আন্দোলনে আস্থা নেই—কিন্তু এড়িয়ে যাওয়ারও শক্তি নেই। তার ফলে সৃষ্টি হল এক ধরণের দ্বৈত মানসিকতা। কংগ্রেসকে ছাড়াও যায় না, আবার গেলাও যায় না। ফলে আপন ধারায় বিকল্প আন্দোলনের পরিবর্তে বিপ্লবীরা গ্রহণ করলেন এক ধরণের দ্বিধাগ্রস্থ নীতি। কংগ্রেসের ভিতর থেকেই দল গঠন করার নীতি গ্রহণ করেন তারা। এ এক বিচিত্র সমাধান। এতে কিছু কর্মী যোগাড় করা সহজ হল ঠিকই, কিন্তু সত্যিকার বিপ্লবী Cadre গড়ে ওঠেনি। কর্মীদের আগমন অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে, কিন্তু কাজ করতে হবে ঠিক বিপরীত। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে এ এক বিষম পরিস্থিতি। সেদিনকার বিপ্লবীরা অনুধাবন করতে পারেনি যে এ নীতির ফলশ্রুতি দুদিক দিয়ে ক্ষতিকারক। কংগ্রেসের কর্ম-

পন্থায় বিশ্বাস করেন না, অথচ কংগ্রেসের কাজের দায়িত্ব তাদের উপর। এ ধরণের মানুষ প্রাণ দিয়ে কংগ্রেসের কাজ করতে অক্ষম। তারা বিপ্লবী কর্মী সংগ্রহ করতে ব্যস্ত। অন্যদিকে কংগ্রেসের আপন ধারায় কে কাজ করবে? ফলে কংগ্রেসের কাজে হয় অপূরণীয় ক্ষতি। গান্ধীজীর নির্দেশিত কার্যক্রমের গতি ধর্ম এক, আর বিপ্লবীদের আর এক। মূলত একে অন্যের বিপরীত। ফলে এক হিসেবে গান্ধীজীর মতবাদে অবিশ্বাসী মানুষের উপর তাঁর নির্দেশিত কার্যক্রমের দায়িত্ব ন্যস্ত। এই কারণেই গান্ধীজী নির্দেশিত পথে কংগ্রেসের কাজ বাংলাদেশে হয়নি। কংগ্রেসী ভাবধারায় আন্দোলনে বাংলাদেশ দুর্বল গ্রন্থী। অনেক কর্মী কারাবরণ করেছেন সত্য, কিন্তু বিহার বা গুজরাটের মতন বাংলার জনমানসে কংগ্রেসের কার্যক্রমের প্রভাব সামান্য। বিপ্লবী কর্মীদেরও ক্ষতি হয়েছে প্রচণ্ড। বিপ্লব কর্ম মূলত গোপন। বিপ্লবীদের গোপনতা এমন ছিদ্রহীন যে নিকটতম আত্মীয়দের কাছেও এ ব্রত অজ্ঞাত। মন্ত্রগুপ্তি কংগ্রেসের প্রচারধর্মী কাজের বিরোধী। কংগ্রেসের কাজ আর বৈপ্লবিক মন্ত্রগুপ্তি সাধারণত একত্র চলতে অক্ষম। মানুষের মন প্রচারলুব্ধ। এ লোভ গোপন বিপ্লবী কাজের পরিপন্থী। বিপ্লবী কর্মীরা কংগ্রেসের কাজ অনুসরণ করতে গিয়ে অজ্ঞাতে বিপ্লবী মানসিকতা হারিয়ে ফেলে। অথবা উভয়ই ভালো—উভয় কাজই করব এ ধরনের মানসিকতার সৃষ্টি। বিপ্লব কর্মের দিক থেকে এ ধরণের মনোবৃত্তি ক্ষতিকারক। Split mind—দু'মুখো মন। কংগ্রেসের সক্রিয় কাজ করতে গিয়ে দলের অনেক কর্মী গোপন কাজে রত জঙ্গী কর্মীদের আস্থা হারিয়েছেন।

কংগ্রেসের ভেতর দিয়ে কাজ করার জন্যে বিপ্লবী দলের কলেবর বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু ব্রতী বিপ্লবী কর্মী গড়ে ওঠেনি তেমনভাবে। তার জন্যে সরকারীভাবে যুগান্তর ও অনুশীলন দল, এ পর্যায়ে কোন তাৎপর্যপূর্ণ বৈপ্লবিক কাজ (action) করতে সক্ষম হয় নি। পরের দিকে যেটুকু সামান্য কাজ হয়েছে তা হয়েছে দুটি দলের সরকারী নেতৃত্বের বাইরে। কংগ্রেসের কাজ আর গোপন অস্ত্র সংগ্রহ করা একসাথে হয় না। এদেরও হয়নি। তার উপর ছিল কংগ্রেসের গদী দখল করার আকুল আগ্রহ। তার জন্যে সাধারণ কর্মীদের কংগ্রেসের সভ্য সংগ্রহ করা ও সংশ্লিষ্ট নির্বাচনে জয়লাভ করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকতে হত। ফলে বিপ্লব কর্ম কোন দিক দিয়ে অগ্রসর হতে পারে নি।

এদিকে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন এগিয়ে যাচ্ছে দুর্বার গতিতে। এর গতি রোধ করবে কে? এক কোটি টাকা ও এক কোটি সভ্য সংগ্রহ হলেই এক বছরের ভিতর স্বরাজ। খুব সহজ মন মাতান আহ্বান। সভা ও শোভাযাত্রা ছিল নিত্যদিনের বস্তু। এর ভেতর খিলাফতের সমস্যা যুক্ত হওয়ায় আন্দোলন বেড়ে গেল তীব্রগতিতে।

গণচেতনা রচনায় যাদুকর গান্ধী একের পর এক প্রোগ্রাম জানাতে থাকেন। সারা দেশ ভ্রমণ করেন আলি ভাইদের নিয়ে। এল যুবরাজের অভ্যর্থনা বয়কট। সারা দেশ সাড়া দিল গান্ধীর ডাকে। দেশব্যাপী হরতাল সম্পূর্ণ। স্বেচ্ছাসেবক হওয়া বা খাদি বিক্রয় করা বেআইনি ঘোষিত হয়। দলে দলে কারাবরণ করে স্বেচ্ছাসেবক বিদেশী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করে। সুরু হয় গ্রেপ্তার। দেশবন্ধু প্রমুখ সকল নেতৃবৃন্দ গেলেন কারাগারে। কেউ আত্মপক্ষ সমর্থন করছেন না, উকিল দেবার বালাই নাই। ইংরেজের কারাগার হল পূর্ণ। তখন বন্দীশালা তীর্থক্ষেত্র। ভারতবর্ষের এক অভূতপূর্ব জাগরণ। একটি বিরাট ঘুমন্ত জাতি ঘুম ভেঙ্গে দাঁড়াল আপন পায়ে। কণ্ঠে তাদের গান্ধী ও দেশবন্ধুর জয়ধ্বনি, যেন মন্ত্রবলে জেগে ওঠে মহাভারতের জনতা। এ এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য।

অনুশীলনের বিলুপ্তি ও ভারত সেবক সংঘ

বিপ্লবীরা মাথা গুঁজে ছিল এ ঝড়ের মুখে। মনে কোন শান্তি নেই। যেন অন্যের তৈয়ারী কাজ করার দায়িত্ব। না পারল এ আন্দোলনে প্রাণ দিয়ে যোগ দিতে, না পারল এর বিরোধিতা করে সশস্ত্র বিপ্লবের কথা বলতে। কেবল টিঁকে থাকার সমস্যা। এমনি পরিস্থিতিতে নূতন নীতি নিয়ে এলেন পুলিন দাস। অহিংস আন্দোলনে সামান্যতম বিশ্বাস নেই তাঁর। অহিংস আন্দোলনের বিরাট সাফল্য তাঁকে পথচ্যুত করতে পারেনি। তিনি অবিচল তাঁর সশস্ত্র বিপ্লবের নীতিতে। তিনি বললেন, হুজুগ যাবে কেটে, তখন হবে বিষম অবস্থা। গণজাগরণের বিরাট রূপ স্বীকার করেন তিনি। এই গণ-চেতনার সাংগঠনিক বৈপ্লবিক রূপ দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন "ভারত সেবক সংঘ।" অনুশীলন আর রইল না। ভারত সেবক সংঘের মূল কাজ গঠনমূলক। বিশেষ করে পল্লীতে গঠনমূলক কাজ করা, কুটিরশিল্পের উন্নতিবিধান ছিল সবচেয়ে বড় কাজ। সাথে সাথে কর্মী সংগঠন। অনুশীলন থেকে সেবক সংঘে

পরিবর্তন পুলিনবাবুর গভীর রাজনীতিজ্ঞানের পরিচায়ক। অনুশীলন সমিতির সাথে তাঁর মন ও আত্মা নিবিড়ভাবে জড়িত। অনুশীলন সমিতির স্রষ্টা নন তিনি। কিন্তু অনুশীলন সমিতির প্রসার ও বিস্তারের জন্য তার অবদান সকলের জানা। অনুশীলন সমিতি মানে পুলিনবাবু। তার আবেগময় সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তিনি বুঝলেন যে অনুশীলনের সৃজনধর্মী যুগ বিগত। নতুন অধ্যায়ে চাই নতুন ও পরিবর্ধিত কর্মনীতি। সে কাজ একদিকে কেবল দল গঠন করা অন্যদিকে জনসংগঠন করা। নতুন অধ্যায়ে গণজাগরণের কার্যকারিতা সম্পর্কের তিনি পুরোপুরি সজাগ। গান্ধী তাকে অহিংসার পথে নিয়ে যেতে চান—পুলিন দাস চান সহিংস বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি। সে কাজ হবে দূরে গ্রামাঞ্চলে পল্লী সংগঠনের ভেতর দিয়ে।

ইতিহাসের কী বিচিত্র গতি! অনুশীলন দলের পার্টিগত প্রাণ অবিসম্বাদী নেতা ইতিহাসের প্রয়োজনে অনুশীলন সমিতি ভেঙ্গে দিলেন—রচনা করলেন ভারত সেবক সংঘ। আমার পুলিনবাবুর সাথে ভারত সেবক সংঘ সম্পর্কে আলোচনা করার সুযোগ হয় নি। আমি যখন তাঁর সাথে দেখা করি তখন তিনি দলের বাইরে। দল থেকে নির্বাসিত। কিন্তু ভারত সেবক সংঘের ছাপানো পুস্তিকা ও কার্যক্রম আমি দেখেছি। পুস্তিকাটিকে আধুনিক Policy statement বলা যেতে পারে। এ পুস্তিকাটি আমার হাতে প্রথমদিন দিলেন যতীন রায় ওরফে ফেগু রায়। তখন ১৯১১ সালের নভেম্বর মাস। কিশোর মনে প্রশ্ন উঠেছে, এর সাথে বিপ্লবের যোগ কোথায়? কোথায় সশস্ত্র সংঘর্ষের প্রোগ্রাম! কী হবে এ ধরণের কাজ দিয়ে? নেতাদের কাছে জিজ্ঞেস করে খুব সদুত্তর পাইনি। তাদেরও খুব পরিষ্কার ধারণা ছিল না। তারা মনে করতেন যে এর আড়ালে আবডালে সশস্ত্র সংগ্রামের কাজ করা সহজ হবে। তারা ভেবেছিলেন যে এ ধরণের নিরামিষ গঠনমূলক কাজ করলে সরকারী কোপদৃষ্টি পড়বে না দলের উপর। তারা ভারত সেবক সংঘকে মনে করেছেন এক ধরণের ক্যামোফ্লাঝ। তারা মনে করতেন যে তারা অনুশীলন—ভারত সেবক সংধ বাইরের আবরণ মাত্র।

পরের জীবনে অতীতের স্মৃতি চারণ করে মনে হয়েছে যে পুলিনবাবুর পরে যে সকল প্রথম সারির নেতা ছিলেন, তাদের ভারত সেবক সংঘ সম্পর্কে কোন বিশ্বাস ছিল না। পুলিনবাবু তাদের সাথে এ বিষয় নিয়ে দিনের পর দিন গভীর আলোচনা করে তাদের মন নূতন সুরে তৈয়ারী করেন নি। প্রকৃতি-

গত ভাবে তিনি দলের আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন না। তিনি ভাবতেন যে তাঁর নরেন সেন, প্রতুল গাঙ্গুলী, রমেশ আচার্য্য প্রভৃতি কর্মীরা ১৯০৬-৭ সালে যেমন ছোট ছিলেন—এখনও ঠিক তেমনি আছেন। তাদের সাথে সমপর্যায় আলোচনা করার কথা বোধ হয় কখনই তাঁর মনে ওঠেনি। প্রয়োজন বোধে তাদের সাথে পরামর্শ করতেন, কিন্তু কোন সংবিধানসম্মত বাধ্যবাধকতা ছিল না।

ভারত সেবক সংঘের উচ্চতম কার্যকরী সমিতিতে পুলিনবাবুর সাথে আর পাঁচ জন। পুলিনবাবু অধ্যক্ষ। সহকারী অধ্যক্ষ নরেন সেন, কোষ লেখক রমেশ আচার্য্য ; আর তিন জন সভ্য হলেন নলিনী কিশোর গুহ, প্রতুল গাঙ্গুলী ও রমেশ চৌধুরী। সংঘের অফিস ছিল ৯৩/১ মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীটে। পুলিনবাবু ঐ অফিসের এক অংশে থাকতেন। নরেনবাবু ও প্রতুল-বাবু থাকতেন ঢাকায়। বাকি সকলে কলকাতায়। ঢাকায় ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী সংগঠন। পুলিনবাবুর মনে যাই থাকুক, তাঁর সহকর্মীরা ভারত সেবক সংঘের প্রোগ্রাম কার্যকরী করতে সচেষ্ট হন নি। তাদের মনে এ প্রোগ্রামে আস্থা ছিল না। তারা ছাত্র যুবক সভ্য সংগ্রহ করার কাজে জোর দেন বেশী।

দল চালাতে হলে অর্থের প্রয়োজন। বিশেষ করে সর্বক্ষণের কর্মীদের সকল দায়িত্ব দলের। ১৯১৭-১৮ সাল পর্য্যন্ত অর্থ সংগ্রহ হত ডাকাতির মাধ্যমে। এক একটি ষড়যন্ত্র মামলার জন্য খরচ প্রচুর। তার উপর অস্ত্র কেনার অর্থ। বোমা তৈয়ারীর খরচ। সবার উপর আত্মগোপনকারী ও সর্বক্ষণের কর্মীর খরচ। এর জন্য কী অর্থের প্রয়োজন তা পুলিনবাবু জানতেন। ডাকাতি করার কুফলও ছিল তাঁর জানা। অথচ অর্থ তাঁর চাই। তার জন্যে একটি ব্যবস্থা করেন তিনি।

বাংলায় প্রথম সারির নেতারা সকলেই পুলিনবাবুর পরিচিত। দেশবন্ধু থেকে সুরু করে শ্রীশ চাটার্জী পর্যন্ত সকলেই পুলিনবাবুর গুণমুগ্ধ। এছাড়া প্রাক অসহযোগ যুগের বাংলায় তথাকথিত নরমপন্থী নেতারাও জানতেন পুলিনবাবুর কার্যক্ষমতা। বি· সি· চাটার্জী, ইন্দুভূষণ সেন, সুরেন হালদার, এস· আর· দাস প্রভৃতি প্রখ্যাত ব্যারিষ্টাররা ছিলেন পুলিনবাবুর ভক্ত। এরা সকলেই বাংলায় অসহযোগ নীতির বিদ্বেষী মানুষ।

বাংলাদেশে গান্ধী বিরোধীদের দুর্গ ছিল খুব শক্তিশালী। ১৯২০ সালের

কলকাতায় বিশেষ অধিবেশন পর্যন্ত এ গোষ্ঠি গান্ধীনীতির বিরোধিতায় ছিল সোচ্চার। এ গোষ্ঠির নেতা ছিলেন দেশবন্ধু স্বয়ং। এরা মোটামুটিভাবে লোকমান্য তিলকের অনুগামী। গান্ধী নীতির বিরোধিতা করার জন্যে দেশবন্ধু একটি বিশেষ ট্রেণ ভাড়া করে প্রতিনিধি নিয়ে যান নাগপুর সম্মেলনে। এ প্রতিনিধিদের অধিকাংশ ছিলেন প্রাক্তন বিপ্লবী। প্রাক্তন বিপ্লবীরা ছিলেন তিলক মহারাজের ভক্ত। চতুর ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তিনি ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে দেশবন্ধুকে তাঁর মতানুবর্তী করতে সক্ষম হন। বাংলার প্রতিনিধিরা দেশবন্ধুর মত পরিবর্তনে হতবাক। দেশবন্ধুর মতবদলের পর দুর্বলতা দেখা দেয় গান্ধী-বিরোধী দুর্গে। বাংলায় ফিরে দেশবন্ধুর অনুগামীরা তার সাথে গেলেন না। অহিংস অসহযোগের বিরোধিতা করার জন্যে তারা জোট বাঁধেন। এরা একটি নূতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন যার নাম Citizens Protection League। এরা ব্যক্তিগতভাবে সকলেই সমৃদ্ধশালী। এ নতুন গোষ্ঠির কাজ করার জন্য সক্রিয় কর্মী প্রয়োজন। তাদের সাথে কোন সক্রিয় কর্মী ছিল না, কারণ কংগ্রেস সরকারীভাবে গান্ধী নীতি গ্রহণ করেছে। ফলে ওই গোষ্ঠি সমর্থন প্রত্যাশা করেন বিপ্লবীদের কাছ থেকে, কারণ বিপ্লবীদের অহিংস মন্ত্রে বিশ্বাস নেই। বিভিন্ন বিপ্লবী গোষ্ঠীর সাথে তাদের আলোচনা হয়। আলাদা আলোচনার মাধ্যমে তারা বিপ্লবীদের দ্বিধাগ্রস্থ চিত্তের আভাস পান। তখনও বিপ্লবীরা মনস্থির করতে পারেন নি। ব্যতিক্রম কেবল পুলিনবাবু। কংগ্রেস বিরোধী গোষ্ঠি পুলিনবাবুর দিকে আকৃষ্ট হন। পুলিনবাবুকে সদলে Citizens Protection Leagueএ যোগদানের জন্যে অনুরোধ জানান। পুলিনবাবু তাতে রাজী হন নি। তিনি তার ভারত সেবক সংঘের মাধ্যমে নির্ধারিত কর্মসূচী অনুসরণ করার কথা জানান। তিনি আরও জানান যে ভারত সেবক সংঘের কর্মসূচী C.P.L. এর চেয়ে আলাদা। কেবল অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপারে তারা একমত। সুতরাং C.P.L. এ যোগ দেয়ার প্রশ্ন ওঠে না। পরে আপোষ হয় যে ভারত সেবক সংঘ অসহযোগ বিরোধিতার কাজের জন্য অর্থ সাহায্য পাবে C.P.L-এর থেকে। সেই প্রচার কাজেব জন্যই কিছুদিন অর্থসাহায্য আসে C. P.L, এর থেকে। আমার যতদূর খবর জানা তাতে এই অর্থে Calcutta Printing works নামে একটি প্রেস কেনা হয়, এবং 'হক্ কথা' নামে একটি বাংলা বুলেটিন বের করা

হয়। আর প্রকাশিত হল সাপ্তাহিক "শঙ্খ" পত্রিকা। 'হক কথা' মূলত অসহযোগ বিরোধিতার জন্য প্রকাশিত। কিন্তু "শঙ্খ" সরাসরি বিপ্লবী আন্দোলনের মুখপত্র। শঙ্খ কাগজে নলিনী কিশোর গুহের "বাংলায় বিপ্লববাদ" ও শচীন্দ্র নাথ সান্যালের "লেনিন ও সমসাময়িক রাশিয়া" এ দুটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ তরুণদের মনে খুব সাড়া জাগায়। শঙ্খে রবীন্দ্রনাথের একাধিক কবিতা, প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বিপিন পালের প্রবন্ধও পড়েছি আমরা কোন কোন সংখ্যায়।

হক কথা মোট ৫টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। C.P.L. এর সাথেও সম্পর্ক বেশিদিন টেঁকেনি। তার প্রধান কারণ একে অন্যের সুবিধা নেওয়ার প্রচেষ্টা। এ ধরণের বিষম সম্পর্ক বেশীদিন টেঁকে না। গৌণ কারণ ১৯২২ সালে ৫ই ফেব্রুয়ারীর চৌরিচরা হত্যাকাণ্ডের পর আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার এবং ১০ই মার্চ মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তার।

C.P.L. এর সম্পর্ক নিয়ে অনুশীলন দলের আভ্যন্তরীন বিরোধ অত্যন্ত দুঃখজনক। এ সম্পর্ক নিয়ে পুলিনবাবুর সাথে তার সহকর্মীদের বিরোধ। পুলিনবাবু ও সহকর্মীদের ভেতর ব্যবধান ছিল খুব গভীর। সহকর্মীরা ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক দুরদৃষ্টি, সাংগঠনিক শক্তির দিক দিয়ে ছিলেন পুলিনবাবুর অনেক পেছনে। প্রকৃতিগতভাবে পুলিনবাবু dictatorial। বিপ্লবীদলে নেতা কারো কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নন এ ছিল তাঁর ধারণা। নেতা অভ্রান্ত তার কথা কর্মীদের শোনা বাধ্যতামূলক। এ আচরণবিধিতে বিশ্বাসী ছিলেন পুলিনবাবু।

আর এক কারণ ছিল জনমানসিকতা। অসহযোগ আন্দোলন প্লাবনের মত সবকিছু ভাসিয়ে নিয়েছে। এর জনসমর্থন বিপুল। এ ব্যাপক জন-আন্দোলনের সম্মুখে ভারত সেবক সংঘ খানিকটা কোনঠাসা হয়। ভারত সেবক সংঘ কংগ্রেসের আন্দোলনের বিরোধী, অতএব ইংরেজের পক্ষে, এ ধরণের পরিকল্পিত প্রচারের বন্দী হয়েছিলেন নরেনবাবু, প্রতুলবাবু প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ। Populism এর কিছুটা গতিবেগ আছে। এই Populism এর ভয় পেলেন নরেনবাবু, প্রতুলবাবু প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ। তাঁরা কংগ্রেসের ভেতর থেকে কাজ করার পক্ষে ছিলেন। যুগান্তর দল এ নীতি অনুসরণ করে ব্যাপক-ভাবে। পুলিনবাবু ঢাকা ছাড়া সব জেলাতে কর্মীদের কংগ্রেস ত্যাগ করতে বাধ্য করিয়েছেন সত্য, কিন্তু পদত্যাগ করে কর্মীরা সর্বদাই অস্বস্তি বোধ

করেছেন। পুলিনবাবু C.P.L. এর সাথে যোগ রক্ষার পক্ষপাতী, আর তার সহকারীরা এর ঘোরতর বিরোধী। এরা সকলে পুলিনবাবুর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে। ভারত সেবক সংঘ আর রইল না।

আমি তখন বরিশালে। জেলার ভারপ্রাপ্ত নেতা ছিলেন সতীশ পাকড়াশী। সতীশবাবুকে "আমরা কারা" একথা জিজ্ঞেস করে কোন সহজ-বোধ্য উত্তর পাই নি। তিনি বলেন "আমরা আবার অনুশীলন হলাম।" কিন্তু অনুশীলন কোথায়? প্রকাশ্য ভাবে ত অনুশীলন নেই। Informally রইল। কতটা গোপন, কতটা প্রকাশ্য। তার মানে কোথাও নয়। অস্তিত্ব হয় একান্ত গোপন নতুবা প্রকাশ্যে থাকবে। কিন্তু আধা গোপন ও আধা প্রকাশ্য যেন স্থিতি নয়। কোনদিন অনুশীলন নামে কোন দল Sign Board দিয়ে স্থাপিত হয়নি। ভারত সেবক সংঘ ছিল প্রকাশ্য সংগঠন।

প্রকাশ্য নয় গোপনও নয় এ অবস্থা খুব অনুর্বর। গোপন দলের Romance নেই আবার প্রকাশ্য দলের Glamour ও নেই। এক কথায় কিছুই নেই। Romance নেই বলে তরুণদেব আকর্ষণও জমে না। গোপন বিপ্লবী দলের কোন এক স্তরে গোপনে রাখা আগ্নেয়াস্ত্র দেখাতে হয়। কারণ Romance। অস্ত্র আইন না থাকলে এ Romance থাকে না। তার পরের পর্যায়ে ঐ পিস্তল বা রিভলভার ব্যবহার করার Romance। এ অধ্যায়ে যুগান্তর, অনুশীলন ও অন্যান্য বিপ্লবী গোষ্ঠী ছিল এ ধরণের Private organisation। কংগ্রেস হল প্রকাশ্য—বিপ্লবী দল অপ্রকাশ্য। এ সকল দলের তীব্র গতিবেগ হয় না—হতে পারে না।

পুলিনবাবুর গঠনমূলক কাজ সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন ধারণা ছিল কিনা সে সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত কোন খবর নেই। কিন্তু গান্ধী আন্দোলনের জোয়ারের মুখে দাঁড়িয়ে যিনি বলতে সাহস করেন "আমি আছি" "তোমার সাথে নেই আমি" এ দুঃসাহসের তারিফ না করে উপায় নেই। যে মানুষ ১৯২১ সালে দেশের কুটিরশিল্পের প্রসারের জন্য সংগঠন রচনা করেন—প্রকাশ্য আন্দোলনের আবেগের সাথে যুক্ত হতে অস্বীকার করেন, সে কী একান্তই নির্বোধ ও কল্পনাশক্তি হীন? যতদিন যাচ্ছে ততই এ প্রশ্ন আমার চিত্তকে নাড়া দিয়েছে।

গুজব উঠেছিল যে পুলিনবাবু অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধীতা করার জন্য সরকারী পক্ষের লোকে পরিণত হয়েছেন। এতবড় নির্বোধ, অশালীন

উক্তি আর হতে পারে না। সব ইতিহাসেই এ ধরণের কথা ওঠে। লেনিনের "Sealed Train" এর দুর্নামের অপপ্রচার আমাদের জানা। এ গুজবের লক্ষাংশের এক অংশও যদি সত্যি হত তা হলে পুলিনবাবুকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লাঠিখেলা শিখিয়ে জীবনধারণ করতে হত না। আমি দেখেছি, ব্যায়াম সমিতিতে দিনের পর দিন এসেছেন তিনি তার চিরাচরিত সাদামাঠা পোষাকটি পরে। আমরা কখনও কখনও গিয়েছি তাঁর কাছে—জিজ্ঞেস করেছি অনেক কথা। কোন অভিযোগ করেন নি তাঁর সহকর্মীদের বিরুদ্ধে—যে সহকর্মীরা তাকে দল থেকে সরিয়ে দেবার জন্য দায়ি। জীবনের অপরাহ্ন বেলায় যখন চলে যান তিনি, কেউ তার সাথে যায়নি। কাউকে টানার চেষ্টা করেন নি তিনি। অনুশীলন সমিতি তথা ভারতের বিপ্লবের ইতিহাসে এত বড় Tragedy আর নেই।

বিপ্লবী মনে দ্বিধা

যুবরাজের আগমন উপলক্ষেই অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ ওঠে শিখর দেশে। হাজারে হাজারে মানুষ আইন অমান্য করে কারাবরণ করে। সমস্ত জাতি দাঁড়িয়ে জানায়, আমরা অন্যায় মানব না, প্রতিরোধ করব তার বিরুদ্ধে বৃটিশ সরকার বিধাতার অভিশাপ Satanic Govt., মহাত্মা গান্ধীর এ বাণী ছড়িয়ে পড়ে দেশের সর্বত্র দাবাগ্নির মতন। এ যেন যাদুকরের ভোজবাজী। জনজাগরণের এ মহিমাময় দৃশ্য ভোলা যায় না। কয়েকমাসের মধ্যে দেশ কোথায় ছিল—আর এগিয়ে এসেছে কোথায়? ছাত্র, যুবক, উকিল, ব্যারিষ্টার, অধ্যাপক আপন আপন বৃত্তি পরিত্যাগ করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এসে বলে "অভী"। কেউ কি কখনও কল্পনা করেছেন যে দেশবন্ধু দাশের বাড়ীর মেয়েরা রাস্তায় রাস্তায় খাদি বিক্রয় করে বেড়াবেন! খাদি ত উপলক্ষ্য মাত্র। কোথাও ছিল এক আকর্ষণকারী চুম্বক। তার টানে সবাই রাজপথে দাঁড়িয়ে। পরাধীন দেশের গ্লানির সকল ধুলা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে উঁচু গলায় জানাল "আমরা আছি"। এর আগে কত না এসেছিল ডাক। তিলক, অরবিন্দ, বিপিন পাল, লাজপত রায়, এ্যানি বেসান্ত, ডাক দিয়েছে সকলেই—কিন্তু সাড়া মেলেনি। এমন করে কখনও মেলেনি। এ কী কেবল গান্ধী দেশবন্ধুর জন্য? না এর জমি তৈয়ারী হয়েছিল ধীরে ধীরে?

সারা ভারতে এই প্রথম জন আন্দোলন। তার সাড়াও বিপুল। কিন্তু

গান্ধীজী ১৯২২সালে প্রথম দিকে বারদৌলিতে আইন অমান্য স্থগিত রাখলেন। জাগ্রত মানুষকে Marching Order দিলেন না। হিংসার প্রশ্নকে খুব বড় করে দেখলেন তিনি। উত্তরকালে বিক্ষুব্ধ জনতার হিংসাকে তিনি আর বড় স্থান দেন নি। ১৯৩০ সালে গণহিংসা হয়েছে এবং ৪২ সালেও হয়েছে প্রচণ্ড-ভাবে। ১৯২২ সালে তিনি অহিংসার প্রশ্ন বড করে দেখেন। তার ফল ভাল হয়নি।

দেশবন্ধু প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ একে ভাল চোখে দেখেন নি। ২২ সালে দেশবন্ধু মুক্ত, গান্ধী বন্দী। দেশবন্ধু পরিবর্তন চাইলেন আন্দোলনের ধারায়। যে গণজাগরণ বিরাট তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিল ২১ সালের শেষে, তা স্তিমিত। বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে দেশবন্ধু, মতিলাল, বিটলভাই প্যাটেল, লাজপত রায় প্রভৃতি রাষ্ট্র ধুরন্ধররা চাইলেন পরিবর্তন। সে পরিবর্তন হল আইন সভায় প্রবেশ করে সংগ্রাম পরিচালনা করা—প্রাদেশিক পর্যায়ে মন্ত্রীসভা গঠন অসম্ভব করে তোলা। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হল মণ্টফোর্ড রিফর্মকে সম্পূর্ণ ভূয়ো প্রতিপন্ন করা। আইনসভা বয়কট করে কংগ্রেসের বাইরের মানুষের নির্বাচন যখন বন্ধ করা যায় নি—তখন ঐ আসনগুলি দখল করে সংগ্রাম পরিচালনা করা সঙ্গত। এছাড়া কংগ্রেসের অন্যান্য গঠনমূলক কাজের কোন পরিবর্তন প্রয়োজন নেই। এ পরিবর্তনকামী নেতৃবৃন্দ তথা দলকে বলা হল Pro-Changer। আর যারা পরিবর্তন বিরোধী তারা No-Changer।—মূলতঃ গান্ধীজীর মূল কার্যক্রমে বিশ্বাসী কর্মীরা। এদের নেতৃত্ব দিলেন রাজা গোপাল আচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত তরুণ নেতৃবৃন্দ। ২২সালে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয় গয়াতে। দেশবন্ধু নির্বাচিত সভাপতি। এখানেই পরিবর্তনকামীরা রচনা করেন স্বরাজ দলের। দেশবন্ধু সভাপতি—মতিলাল নেহেরু সম্পাদক।

কংগ্রেসের অভ্যন্তরে শক্তি পরীক্ষার লড়াই শুরু হয় এ দুই গোষ্ঠীর ভিতর। শেষ পর্যন্ত দিল্লীর বিশেষ অধিবেশনে একটি কার্যকরী আপোষে পৌঁছান নেতৃবৃন্দ। এ আপোষ স্বরাজ্য দলের জয় সূচনা করে। এর পরে ধীরে ধীরে কংগ্রেসের মুখ্য ধারা রূপে দেখা দিল স্বরাজ্য দল। ১৯৩০ সালে এ ধারার সমাপ্তি। এ পর্য্যায় কংগ্রেসের মূল প্রোগ্রাম ছিল সংসদীয় কাজ।

কংগ্রেসের এ পরিবর্তন বরণ করে নেয় বাংলার বিপ্লবীরা। তারা সকলেই আগে হোক পরে হোক স্বরাজ্যদলকে সমর্থন করেন। অনুশীলন

সমর্থন করে গয়া সম্মেলন থেকেই। যুগান্তর দল কিছুটা সময় নেয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে। বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে তখনও গান্ধী সমর্থকদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা—শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী সভাপতি, ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ সম্পাদক। দুটি গোষ্ঠির ভিতর দ্বন্দ্ব খুব তীব্র। বাংলার সংবাদপত্র সকলেই দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে। ব্যক্তিগতভাবে এ সময়ের একটি ঘটনায় আমি সাক্ষী। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে আমি I. A. পড়ছি তখন। এ সময় বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সভা ডাকা হয়। বরিশাল গান্ধী-বাদীদের দুর্গস্বরূপ। শরৎ ঘোষ ছিলেন পরিবর্তনবিরোধী। এখানে সমবেত ছিলেন বাংলার নেতৃবৃন্দ। দু দলই লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। শ্যামসুন্দর বাবু, প্রফুল্লবাবু, মাখন সেন প্রমুখ No Changer রা এলেন। স্বরাজ্য দলের প্রথম সারির সকল নেতা হাজির। সুভাষচন্দ্র, কিরণশংকর রায়, হেমন্ত সরকার প্রভৃতি এলেন দেশবন্ধুর সাথে। দেশবন্ধুর সাথে এলেন একজন অপ্রত্যাশিত মানুষ। অভ্যর্থনা করার জন্য নেতাদের সাথে আমরাও প্রথম শ্রেণীর কামরায় যাই দেশবন্ধুকে সম্বর্ধনা জানাতে। স্বেচ্ছাসেবক তথা স্বরাজ্য দলের কর্মী আমরা। ষ্টীমারে গিয়ে শুনতে পাই যে দেশবন্ধুর সাথে এসেছেন শরৎবাবু। শরৎবাবু নামে ত কোন কংগ্রেস নেতার নাম শুনিনি কখনও। দেখলাম দেশবন্ধুও তার সাথে সমীহ করে বাক্যালাপ করছেন। সাদাসিধে মানুষটি। মাথায় এলোমেলো বড় বড় চুল। সাধারণ পাঞ্জাবীর চেয়ে একটু লম্বা একটি পাঞ্জাবী গায়ে। হাতে একটি সিগারেটের কৌটা ও দেশলাই। বরিশালের নেতৃবৃন্দ কেউ এ মানুষটিকে চেনে না। পরে খোঁজ নিয়ে জানলেম, ইনি হচ্ছেন অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে দেখে কর্মীদের কত না আনন্দ। এই সেই শরৎবাবু। তিনিও কংগ্রেসের নেতা এ কথা জেনে পরম তৃপ্তি লাভ করি। দেশবন্ধু ও শরৎবাবু ছিলেন অশ্বিনীবাবুর বাড়ীতে। স্বতই সেখানে লোকের ভীড। বিকালে গিয়ে দেখি বাড়ীর উঠোনের তমাল গাছটিতে ঝুলছেন শরৎবাবু। উপেন ব্যানার্জীকে বললেন "দেখ আমার অন্তরে বৃন্দাবনের ভাব উদয় হচ্ছে উপেন"। উপেনবাবু বললেন, কৃষ্ণ কালো তমাল কালো তাইত কালো ভালবাসি। দেশবন্ধুকে দেখার চেয়ে শরৎবাবুকে দেখার জন্য ভীড বেশী।

বিকেলে বি· এম· স্কুলে প্রাদেশিক বৈঠক সুরু হয়। মিটিং কিছুক্ষণ চলার পর দেশবন্ধু সদলবলে বেরিয়ে আসেন। তার বক্তৃতাকালে জনৈক সভ্য

চীৎকার করে ওঠে "Sit down fool"। দেশবন্ধুর প্রতি বাংলাদেশে এমন কটুক্তি করতে পারে তা ভেবে মানুষ অবাক। ইচ্ছা করে একাজ করেছেন একজন। যিনি করেছেন তাকে আমি জানি। তার নাম উল্লেখ করার লোভ সম্বরণ করলেম। বাংলার রাজনীতিতে তিনি খুবই পরিচিত মানুষ। স্বরাজ্য দল ও দেশবন্ধুকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য না করেছেন এমন কাজ নেই, বিশেষ করে সংবাদপত্রের সকল অপপ্রচার এই মানুষটির জন্য। দেশবন্ধু যা বলতেন—ঠিক তার বিপরীত ছাপা হত সংবাদপত্রে। তার জন্যে পরের দিকে দেশবন্ধু Forward ও 'বাংলার কথা' নামে দুখানি দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন।

কিছুদিন পরে বিশেষ করে দিল্লী অধিবেশনের পর থেকে কংগ্রেস ও স্বরাজ্য দলের ভেতর ব্যবধানের সীমারেখা কেটে যায়। স্বরাজ্য দল ত কংগ্রেস বিরোধী ছিল না। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে একটি বিশেষ মতাবলম্বী গোষ্ঠী। স্বরাজ্য দলের সদস্যরা মূলত কংগ্রেস সভ্য। কংগ্রেস মোটামুটি ভাবে স্বরাজ্য দলের কার্যক্রম গ্রহণ করার পর আর আলাদা অস্তিত্ব ছিল না।

স্বরাজ্যদল গঠিত হওয়ার পর পুলিন দাস বর্জিত অনুশীলন ফিরে এল কংগ্রেসে। দেশবন্ধুর কর্মনীতি গান্ধী কর্মনীতি থেকে কিছুটা আলাদা, এটাই ছিল সান্ত্বনা। দেশবন্ধু ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ। গান্ধীর মতন লক্ষ্যের চেয়ে পন্থার উপর অতটা জোর দিতেন না তিনি। গান্ধীজী দার্শনিক রাজনীতি-বিদ, আর দেশবন্ধু নির্ভেজাল রাজনীতিজ্ঞ। Irelandএর পার্নেল ছিল তার আদর্শ। হিংসায় বিশ্বাস ছিল না দেশবন্ধুর। গণ আন্দোলন এবং সংসদের ভেতর তার বলিষ্ঠ প্রতিফলন এই ছিল তার মৌল নীতি। একটি অন্যটিকে সমৃদ্ধ করবে, এই ছিল তার বিশ্বাস। সন্ত্রাসবাদ তথা হিংসাত্মক কাজের বিরোধী ছিলেন তিনি। আবার বিপ্লবীদের বাদ দিয়েও তিনি কাজ করতে চাননি। বিপ্লবীদের আন্তরিকতায় তাঁর বিশ্বাস ছিল খুব। তাদের কংগ্রেসের কাজে নিবিড়ভাবে যুক্ত করতে পারলে ভাল হবে, এ ছিল তার বিশ্বাস। বিপ্লবীদের হিংসাত্মক কার্যধারা থেকে সরিয়ে আনার প্রবল ইচ্ছা ছিল তাঁর। তাঁর হিংসাত্মক কাজে অবিশ্বাস এবং বিপ্লবীদের কাজ সম্পর্কে তাঁর অসন্তোষ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে একটি পত্রে প্রকাশ। এর জন্যে খুবই দুঃখ করেছেন দেশবন্ধু। বিপ্লবীদের কর্মধারার সাথে তাঁর বিরোধ সিরাজগঞ্জ সম্মেলনে প্রকাশ পায় নি। তা খোলাখুলি ভাবে ফুটে ফরিদপুর সম্মেলনে।

ফরিদপুর সম্মেলনের বহু আগেই তার প্রতীতী হয় যে তাঁর আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে এসেছে। তার জন্যে এক ধরণের স্বাভাবিক ব্যাকুলতা ছিল তাঁর মনে। মৃত্যুর পূর্বে সীমিত ফল লাভের আশায় মন্থন হত তাঁর মন। আইন-সভায় প্রবেশ করার ফলে দেশের কী অগ্রগতি হয়েছে—বাস্তবে তা দেখতে চেয়েছেন তিনি। তাঁর ফরিদপুরে সভাপতির বক্তৃতা এর সাক্ষী। বার্কেনহেড (Birkenhed) ছিলেন রক্ষণশীল দলের প্রথম সারির তিনজন নেতার অন্যতম। আমার যতদূর জানা, বার্কেনহেডের সাথে কোনরূপ আপোষ আলোচনা হয়েছিল তখন। দেশবন্ধুর বক্তৃতায় নরম সুরের প্রধান কারণ তাই। মহাত্মা গান্ধী তখন কংগ্রেস সভাপতি। তিনি উপস্থিত ফরিদপুর সম্মেলনে। গান্ধীজী সাধারণত কোন প্রাদেশিক সম্মেলনে উপস্থিত থাকতেন না। কিন্তু ফরিদপুরে গান্ধীজীর উপস্থিতি ফরিদপুরবাসীর গর্বের বিষয়। একসাথে দুই শ্রেষ্ঠ নায়কের উপস্থিতি। দেশবন্ধুর আপোষ মনোভাবে গান্ধীর সমর্থন ছিল। সম্মেলনে উপস্থিতিই তার প্রমাণ।

গান্ধীজীর দেশবন্ধুর রাজনৈতিক বিচারের উপর অগাধ বিশ্বাস। এই দুই নেতার ভিতর কোন বিরোধ হয়নি। স্বরাজ্য পার্টি হওয়া সত্বেও। যখন কোন প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রাম জারি নেই—তখন সংসদীয় সংগ্রামের ভূমিকা ছোট করে দেখেন নি গান্ধী। উত্তরকালে তিনি বলেছিলেন যে "Parliamentary mentality has come to stay."

বিপ্লবীরাও সংসদীয় সংগ্রামে বিশ্বাস করতেন সাময়িক কর্মকৌশল হিসেবে। গান্ধীনীতি সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল খুব অপরিষ্কার। বিপ্লবীরা কংগ্রেসের পুরোভাগে এলেন, কিন্তু নতুন অধ্যায়ে কোন সক্ষম কার্যকরী বিপ্লব নীতি গ্রহণ করতে ব্যর্থ হন। এ অধ্যায় বন্ধ্যা বললেও অত্যুক্তি হয় না।

গান্ধীর আসার পর, বিশেষ করে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর রাজনৈতিক কেন্দ্র-বিন্দু বাংলা থেকে চলে যায়। কংগ্রেস আন্দোলনের আবেদন নিবেদনের নীতিতে সমাপ্তি রেখা টেনে দেন গান্ধী। অবসান হয় হাল্কা সৌখীন রাজনীতির। নেতৃত্বের কেন্দ্রস্থল বার লাইব্রেরী নয়—জনতা। কংগ্রেসের ভেতর সাধারণ মানুষকে নিয়ে এলেন গান্ধী বিপুলভাবে। এতদিন আন্দোলন ছিল বুদ্ধিজীবী ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। গান্ধী সে বদ্ধজাল কেটে দিয়ে নিয়ে এলেন নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও গ্রামের মানুষকে। অসহযোগ আন্দোলন জনমানসকে উদ্বুদ্ধ করেছে প্রচণ্ডভাবে। দেশবন্ধু

ছিলেন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং সংগ্রামের আবেদন জন-চিত্তকে প্রবল সাড়া জাগায়। মুসলমানদের অগাধ বিশ্বাস ছিল দেশবন্ধুর উপর। বেঙ্গল প্যাক্ট তাঁর গভীর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক। তিনি বুঝেছিলেন, চাকুরী প্রভৃতি সকল ব্যাপারে মুসলমানরা অবহেলিত। তাই মুসলমানদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার দিতে চেয়েছিলেন বেঙ্গল প্যাক্টের (Bengal pact) মাধ্যমে। বাংলাদেশ পাঞ্জাবের মতন মোসলেম প্রধান দেশ। এখানে মোসলেম জনতাকে জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। খিলাফতের অবিচারের জন্যে বাংলার মোসলেম জনতা এসেছে দলে দলে। বাদশা মিঞা, মৌলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদ, মৌলানা আক্রাম খান, মহম্মদ ইয়াসিন এবং সহিদ সারওয়ার্দীর মতন প্রথম সারির মানুষ এসেছিলেন কংগ্রেসের ছত্রছায়ায়। খিলাফতের আন্দোলন স্তিমিত হওয়ার সাথে সাথে মোসলেম মনকে বাঁধতে হবে নতুন তারে। এখানে থাকবে না খিলাফতের মতন কোন ধর্মের কুয়াশা। দেশবন্ধুর বেঙ্গল প্যাক্‌ট এ শুভ বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত।

এ কথা অনস্বীকার্য যে দেশবন্ধু মহাপ্রয়াণে বাংলার অপূরণীয় ক্ষতি। মোসলেম জনতা বাংলা কংগ্রেসের পতাকাতল থেকে চলে যায় ধীরে ধীরে। আর এ সময় থেকেই কংগ্রেসে বাংলার নেতৃত্ব লোপ পায়।

বিপ্লবীদের বন্ধ্যা নীতি

ভারতীয় রাজনৈতিক মানচিত্রে বাংলাদেশ স্থান নিল পেছনের সারিতে। এর প্রধান কারণ বাংলা কংগ্রেসের গণভিত্তির অভাব। অসহযোগ আন্দোলনে ভাঁটা সুরু হওয়ার পর বিভিন্ন বিপ্লবী দল জিলা কংগ্রেসের অধিকারী হয়। মোটামুটি সকল বিপ্লবী দল যুবক ও ছাত্র শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। গোপনে কাজ করার জন্য নিষ্ঠাবান ব্রতী কর্মীর প্রয়োজন, কৃষক, মজুর, সাধারণ অশিক্ষিত জনসাধারণের কোন কার্যকরী বিপ্লবী ভূমিকা নেই এই ছিল তাদের ধারণা। আইরীশ বিদ্রোহীরা ছিল বিপ্লবীদের আদর্শ। সিনফিন দল সুসংগঠিত যুবশক্তির সাহায্যে যে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল ঠিক তেমনি করতে চেয়েছেন তারা। ড্যানব্রীনের একটি পুস্তিকা বিপ্লবী তরুণদের হৃদয় জয় করে। যুবকদের সাহায্যে গেরিলা যুদ্ধই ছিল আদর্শ। তার জন্য সাধারণ জনতার কোন কার্যকরী ভূমিকা নেই। আদর্শ বিপ্লবী নায়কের একটি চিত্র এঁকে-

ছিলেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র তার "পথের দাবী" উপন্যাসে। ডাক্তার সব্যসাচীকে জিজ্ঞেস করা হয়, কৃষক মজুরদের কেন তিনি বিপ্লব যজ্ঞে নিয়ে আসছেন না? উত্তরে ডাক্তার বলেন ওদের দিয়ে বিপ্লব হয় না। ওদের জন্য অন্নসত্র খোলা যেতে পারে মাত্র—বিপ্লব আনবে শিক্ষিত ভদ্র যুবক শ্রেণী। শরৎচন্দ্র বাংলার বিপ্লবীদের অন্তরের কথা জানিয়েছেন তার অননুকরণীয় ভাষায়। মোটামুটি ভাবে এ ছিল বিপ্লবী মানসিকতা।

জাতীয় চেতনা যখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গণ্ডি ছাড়িয়ে সাধারণ মানুষের মনে প্রবাহিত হয়েছে তখন কেবল ছাত্র যুবকদের মধ্যে কাজ সীমিত রাখার সার্থকতা কি? সার্থক রুশবিপ্লব এক অভূতপূর্ব ঘটনা। ওখানকার খবর ধীরে ধীরে প্রবেশ করেছে ভারতবর্ষে। Vanguard বলে একখানি ইংরেজী পত্রিকা ও মানবেন্দ্র নাথ রায়ের India in Transition বইখানি আমাদের হাতে এল। Vanguard এর পরে এল Advanced Guard. উভয় পত্রিকার সম্পাদক এম. এন. রায়।

নূতন দিগন্তের এ সকল ইশারা সত্বেও বিপ্লবীদের যুদ্ধপর্ব অধ্যায়ের প্রোগ্রামের রদবদল হয় নি। বিপ্লবীদের বড় দুটি দল মোটামুটিভাবে ব্যক্তিগত হত্যার নীতিতে বিশ্বাস করত না। অনুশীলন দল সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত ধারণা আছে। এ দল terrorism এর বিরোধী ছিল, চাইত insurrection। যুবকদের সাহায্যে insurrection। কতকটা Easter rising এর মতন।

এ অধ্যায়ে যুগান্তর অনুশীলন কোন দলই action এ যাওয়ার পক্ষে ছিল না। কিন্তু যুবকদের মনে চঞ্চলতা থাকা স্বাভাবিক। ছিলও প্রচুর। কর্মীদের সশস্ত্র বিদ্রোহের উদ্দেশ্যে শিক্ষা দেয়া হবে, কিন্তু ঐ প্রোগ্রাম কার্যকরী হবে না—এমনি মতবাদ একেবারেই অচল।

এ সময় কলকাতা ও তার আশেপাশে কয়েকটি ডাকাতি হয়। শাখাড়ি-টোলা পোষ্ট অফিস লুঠ ও সোনা ডাকাতি। শাখাড়ীটোলা ঘটনায় একটি যুবক ধরা পড়ে। এসব ডাকাতির ভাল ফল হয় নি। কিছুদিন পরে টেগার্টকে ভুল করে ডে সাহেবকে হত্যা করে গোপীনাথ সাহা।

এসকল ঘটনা হওয়ার সাথে সাথে সরকার ১৮১৮-র ৩নং আইনে বিনা বিচারে আটক করেন নেতৃবৃন্দকে। ধৃত নেতাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। কিন্তু ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয় ১৯২৪ এর সেপ্টেম্বরে। গোয়েন্দা বিভাগের

রিপোর্টে এ সকল গ্রেপ্তার হয়। ভারত সরকার যে পাগল হয়েছিল সে কথা বলা বাহুল্য। না হলে সুভাষচন্দ্র ও অনিলবরণ রায়কে গ্রেপ্তার করে কোন স্থির বুদ্ধির সরকার! আমলাতন্ত্রের পক্ষে সবই সম্ভব।

লিটন গভর্নর না হলে হয়ত এ ধরণের গ্রেপ্তার হত না। কারণ বড় দুটি দল কেউ নিছক সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী ছিল না। বন্দীনিবাসে ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জীর সাথে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল আমার। তাঁর মতবাদ ছিল নিছক সন্ত্রাসবাদ থেকে বহু দূরে। অনুশীলন দলের সক্রিয় কর্মী হিসেবে অনুশীলনের কথা আমি জানতাম। এ অধ্যায়ে অনুশীলন দলের ভেতর জন্ম দেয় এক নতুন চিন্তাধারা। এ ধারাটি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে। এসময় রাশিয়া থেকে আসেন প্রখ্যাত কম্যুনিষ্ট নেতা অবনী মুখার্জী। India in Transition এই বইটি অবনী মুখার্জীর সহযোগিতায় প্রকাশ করেন এম এন. রায়। অবনী মুখার্জী এম. এন. রায়ের মতই কম্যুনিষ্ট সাহিত্যে পণ্ডিত ব্যক্তি। অনুশীলন দল সোভিয়েট রাশিয়ার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনুশীলনের তরফ থেকে রাশিয়ায় যান শ্রীগোপেন চক্রবর্তী। তখন অনুশীলনের প্রথম সারির নেতারা সকলেই কারাগারে। ১৫ সালের গোড়ার দিকে গ্রেপ্তার এড়িয়ে থাকতে পেরেছেন কেবল নরেন্দ্রমোহন সেন। তখন শচীন সান্যালকেও নিয়ে আসা হয় বাংলাদেশে। তাঁকে বাংলার ভার দিয়ে নরেনবাবু বাইরে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু কিছুদিনের ভেতর উভয়ে গ্রেপ্তার হন। প্রথম শচীনবাবু—তারপর নরেনবাবু। এ দুজন গ্রেপ্তার হওয়ার পর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে কোন অভিজ্ঞ নেতা ছিলেন না। কতকটা Decentralisation এর মতন। কলকাতার ভার ছিল যতীন দাস ও প্রেম রঞ্জন গুপ্ত, মুর্শিদাবাদ ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, রাজসাহী বিভাগ নরেন দাস, ময়মন সিংহ ঢাকা সুরেশ দে, কুমিল্লা ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যোগেশ চক্রবর্তী। বরিশালে দেবেন ঘোষ। কিছুদিনের মধ্যে দেবেনবাবু ছাড়া একের পর এক সকলে গ্রেপ্তার হন। বাছাই করা গ্রেপ্তারের ফলে সংগঠন ভেঙ্গে পড়েনি। কেবল উপর থেকে কয়েকজন সক্রিয় কর্মী ও নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। যুগান্তর দলের এমনি অবস্থা। তলার সংগঠন ভাঙ্গেনি—কেবল নেতারা ছিলেন না।

এ পর্যায়ে অনুশীলন দল দু-একটি action ছাড়া সংগঠন বাঁচান ও বাড়ানোর দিকেই মন দেয়। প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে অর্থের জন্য

ডাকাতির রাস্তা পরিহার করেছে অনুশীলন। ১৯২২ সাল থেকে নোট ছাপানোর পন্থা গ্রহণ করে পার্টি নেতৃত্ব। ১০০্ ও ১০্ টাকার নোট ছাপানোর ব্যবস্থা হয়। ১০০্ টাকার নোটটি ভাল হয়নি। ১০্ টাকার নোট ছিল চলন সই। আমরা বহু নোট চালিয়েছি। একবার ধরা পড়ে যাই একখানি নোট চালাবার সময়। তখন ১৭ বৎসর বয়স। নির্দোষ প্রমাণ করতে বেশী বেগ পেতে হয় নি।

নোট জালের ব্যাপারে মহেশ্বরদী গ্রামে ধরা পড়েন প্রবোধ দাসগুপ্ত ও শচীন চক্রবর্ত্তী। দুজনেরই ৭ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড হয়। এর পর নোট জালের সকল যন্ত্রপাতি আমি নিয়ে যাই উত্তর বঙ্গে। পুলিশের চোখ এড়িয়ে সকল যন্ত্রপাতি এক স্থান হতে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া ছিল খুব কষ্টসাধ্য। ঢাকা থেকে সবকিছু নিয়ে যাওয়া হয় রংপুর জিলায় উলিপুরে। উলিপুরে প্রায় ১মাস নোট ছাপানোর চেষ্টা হয়। আমাদের expert ছিল আশু রায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের ছাত্র। তার সাথে সহযোগিতা করে রংপুরের সুশীল দেব ও আমার বাল্য বন্ধু হরিভূষণ দাস। কিন্তু বহু প্রচেষ্টা করে আমরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হই। কোন চলনসই নোট ছাপাতে পারা যায় নি।

টাকার জন্য চাপ ছিল খুব। বিশেষ করে কাবেরী ডাকাতির পর। ওখান থেকে কয়েকজন আত্মগোপনকারী চলে আসে বাংলাদেশে। তার মধ্যে শচীন বকসী অন্যতম। রাজসাহীর অম্বিকা মৈত্র তখন বারানসী হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারীং এর ছাত্র। তিনি নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন উত্তর প্রদেশের সংগঠনের সাথে। উত্তর প্রদেশের অনুশীলনের সংগঠন মূলতঃ যোগেশ চট্টোপাধ্যায়ের সৃষ্টি। ১৯২১ সালে শেষের দিকে যোগেশবাবুকে পাঠান হয়েছিল দল গঠনের উদ্দেশ্যে। তিনি সেখানে শক্তিশালী সংগঠন তৈরী করেন। পাবনা জিলায় সাহিরি মোহনপুর গ্রামের রাজেন লাহিড়ী উত্তর প্রদেশের বিশিষ্ট কর্মী। উত্তরকালে তার ফাঁসী হয় রামপ্রসাদ বিসমিল্লা ও আশফাকউল্লার সাথে। রাজেন লাহিড়ীর ভাই মনীন্দ্র মোহন ও অমূল্য লাহিড়ী পাবনা জিলায় অনুশীলনের বিশিষ্ট কর্মী।

কাকোরী মামলায় পলাতকদের খুব সাবধানে রাখি। তারা রাজসাহী ও রংপুরেই বেশীরভাগ সময় কাজ করতেন। আত্মগোপন করার সার্থক কৌশল শিখেছিলাম শ্রদ্ধেয় নরেন সেনের সাথে একত্রে কাজ করে। খুব সাবধানী মানুষ ছিলেন তিনি। যাতায়াতের সময় ট্রেন ও ষ্টীমার বর্জন করে চলতেন।

পায়ে হেঁটে যাওয়াই ছিল রেওয়াজ। রাত্রিযাপন করার স্থান কখনো পূর্বাহ্নে বলা হত না। যেখানে রাত্রে থাকতাম তা কখনও কাউকে জানাতাম না। হঠাৎ বেশী রাতে কোন বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে থেকে যেতাম। আবার ভোরে যাত্রা হত শুরু। এমনিভাবে পায়ে হেঁটে নরেনবাবুকে নিয়ে ঢাকা থেকে কলকাতা যাই। যেতে প্রায় ১৫ দিন লাগে। বিক্রমপুর থেকে নৌকা যোগে মাদারীপুর মহকুমায় নাড়িয়া গ্রামে পেঁছাই। নাড়িয়া থেকে প্রতি ২।৩ মাইল পরপর ছিল দলের সংগঠন। অতএব যেতে কোন অসুবিধা হয় নি। পালং ও মাদারীপুর হয়ে পায়ে হেঁটে আসি বরিশাল। প্রায় ৮০ মাইল। তারপর বরিশাল থেকে পিরোজপুর ৪০ মাইল। পিরোজপুর থেকে গেলাম বাঘের হাট, তারপর খুলনা। এমনি করে কলকাতা পেঁছাই। কলকাতার কাজ শেষ করে আমরা যাই শান্তিনিকেতনে শ্রীকালিমোহন ঘোষের সাথে দেখা করার জন্য। আমাদের সাথী শ্রীমনীন্দ্র রায় ছিলেন শ্রীনিকেতনের কর্মী। মণিবাবুকে খুব স্নেহ করতেন রবীন্দ্রনাথ। অনেক গোয়েন্দা পুলিশ মণিবাবুকে বিরক্ত করত। কবিগুরুর হস্তক্ষেপের জন্যে মণিবাবুর গায়ে আঁচরটি লাগে নি। কালীমোহনবাবুর সাথে দেখা করার উদ্দেশ্য, বৈদেশিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা। বিশেষ করে জাপানে রাসবিহারী বসুর সাথে। কালীমোহনবাবুর পক্ষে জাপানে সংযোগ স্থাপন করা ছিল সহজ সাধ্য। আমরা যখন ১৯২৫ সালে শান্তিনিকেতনে যাই—তখন ইটালীর কার্লেফেরমিকি ও টুসি ছিলেন ওখানে। শান্তিনিকেতন সহজ, সরল ব্যবস্থায় খুব তৃপ্ত হই। ওখানে প্রবেশ করার সাথে নতুন পরিবেশের আস্বাদ পাই। গুরুদেবের সাথে দেখা করায় ইচ্ছা ছিল খুবই। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। দূর থেকে প্রণাম জানাই বিশ্বের সত্যদ্রষ্টা ঋষি কবিকে।

শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে গিয়ে নরেনবাবু ঢাকায় গ্রেপ্তার হন। নরেনবাবু ছিলেন শেষ নেতা—যিনি কেন্দ্রায়িত দল পরিচালনা করতে সক্ষম। তারপর শুরু হল বিকেন্দ্রীকরণ। এ পর্যায়ে চট্টগ্রামে একটি action হয়—আর কলকাতার নিকটে দক্ষিণেশ্বরে বহু কর্মী ধরা পড়ে। বহু বিস্ফোরক দ্রব্য পাওয়া যায় সেখানে। উত্তরকালে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা শুরু হয় এর থেকে। দক্ষিণেশ্বরের সাথে শেষ হল এ পর্যায়ের প্রত্যক্ষ সন্ত্রাসমূলক কর্মসূচী।

আলিপুর জেলে হত্যা

ওই মামলার বিচারাধীন বন্দীদের রাখা হয় আলিপুর নতুন কেন্দ্রীয় কারাগারে। আলিপুর জেলে পাশাপাশি কয়েক সারি আলাদা আলাদা সেল আছে। এ সেলগুলি আবার বিভক্ত ছিল আলাদা আলাদা ওয়ার্ডে। এই ওয়ার্ডগুলি একটির পেছনে আর একটি। সেলুলার ওয়ার্ডের পাশে পাশেই একত্র বাস করার জন্য তিনটি বড় বড় ওয়ার্ড। এর প্রথম দুটি হাজত। শেষটিকে বলা হত Segregation ward, সাধারণ কয়েদি বলত সিক্রিষণ। সেগ্রিগেশনে থাকতেন বিনা বিচারে আটক বন্দীরা। এ বাড়িটি দোতালা। পাশের সেলগুলিও দোতালা। সেগ্রিগেশনে যেতে হলে সেলের পাশের একটি খুবই সরু রাস্তা দিয়ে যেতে হয়। এ ছাড়া অন্য কোন রাস্তা নেই। সেলুলার ওয়ার্ড থেকে ছোট দরজা দিয়ে এই সরু পথে বের হওয়া যায়। এ দরজায় একটি সিপাহী মোতায়েন থাকত। আর সেগ্রিগেশনের পাহারার ভার ছিল একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সার্জেন্টের উপর।

এ সময় রাজনৈতিক গোয়েন্দা বিভাগের সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় অফিসার ছিলেন ভূপেন চ্যাটার্জী। গোয়েন্দা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি হলেন ডি. আই. জি। তার নীচে তিনজন স্পেশাল সুপারিনটেনডেন্ট। ভূপেন চ্যাটার্জী তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী কর্মচারী। খুব দক্ষ অফিসার বলে তার খ্যাতি। বিপ্লবী দলের ভেতরও তার নিজের লোক ছিল। খুব মিষ্টভাষী। গীতা উপনিষদ খুব আওড়াত। সে গোয়েন্দা বিভাগের কার্যভার গ্রহণ করেছিল কেবল বিপথগামী যুবকদের শুদ্ধি করার জন্যে। সরকারী কাজ ছিল নাকি তার ধর্মচর্চার অংগ। তার ব্যাপক গোয়েন্দা সংগঠনের দৌলতে কোন action হওয়ার পূর্বে ধরে ফেলত বিপ্লবীদের। দক্ষিণেশ্বর মামলা চালাবার দায়িত্ব ছিল তার। ভূপেনবাবু মাঝে মাঝে জেলের ভেতরে আসতেন আটক বন্দীদের সাথে কথা বলার জন্যে। নরেন সেন তখন ঐ জেলে আটক বন্দী। তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় ব্রহ্মদেশে ইন্‌সিন্ জেলে। কিন্তু নরেনবাবুকে কিছুতে স্থানান্তরিত করতে পারছেন না পুলিশ। নরেনবাবু গ্রেপ্তারের পর থেকে গেরুয়া বাস গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন খুব রামকৃষ্ণ ভক্ত। তার পুরানো বহু সাথী রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সারির সন্ন্যাসী। তিনি কখনও কখনও আপনাকে রামকৃষ্ণানন্দ বলতেন। অন্য সকলে তাঁকে নরেন মহারাজ বলে ডাকতেন। অনুশীলন দলের বিশাল সংগঠন গড়ে

তোলার ব্যাপারে তাঁর অবদান পুলিনবাবুর পরেই। সহজ তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক বিচার শক্তির অধিকারী। খুব নিরাসক্ত সাধকের মতন মানুষ। নিজের দলের ছাড়াও অন্যান্য দলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন তিনি। নরেন মহারাজকে পুলিশ খুব সমীহ করে চলত। যতবারই তাকে ট্রানসফারের হুকুমনামা জারি করেছে কোন না কোন অজুহাতে তা ব্যর্থ হয়েছে। নরেন মহারাজ বলতেন যে তিনি স্বেচ্ছায় রাজী না হলে তাঁকে কেউ ইনসিন্ জেলে স্থানান্তরিত করতে পারবে না। তিনি খোলাখুলি বলে বেড়াতেন যে ভারতবর্ষে তার কাজ বাকি আছে, তা শেষ না হলে কিছুতেই ব্রহ্মদেশে যাবেন না তিনি। ভীষ্মের স্বেচ্ছা মৃত্যুর মতন তার ছিল স্বেচ্ছা Tran·fer। বড় পুলিশ অফিসারদের ভেতরও এ ধারণা ছিল প্রবল। একবার দিন ধার্য হয় তাকে ইন্সিন্ জেলে পাঠাবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। খুব বমি হচ্ছিল সেদিন। ভূপেন চ্যাটার্জীর কাছে খবর গেল যে নরেন মহারাজ অসুস্থ। এ অবস্থায় তাকে স্থানান্তরিত করা সম্ভব নয়। ভূপেন চ্যাটার্জী বিশ্বাস স্থাপন করতে পারল না আলিপুর জেলের কর্তৃপক্ষের রিপোর্টের উপর। সরেজমিনে দেখার জন্যে নিজেই চলে এল জেলের ভেতর। এসে দেখে যে নরেন মহারাজ সত্যিই অসুস্থ। ব্রহ্মদেশের জেলে পাঠানো অসম্ভব। নরেন মহারাজ সেদিনও জানান যে তাঁর যাওয়া তাঁর ইচ্ছাধীন। পুলিশ তাকে কিছুতেই পাঠাতে পারবে না।

তখন ছটা বেজে গেছে। সকল বন্দীদের আপন আপন কক্ষে বন্ধ করা সম্পূর্ণ। কেবল আটক বন্দীদের রাত ৯টায় বন্দী করা হত। সমস্ত জেলটি নীরব। সর্বত্র নীরবতা ও শান্তি। যেন শ্মশানের শান্তি। এমনি অবস্থায় রওনা হল গোয়েন্দা বিভাগের অধিকর্তা ইউরোপীয় পোষাকে সজ্জিত, ভূপেন চ্যাটার্জী বাঁ হাতে টুপি। পায় পায় চলেছে গেটের পানে। আটক বন্দীদের ওখান থেকে ৩০ হাত যেতেই খুলে গেল দক্ষিণেশ্বরের বন্দীদের ওয়ার্ডের দরজা। তাদের ভেতর দুজন নমস্কার করে বলেন যে তাদের কিছু বক্তব্য আছে। কথা শুনে চ্যাটার্জী দাঁড়িয়ে পড়ে। সাথে সাথে বেরিয়ে আসে আরো কয়েকজন। হাতে লোহার খাটের মশারির সরু লোহার ডাণ্ডা। সেকেণ্ডের মধ্যে ধমাধম ডাণ্ডার আঘাত পড়ে চ্যাটার্জীর খোলা মাথায়। তার মুখ থেকে কেবল একটি বাক্য বেরুল "এ কী অসভ্যতা"। আর নয়। মরীয়া হয়ে বন্দীরা মেরে মেরে প্রায় মৃত অবস্থায় ফেলে দিল গলি রাস্তার উপর। যখন এ ঘটনা

চলে তখন দেখেছিল দাঁড়িয়ে আটক বন্দী ওয়ার্ডের ইংরেজ ওয়ার্ডার—আর কয়েকজন আটক বন্দী। আর দেখেছিল পেছনের গোরা ডিগ্রির এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বন্দীরা। তখন পর্য্যন্ত কোন পাগলা ঘন্টি বাজেনি। ডেটিন্যু ওয়ার্ডের সার্জেণ্ট ছাড়া আর কেউ এ কাণ্ড দেখতে পায়নি। সে বন্দীদের এ হত্যাকাণ্ড দেখে দিশাহারা হয়ে কেবল বলতে থাকে "Babu they are killing Rai Bahadur" (ভূপেনবাবুর রায় বাহাদুর উপাধি ছিল)। এ ঘটনা এমন অপ্রত্যাশিত এবং দ্রুত নিষ্পন্ন হয় যে সার্জেণ্ট ভুলে গিয়েছিল তার বিপদ সূচক বাঁশী বাজাতে। রায়বাহাদুর রাস্তায় লুটিয়ে পড়ার পর বাজল বাঁশী। নিরবিচ্ছিন্ন পাগলা ঘন্টি বাজতে থাকে। ছুটে এল সকল অফিসার সকল সিপাই। যে যেখানে ছিল সবাই এল। Alarm Bell এর এই নিয়ম। এসে দেখে এই ভীষণ কাণ্ড। মিঃ চ্যাটার্জীকে তখুনি স্থানান্তরিত করা হয় পি. জি. হাসপাতালে। সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

হুলুস্থুলু হল সরকারী মহলে। এত বড় অফিসার! তাকে খুন। ভাগ্য-দেবী সুপ্রসন্ন ছিল বন্দীদের উপর। নতুবা এমনি সময় তাদের আপন কুঠরীতে বন্ধ থাকার কথা। কোন ত্রুটীর জন্যে ওদের বন্দী করা হয় নি। তার জন্যেই এ সুবর্ণ সুযোগ পরিকল্পনানুযায়ী কাজ সম্পূর্ণ হয় নিখুঁতভাবে। কিন্তু এ কাজ সম্ভব হত না যদি অফিসের ঘড়ি সেদিন প্রায় ২০।২৫ মিনিট পিছিয়ে না থাকত। শেষ পর্যন্ত ঘড়ির মন্থর গমন ছাড়া আর কাউকে প্রত্যক্ষ-ভাবে দায়ী করা সম্ভব হয় নি। ডেটিন্যু ওয়ার্ডের সার্জেণ্ট সব কিছুই অস্বীকার করে। সাক্ষী হিসেবে সে বলে যে পুলিশ সুপার বেরিয়ে যাওয়ার পর সে দরজা বন্ধ করে দেয়। সে কিছুই দেখেনি। সে এ ব্যাপারে ডেটিন্যুদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে। সে সাক্ষী দিলে দুজন ছাড়া আরো বেশী লোকের ফাঁসী হত।

ফাঁসীর আগের দিন মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত বন্দীরা কেউ-উ ঘুমান নি। সারা রাত ধরে তারা গান গেয়েছেন। ওদের সাথে আর একটি সেলে আর একজন অরাজনৈতিক অবাঙ্গালী সম্ভবতঃ পাঞ্জাবী বন্দীও ফাঁসীর অপেক্ষায় ছিল। সে রাত ভোর এ দুজন তরুন যুবককে উৎসাহ দিয়েছে। বারংবার হিন্দীতে চীৎকার জানায় "মরতেত একদিন হবে। তোমরা বীর।" অবশ্য অনন্ত হরি মিত্র বা প্রমোদ চৌধুরী এর কোন প্রয়োজন ছিল না। তারা ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান গাওয়ার জন্যই প্রস্তুত। কিন্তু এই উদার হৃদয়, সাহসী,

অরাজনৈতিক বন্দীর আবেগের প্রশংসা না করে উপায় নাই। সেদিন আলিপুর জেলের সকল রাজনৈতিক বন্দী জানিয়েছে তাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম এ-অজ্ঞাত ও অজানা মৃত্যুঞ্জয়ী বীর শহিদদের প্রতি।

বন্দী নিবাসের রাজনীতি

১৯২৫ সালের এপ্রিল থেকেই আত্মগোপন করতে বাধ্য হই। তখন আমি রাজশাহীতে। কলেজে পড়ি। হঠাৎ একদিন গোয়েন্দা পুলিশের খুব আনাগোনা। রাজশাহীতে গঙ্গার ধারে এক কোঠার একটি ঘরে থাকতাম। পাড়াটি সম্পূর্ণভাবে আমাদের কর্মীদের আয়ত্তে। সেখানে দিনের বেলা গ্রেপ্তার করা সম্ভব নয়। ঘন ঘন বাড়ী। যে কোন বাড়ী ঢুকে দূরে চলে যাওয়া সম্ভব ছিল। গ্রেপ্তার করতে হলে এক বিরাট মহল্লা ঘিরে ফেলতে হবে। তাতেও পারা যাবে কিনা সন্দেহ। কারণ সকল বাড়ী এক সময় তল্লাসী করা সম্ভব নয়। তার জন্যে ওরা ঠিক করে যে রাত ২।৩ টার সময় আমার ছোট ঘরটি ঘেরাও করে বিছানা থেকে গ্রেপ্তার করবে আমাকে। রাত ১১টা পর্য্যন্ত আমার বাসায় আমরা অনেক মানুষ গল্প গুজব করি। গোয়েন্দা পুলিশ শেষ রাউণ্ডে দেখল যে আমি বাড়ীতে রয়েছি। পুলিশের পরিকল্পনা অনুযায়ী রাত ৩টায় ঘেরাও করে বাড়ী। সকালে দরজা ধাক্কা দেওয়ার পর দরজা গেল ভেঙ্গে। ক্রুদ্ধ ও হতাশ হয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বলে—"The gentleman has gone to his lady love" পাড়ার কর্মীরা নিকটেই দাঁড়িয়ে ছিল। তারা একথা শুনে হেসে আকুল। গোয়েন্দা পুলিশের দক্ষতার উপর স্বতঃই চোট লাগে। তারপর থেকে সর্বদাই আমার পেছনে ছিল পুলিশ। ১৯২৬ সালে অক্টোবর মাসে গ্রেপ্তার হই আমার বাড়ীতে। রাত তিনটার সময় খবর পেলাম যে সারা বাড়ী ঘিরে ফেলেছে পুলিশ। আমাকে পাওয়া সত্ত্বেও জঘন্যভাবে তল্লাশী চালায় পুলিশ। চাল, ডাল পর্য্যন্ত সব তছনছ করে মাটিতে ছড়িয়ে দেয়। গৃহস্থ বাড়ী। কিন্তু ওর ভেতরও বোমা পিস্তল খোঁজ করে। মা ওর ভেতরই তল্লাশী শেষ হতে হতে আমার জন্য ভাত ডাল খাবার ব্যবস্থা করেন। মা'র কোন তুলনা হয় না। ছেলে জেলে চলে যাচ্ছে কিন্তু তখন তাঁর স্নেহাশীর্বাদ ও লালন পালন করার কোন ত্রুটি নেই। মাকে প্রণাম করি। মা খুব কাঁদছিলেন। ভারাক্রান্ত চিত্তে হেঁটে এক ফারলং দূরে নদীর ধারে যাই। স্বয়ং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার Steam Launch নিয়ে এসেছে বরিশাল থেকে। আমার পেছনে পেছনে

গ্রামের বহু মানুষ। পিতা আমার সাথে সাথে। লঞ্চে ওঠার পূর্বে পিতাকে প্রণাম করি। প্রণাম করার সময় তাঁর পায়ে এক ফোঁটা জল পড়ে। বাবা কেবল বললেন "চললে তুমি"। আমি কোন জবাব না দিয়ে দ্রুত পায়ে লঞ্চে উঠে গেলাম।

দালান্দা হাউস ও স্থানান্তর

পরের দিন সকাল ১০টায় শিয়ালদহ ষ্টেশনে নেমে দেখি কলকাতা গোয়েন্দার বড় বড় অফিসার অভ্যর্থনা করার জন্য দাঁড়িয়ে। ট্যাকসীতে উঠে চালককে বলল "নাচগলি"। আমার বয়স ২০ বছর। পুলিশের বেশী কিছু জানি না। গোয়েন্দা পুলিশের নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাহিনী শুনেছি প্রচুর। নাচগলি Dancing Lane কী জানতাম না। কিন্তু শিখ গাড়িচালক তা জানত। পরে শুনলাম Elysium Row বর্তমান লর্ড সিনহা রোডের নাম নাচগলি। এ গলিতে তখন ১৩ ও ১৪ নং বাড়ীতে ছিল বাংলা ও কলিকাতা গোয়েন্দা পুলিশের কেন্দ্রীয় দপ্তর। ১৩ নম্বর বাড়ী অপেক্ষাকৃত বড়। পার্ক ষ্ট্রীট অঞ্চলের টিপিকাল ইংরেজদের বড় বাড়ী। চারদিকে দেয়াল। ভেতরে লন। গাড়ীবারান্দাওয়ালা বড় বাড়ী। কাঠের বড় সিঁড়ি। কার্পেট পাতা। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে কোন শব্দ হয় না। আওয়াজ না হওয়া সম্বন্ধে খুব সাবধানতা। আমাকে নিয়ে যখন ইন্‌সপেকটরের পর্য্যায়ের অফিসার "বড় সাহেবদের" ঘরে যাচ্ছিল—তখন মার্জারের মতন পা টিপে টিপে এগোচ্ছিল তারা।

এই বাড়ীর কাহিনী একটি অলিখিত ইতিহাস। সব কথা কেউ-ই জানে না। অত্যাচার তথা Third degree method কত যে হয়েছে তার কোন হিসাব নেই। এখানকার ছোট কুঠুরী ছিল স্বীকারোক্তি আদায় করার কেন্দ্র। জায়গা ছিল "দালান্দা হাউস"। সব কিছুই হত এই দালান্দা হাউসে।

বিপ্লবীরা সকলেই তরুণ। ২৫ বছরের উপর বয়স ছিল কম লোকের। সকল দিক দিয়ে অপরিণত। একমাত্র মূলধন অন্তহীন দেশপ্রেম, দুর্জয় সাহস ও ব্রতীজাবন। দু-চারজন দুর্বল চিত্তের মানুষ ছিল না এমন নয়। ১৮।১৯ বছরের বালকের উপর Third Degree Method প্রয়োগ করতে হয়ত কেউ কেউ স্বীকারোক্তি করেছে ঠিকই। পরে হয়ত বুঝতে পেরেছে

তাদের ত্রুটি। এর জন্যে বিপ্লবীদের খেসারত দিতে হয়েছে। অনেক সময় শারীরিক অত্যাচার সয়েছে তারা, কিন্তু হার মেনেছে পুলিশের শঠতার কাছে। কোন সাধারণ কর্মীকে মিথ্যে করে বোঝান হয়েছে যে তার কোন নেতা স্বীকারোক্তি করেছে এবং তার ফলে তার গ্রেপ্তার। পুলিশের কথায় বিশ্বাস করে রাগের বশে স্বীকারোক্তি করেছে ওই সরল বালকটিও। সব কিছুই হয়েছে ১৩ নম্বর বাড়ীতে।

দেখলাম crude method কিছুটা বদল করেছে গোয়েন্দা বিভাগে। পরে শুনেছি এ নতুন পদ্ধতির আবিষ্কারক ভূপেন চ্যাটার্জী ও লোম্যান। প্রবেশ করার পর বিভিন্ন পর্যায়ের অফিসারদের সঙ্গে দেখা। রায়সাহেব ব্রজবিহারী বর্মন, রায়সাহেব উপেন দত্ত প্রভৃতি সিনিয়র অফিসার এল একজন কুড়ি বছরের বন্দীর সাথে আলোচনা করার জন্য। সকল ব্যবস্থাই নাটকীয়-ভাবে সাজান। ইন্‌স্‌পেক্টররা আমাকে ঘিরে প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুরু করে। বাইরে থাকতে নরেন মহারাজ অনেক উপদেশ দিয়েছেন এ সম্পর্কে। তার প্রধান উপদেশ ছিল গোয়েন্দা পুলিশের সাথে আলাপ আলোচনা এড়িয়ে যাওয়া। বেশীর ভাগ প্রশ্নের উপর কেবল "জানি না" বলা। কোন সাথীর নাম করে চিনি কি না জিজ্ঞেস করলে সরাসরি "না" জবাবের সুবিধে হল সে প্রশ্নটি নিয়ে বেশী দূর এগোনোর রাস্তা বন্ধ করা।

আমি কাটা কাটা উত্তর দিচ্ছি শুনে ওরা হতাশ হন। এর মধ্যে হঠাৎ একজন বড় অফিসার আসায় আমার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী উঠে দাঁড়ান, কিন্তু আমার মতন ছেলেমানুষ গাঁট হয়ে বসে রইল দেখে ওরাও হতবাক। ব্যাপারটি লঘু করে দিল ব্রজবিহারী বর্মন। সে ভর্ৎসনার স্বরে বলল, "ওকে এখনও জলখাবার দাওনি—এ-কী তোমাদের অবিবেচনা।" সারাটি দিন গরম ঠাণ্ডা ও ঠাণ্ডা গরম তালে চলে প্রশ্নাবলী। আগের দিন ষ্টীমারে ভাল ঘুম হয়নি। অপরাহ্নে খুব ঘুম পেল। কিন্তু ঘুমুবে কার সাধ্য। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বলতে থাকে ওরা আমরা বসে রয়েছি আপনি কেন ঘুমুবেন—তার পর নানারকম বিকৃত প্রশ্ন। পুরো দশঘণ্টা যাবৎ চলল এ অভিযান। এর মধ্যে উচ্চতম কর্তৃপক্ষ স্পেশাল সুপার নলিনী মজুমদারের কাছে হাজির করা হল আমাকে। কতকটা নাটকীয়ভাবে। নীচের কর্মচারীদের ভাবটা যেন কোন দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করছে ওরা। আলো-আঁধারে ঢাকা ঘর বিরাট একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিল। বৃটিশ আমলাতন্ত্রের রেওয়াজ হচ্ছে বড়

টেবিল। আমলাতন্ত্রের অধিকর্তার আর অন্যান্য মানুষের মধ্যে যেন প্রয়োজনীয় দূরত্ব বজায় থাকে। নলিনী মজুমদারের টেবিলটি যেন আরও বড়। শুনেছি ষ্টালিনের সম্মুখের টেবিলটিও নাকি ছিল খুব বিরাট। বড় টেবিল দর্শকদের সাথে দূরত্ব বজায় রাখে।

একটা ফাইলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কথা বলছিল আমার সাথে; জানিনা ঐ ফাইলটি আমার কি না। কিন্তু কোন সময়ই চোখ দিয়ে দেখছিল না আমাকে। হয়ত ঐ ফাইলের লেখাই আমার পরিচয়। হঠাৎ এক সময় আমার পড়ার কথা উচ্চারণ করে জিজ্ঞেস করে "আপনি এতগুলি কলেজে কেন পড়েছেন? কোন সময়ইত আপনি পরীক্ষায় ফেল করেন নি। আপনি ত ভাল ছাত্র।" সত্যি কথা আমি তিনবছরের অল্প সময়ের মধ্যে ফরিদপুর, রাজসাহী ও রংপুর কলেজে পড়েছি। পড়েছি মানে পুলিশকে ঠকানোর জন্যই কলেজের ছাত্র রেজিষ্ট্রারে আমার নাম ছিল—অন্য কথায় ছাত্রাবস্থাই আমার পেশা। বললাম, স্বাস্থ্য ভালছিল না—কোথাও স্বাস্থ্য সুট করে নি। তার যা বোঝার বুঝে নিল সে। আমার যা বলার তা বললাম আমি। ১৩ নম্বরে আমার পালা শেষ হল খুব অল্প সময়েই। ঐদিন রাত আটটায় মেদিনীপুর জেলে যাওয়ার জন্য বহু পুলিশ পাহারায় রাঁচী এক্‌সপ্রেসে রওনা হই।

রাত দুটোর সময় প্রবেশ করি মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে। State-yard এ প্রবেশ করায় লক আপ খুলে যখন ওয়ার্ডে প্রবেশ করি—দেখি অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়ে আমার বন্ধু নিরঞ্জন সেনগুপ্ত।

মিলনপর্ব

মেদিনীপুর, আলিপুর ও বহরমপুর জেল ছিল রাজবন্দীদের জন্য নির্ধারিত। এর ভেতর মেদিনীপুর জেল ছিল অপেক্ষাকৃত বিপদজনক বন্দীদের জন্য। ১৯২৩ সালে এলেন ৩নং রেগুলেশনের বন্দীরা—তার এক বছর পরে এলেন বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল এমেণ্ডমেণ্ট এ্যাক্টের বন্দীরা। একসময় বাঙ্গলার নেতৃত্ব স্থানীয় সকলে এ জেলে ছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ, প্রতুল গাঙ্গুলী, নরেশ চৌধুরী, রবীন্দ্রমোহন সেন, মনোরঞ্জন গুপ্ত, ভূপতি মজুমদার।

এরা অনুশীলন যুগান্তর দলের প্রথম সারির নেতা। এরা একত্রে থাকার জন্য স্বতঃই ভবিষ্যৎ রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা হয়। এ দুটি দলের

পারস্পরিক বিরোধ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। পরস্পরের আলোচনার ভিতর দিয়ে খুব মৌলিক বিরোধের কারণ খুঁজে পাওয়া যায় নি। এ বিষয় ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী ও মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ডাঃ মুখার্জী এই প্রথম বন্দীনিবাসে এলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় গ্রেপ্তার হন নি। এ্যামনেষ্টির পর পলাতক বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তুলে নেওয়া হয়। এদের ভেতর ডাঃ মুখার্জী ও অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ডাঃ মুখার্জী মুক্তি পেয়ে এম· বি ফাইনাল পরীক্ষা দেন এবং গৌরবের সাথে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এ কৃতিত্ব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯১৪ সালের পর থেকে কলেজের সাথে সম্পর্ক নেই—কিন্তু পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। বাংলার প্রথম সারির বিপ্লবীদের ভেতর নরেন ভট্টাচার্য ওরফে মানবেন্দ্রনাথ রায় ও ডাঃ মুখার্জী intellectual বলে খ্যাতি ছিল। মহারাজ সম্পর্কে কিছু লেখা বাহুল্য। বিপ্লবী তপস্বী,শিশুর মত সরলতা, স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষ। মহারাজের কোন শত্রু নেই বললে অত্যুক্তি হয় না।

যাদুদা ও মহারাজ আপন দলে চাপ সৃষ্টি করেছিলেন খুব প্রচণ্ডভাবে। উভয়ই চাইতেন একটি ঐক্যবদ্ধ দল। সকলের বিশ্বাস যে এ দুটি দল এক হলে বাংলার রাজনীতি বলিষ্ঠ মোড় নেবে। একত্র হওয়ার বাধা কোথায় ? কোন আদর্শ বা কার্যক্রমগত পার্থক্য নেই। কারণ হল একে অন্যকে নিবিড়-ভাবে না জানার এবং কিছুটা ব্যক্তিগত। একে অন্য সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হয় ব্যক্তিগত কারণে। ব্যক্তিগত তথা গোষ্ঠীগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব এক ধরণের সংক্রামক ব্যাধি।

মহারাজ ও যাদুদার পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল মধুর। তারা ঐক্য প্রচেষ্টার কাজ চালিয়ে শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হন। এর প্রারম্ভিক রূপ দেওয়া হয় মেদিনীপুর জেলে। দুই দল থেকে দু জন করে প্রতিনিধি নিয়ে চূড়ান্ত বৈঠক হয়। যুগান্তরের তরফ থেকে ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী ও ময়মনসিংহের নরেশ চৌধুরী, আর অনুশীলনের তরফ থেকে মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী এবং প্রতুল গাঙ্গুলী। প্রাথমিক চুক্তির সময় যারা মেদিনীপুর জেলে উপস্থিত ছিলেন স্বতঃই তাদের সম্মতি ছিল এই ঐতিহাসিক ঘটনায়। তখন ঐ জেলে ছিলেন সুরেন ঘোষ, মনোরঞ্জন গুপ্ত, রবীন্দ্রমোহন সেন, সতীশ পাকরাশী, ভূপতি মজুমদার প্রভৃতি।

এ চুক্তির খবর সকল জেলেই পাঠান হয় স্থানান্তরিত বন্দীর মাধ্যমে।

সকল জেলেই স্বাগত জানান হয় এ চুক্তিকে। কিছু কিছু লোক খুব খুসী হতে পারেন নি। অনুশীলন দলের খবর আমি রাখি। তারা সকলেই unity চাইতেন। আলিপুর জেলে নরেন সেন তার সম্মতি জানিয়ে পাঠান মেদিনীপুর জেলে। এ আনন্দের খবরটি সুভাষচন্দ্র পান মান্দালয় জেলে। সুভাষচন্দ্র গোড়ার দিকে ছিলেন বহরমপুর জেলে। বহরমপুরে এ খবর পৌছাতে খুব দেরী হয়।

মিলনের পর বিভিন্ন জেলে ঐক্য প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পায় প্রবলভাবে। মেদিনীপুর জেলে প্রবেশ করে দেখি সর্বত্র মিলনের হাওয়া! মিলন প্রচেষ্টাকে Amalgamation আখ্যা দেওয়া হয়। সবার মুখেই amalgamation, দেখলাম এক নতুন আশার আলোক। আমি কোন দিনই বুঝতে পারিনি এ বিরোধের কারণ। সর্বদাই পীড়া বোধ করতাম এই সংকীর্ণ দলাদলিতে। মেদিনীপুরে এসে সতীশ দা (পাকরাশী) পুর্ণানন্দবাবু ও নিরঞ্জনের সাথে ঐক্যবদ্ধ দলের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা হয়। তখন গণেশ ঘোষও ছিলেন ওই জেলে। আমি যাওয়ার কিছুদিন পরে সূর্য সেন আসেন মেদিনীপুরে। সার্থক ঐক্য প্রচেষ্টার কথা শুনে খুবই আনন্দিত হন তিনি। চট্টগ্রামের দল নতুন দলে যোগ দেবে বলে আশ্বাস দেন। মেদিনীপুর জেল তখন জমজমাট। পড়াশোনা, খেলাধুলা, গল্পগুজবের ভেতর দিয়ে দিন কাটত ভালই। আমি অন্যান্যের চেয়ে বয়সে অপেক্ষাকৃত ছোট। গোঁফের রেখা পড়েছে মাত্র। জেল সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। বড়দের বিশেষ দৃষ্টি ছিল আমার প্রতি।

মুক্তির পর্ব

১৯২৭ সালের গোড়ার দিক থেকে বন্দী মুক্তি সুরু হয়। সুভাষচন্দ্রের মুক্তি তার প্রথম সূচনা। বাংলার জেলের বন্দীদের সংখ্যা কম। মেদিনীপুর জেল তুলে দেয়া হয়। দুজন করে করে বাংলার বাইরে পাঠান হয়। শেষ দুজন আমি ও চট্টগ্রামের নগেন সেন [জুলু সেন] এলেন আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে। সেণ্ট্রাল জেলও ভাঙ্গার মুখে। বেশীর ভাগই বাংলায় বিভিন্ন থানায় অন্তরায়িত। বাংলার বাইরে যাঁরা ছিলেন তারাও একে একে আলিপুর জেলে আসতে সুরু করেন। এখানে ৪।৫ দিন রেখে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হত বিভিন্ন থানায়। জেল থেকে থানা, থানা থেকে আপন

বাড়ীতে এ ছিল বন্দী মুক্তির সরকারী নীতি। বন্দীরা জেল থেকে বেড়িয়ে কী ধরণের আচরণ করে তা লক্ষ্য করা ছিল সরকারী নীতি।

আলিপুর জেলের বন্দীদের কেন্দ্র বিন্দু ছিলেন যাতুদা। তিনি দীর্ঘ দিন ধরে ঐ জেলে। তিনি ভাল ডাক্তার। তাকে আলিপুর জেলের সাধারণ কয়েদীদের চিকিৎসা ও হাসপাতাল পরিদর্শন করার অধিকার দেয় গভর্ণমেণ্ট। নতুবা সাধারণ নিয়মানুযায়ী সবাইকে সব রোগে এক ধরণের universal mixture দেয়া হত। পেটের ও জ্বরের রোগী একই ঔষধ পেত। পৃথিবীতে এ ধরণের বিচিত্র চিকিৎসা ব্যবস্থা আর কোথাও ছিল না। সুতরাং যাতুবাবুর চিকিৎসাধীনে কয়েদীদের খুব সুবিধা হত।

২৭ সালের মে মাসে যখন আলিপুর জেলে আসি, তখন যাতুদা ছাড়া ঐ জেলে যারা ছিলেন তাদের ভেতর চট্টগ্রামের নির্মল সেন অন্যতম। নির্মল সেন তখন যুবক। চট্টগ্রামের গোষ্ঠীতে সূর্যবাবুর পরের সারির নেতাদের অন্যতম। খুব শান্ত নীরব মানুষটি। নিজেকে লুকিয়ে রাখার এক সহজাত প্রবণতা। যাতুদা নির্মলবাবুকে নির্মলদা বলে ডাকতেন। যদিও নির্মলবাবু প্রায় ১০ বছরের ছোট। নির্মলবাবু ও সূর্যবাবুর ভেতর প্রকৃতিগত ঐক্য খুবই বেশী। তুজনই শান্ত সমাহিত, নিজকে জাহির করতে অক্ষম। শান্ত আবরণের ভেতরে চাপা আগুন বোঝা তুঃসাধ্য। জীবনযজ্ঞে অকৃপণ হাতে আত্মাহুতি দিয়েছেন এ তুটি মানুষ।

নির্মলবাবু কিছুদিন পরেই থানায় অন্তরায়িত হন। তখন ১৯২৭ সালের জুলাই কি আগষ্ট মাস। এরপর আর নির্মলবাবুর সাথে দেখা হয় নি। তাঁর নেতা সূর্যবাবু বৃটিশ পুলিশের সঙ্গে লড়াই করে প্রাণ দেন। জাতীয় ইতিহাসে নির্মলবাবুর ছবি চিরদিনের জন্য ভাস্বর।

আলিপুর জেলে ভাঙ্গা হাটে প্রাণ ছিল না মোটেই। ব্রহ্মদেশ থেকে এলেন ভূপেন দত্ত, ক্যানানোর থেকে এলেন রবি সেন। অল্প কয়েকদিন থেকে তারা চলে গেলেন অন্তরীণে—থানায়। আমাদের জীবনের ব্যতিক্রম হত রবিবারে। ঐ দিন গোয়েন্দা বিভাগের সর্বময় কর্তা লোম্যান আসত জেলের ভেতর। আড্ডা জমাত। যাতুদাই আলাপ আলোচনা চালাতেন। আমরা থাকতাম দূরে দূরে। লোম্যানের ভাবটা এই যে, অন্তরীণের স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে সে আমাদের ইচ্ছা মেনে নেবে। সকলের সামনেই একটি লিষ্ট ফেলে দিয়ে বাছাই করতে বলত। মোটামুটিভাবে বন্দীদের কথা মেনে

নিত। বাইরের ব্যবহারে এক ধরণের উদারতার ভাব ছিল তার।

জেলের ভেতর ওদের খবর যোগাড় করার ব্যবস্থা ছিল নিখুঁত। বন্দীদের ভেতরও ওদের গোয়েন্দা ছিল। ওরা তুটি বড় দলের মিলনের খবর পায় অনেক আগেই। এ মিলন এরা পছন্দ করে নি। যাতে না হয় তার পরিকল্পনা গোড়া থেকেই রচনা করে।

লোম্যান আসত মূলত যাতুবাবুর সাথে কথা বলার জন্যে। একদিন ইংলিশম্যান কাগজে দেখলাম যে লোম্যান একটি স্পেশাল প্লেনে রাঁচি গিয়েছে। আমি যাতুদার কাছে ছোট ভাইয়ের মতন হঠাৎ বললাম, আপনাকে সরকার রাঁচী পাঠাবে—তার জন্যই লোম্যানের এ তরিঘড়ি যাত্রা।

পরের রবিবার লোম্যান এসে হাজির। খোলাখুলিভাবে জানায় যে যাতুদা রাঁচীতে নজরবন্দী থাকবেন এবং তার থাকার জন্যে সরকার ২০০ টাকা ভাতা দেবে। যাতুদাকে ভাববার সময় দিল লোম্যান। তখন আলিপুর জেলে কেবল যাতুদা, ঢাকার পরমানন্দ দে ও আমি।

বিকেলের দিকে কনিষ্ঠের মতন যাতুদাকে বলি "আপনি রাঁচী যাওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করুন।" যাতুদা জিজেস করেন, "কেন"? জোর দিয়েই বলি "আপনি কলকাতায় না থাকলে ঐক্যবদ্ধ পার্টি গড়া অসম্ভব। দৈনন্দিন কর্মক্ষেত্রে আপনার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজনীয়। সব কাজে আপনার প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকা দরকার। সন্দেহ বড় সাংঘাতিক ব্যাধি। তার উপর নেতৃত্বের লড়াই। মহারাজ ও আপনাকে একত্র থাকতে হবে। গোড়ার দিকে দৈনন্দিন ব্যাপার নিয়ে অনেক ঝগড়া মেটাতে হবে আপনাদেরই। আপনাদের তুজনের নৈতিক মান এখনও খুব উঁচু। ওরা বরং আপনার বেনেটোলার বাড়ীতে নজরবন্দী রাখুক—আর এখানেই আপনি প্র্যাকটিশ করুন।"

যাতুদা গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ ভেবে বলেন "আমি দূরে থাকলেই ভাল হবে। দূরে থাকায় আমার পক্ষপাতহীন ব্যক্তিত্বে কোন দাগ লাগবে না। মনান্তর বা কলহ উপস্থিত হলে আমি সহজে মীমাংসা করে দিতে পারবো।" কিন্তু এই যুক্তি পরে ভুল প্রমাণিত হয়, ঐক্যবদ্ধ পার্টি না হওয়ায় তিনি ছিলেন অসহায়।

এর পর পরমানন্দ দেও চলে গেলেন অন্তরীণের স্থানে। যাতুদার জন্য রাঁচীতে ব্যবস্থা হচ্ছে। বাকী থাকছি কেবল আমি। হঠাৎ একদিন ডাক

পড়ল আমার, জেল অফিসে। গিয়ে দেখি স্বয়ং লোম্যান। জিজ্ঞেস করলাম "ভেতরে গেলে না কেন", বলল "আজ রবিবার না।" এ কথা ঠিক রবিবার ছাড়া ভেতরে যেত না লোম্যান। শুরু হল আমার সম্বন্ধে কথা। এবার লোম্যান একা নয়—সাথে জেল সুপার হাচীংস্। ওরা বলে যে আমি ভাল ছাত্র—পড়াশুনা করছি না কেন? তখন লোম্যান জিজ্ঞাসা করে আমি পড়াশোনা করবার জন্য বিলেতে যেতে রাজী কিনা। আমি বলি যে নীতিগতভাবে পড়াশোনার জন্যে বিলেত যেতে আমার আপত্তি নেই—কিন্তু সরকারী সাহায্যে আমি বিলেতে যাব না। বন্দী অবস্থায় দেশে থেকে প্রাইভেট ছাত্র হিসেবে পরীক্ষা দিতে আমার অমত নেই।

পরের রবিবার এল লোম্যান। এসে যাতুদার কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে আমি সরকারী সাহায্যে বিলেতে যেতে অস্বীকার করে ভবিষ্যৎ নষ্ট করছি। তারপর কয়েকদিনের মধ্যে চলে গেলেন যাতুদা। পড়ে রইলাম একা আমি। পরে আবার আসে লোম্যান—জেলের অফিসে। পুলিশের কাছে দল গড়া সম্পর্কে আমার খুব খ্যাতি। বরিশাল, ফরিদপুর, রাজসাহী ও রংপুর কলেজের ছাত্র আমি। পরীক্ষা এড়িয়ে এড়িয়ে বিভিন্ন কলেজে পড়েছি কেবল। বি, এ, পাশ করার সুবিধা গ্রহণ করিনি কখনো। পাশ করলে আর কলেজে থাকা যাবে না—অতএব পরীক্ষা দেই নি। পূর্ব ও উত্তর বাংলায় প্রায় সর্বত্র পরিচিত আমি—এই ওদের গোপন রিপোর্ট। কেবল বর্ধমান ডিভিসনে আমার যাতায়াতের কোন রিপোর্ট ছিল না ওদের। তাই ওরা ঠিক করে যে বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান (Wesleyan) মিশন কলেজের প্রখ্যাত প্রিনসিপাল ব্রাউনের হেপাজতে থাকব আমি। রাজী বা অরাজী হওয়ার প্রশ্ন ছিল না আমার। ১৯২৭ সালের পূজার দুদিন আগে পূর্ণদা এলেন মাদ্রাজের ট্রিচি জেল থেকে আলিপুরে—আর আমি ছেড়ে চললাম বাঁকুড়ায়। পূর্ণদার সংগে দেখা হল না।

সন্ধ্যার পর রাত ৮টা নাগাদ বাঁকুড়া পৌছাই। সাথে গোয়েন্দা পুলিশের ইনস্পেকটর সুরেন লোদ ও অল্প কয়েকজন সিপাই। পৌছে হাত মুখ ধোয়ার পর নিয়ে গেল পুলিশ সুপার বেলের কাছে। বেল বলে যে আমার সকল রকম দায়িত্ব ব্রাউনের। পুলিশের সাথে আমার কোন যোগাযোগ থাকবে না। একথা শুনে আমি খুব খুসী। পুলিশের প্রতি ছিল আমার ভীষণ ঘৃণা। মনে করতাম পুলিশই সরকার। আর ইংরেজ মাত্রই

পুলিশের মতন ঘৃণ্য। ইংরেজ জাতির মধ্যে বর্তমান যুগে কোন ভাল মানুষ নেই। পরের দিন সকালে গেলাম ব্রাউনের বাংলোতে। তখন সবেমাত্র প্রাতঃরাশ সম্পন্ন করেছেন ব্রাউন দম্পতি। আমাদের ওর কাছে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করেন। তখন আগ বাড়িয়ে সুরেন লোদ বলে "রাজবন্দী নিয়ে এসেছি।"

ব্রাউন: রাজবন্দী কে?

ইন্‌সপেকটর: উনি।

ব্রাউন: তবে তুমি কে?

ইন্: আমি গোয়েন্দা ইন্‌সপেকটর।

ব্রাউন: তুমি কেন এসেছ কলেজ কম্পাউণ্ডের ভেতর? তুমি চলে যাও।

ইন্: [সভয়ে] স্যার জানতাম না, মাপ চাচ্ছি।

সুরেন লোদ ছুটে বাইরে চলে গেল।

রেভারেণ্ড ব্রাউন বলেন "আমার সাথে চলো।" দীর্ঘকায় প্রখ্যাত পাদরীর সাথে চলতে শুরু করি। ঋজু গতি—দ্রুত চলার ভঙ্গি। আমি প্রায় ছুটে চললাম তার সাথে। যেতে যেতে বলেন যে "আমাকে দেখ্ ভাল করার দায়িত্ব তার। তিনি আমাকে রেভারেণ্ড বলের কাছে নিয়ে যান। বল রোনালড্‌সে হোষ্টেলের সুপারিনটেনডেণ্ট। হোষ্টেলের দোতলায় এক কোণে তাঁর থাকবার জায়গা। তার পাশের ঘরে ১নং রুমে স্থান হল আমার। এখন থেকে আমার দায়িত্ব রেভারেণ্ড বলের উপর। তার জন্যেই পাশের ঘরে আমার স্থান। বাঁকুড়া কলেজে একমাস পড়ি, মাস তিনেক পরে বি, এ, পরীক্ষা দিয়ে সসম্মানে পাশ করি। ২৮-এর মে মাসে পুলিশ পাহারায় দেশের বাড়ী ফিরে আসি, একমাস পরে মুক্তি।

রাজনীতির রাজধানী স্থানান্তরিত

১৯২৫ সালের ১৬ই জুন বাংলার রাজনীতিতে এক তাৎপর্যপূর্ণ অববাহিকা। ঐ দিন দার্জিলিঙ সহরে "Step aside" এ দেশবন্ধুর মৃত্যু। বাঙালী এমন প্রচণ্ড আঘাতের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। দেশবন্ধুর সহজাত রাজনীতিজ্ঞান সর্বজনস্বীকৃত, বাংলার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে সূর্যের মত ভাস্বর। বিরোধী গোষ্ঠী তাঁকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিতে পারে নি। দেশবন্ধুর সামনে তারা বামন মাত্র। বাংলায় স্বরাজ্য দলের জয়যাত্রা,

কাউন্সিলের ভেতরে লড়াইয়ের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ, কলকাতা কর্পোরেশন দখল —বাঙ্গালীর চিত্ত জয় করেছে বিপুলভাবে। ভবিষ্যতে সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক কী বিপুল আকার ধারণ করবে, বহু আগেই তা বুঝতে পেরেছিলেন দেশবন্ধু। কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র হিসেবে সারওয়ার্দীর মনোনয়ন দেশবন্ধুর মানুষ চেনার উজ্জ্বল প্রমাণ: সহিদ সারওয়ার্দী তরুণ ব্যারিষ্টার মাত্র। দেশবন্ধুর ডেপুটি হিসাবে সেদিন তার নির্বাচন নিঃসন্দেহে গভীর রাজনৈতিক দুরদর্শিতার পরিচায়ক। উত্তরকালে সহিদ সাহেবের রাজনীতির সাথে অনেকের মিল হয়নি। তার উগ্র সাম্প্রদায়িকতা সমর্থন করে না কেউ। কিন্তু সুদক্ষ প্রশাসক ও শক্তিশালী সংগঠক হিসাবে সহিদ সাহেবের তুলনা মেলা ভার। দেশবন্ধুর অকাল মৃত্যু না হলে মৌলানা আক্রাম খান, মুজিবর রহমান ও সহিদ সারওয়ার্দী জাতীয়তার মূল স্রোত থেকে সরে যেত কি না সন্দেহ। এঁরা যদি কংগ্রেসের নেতৃত্বে থেকে যেতেন তা হলে বাংলা ভাগ হওয়ার মতন অবস্থা কখনই সৃষ্টি হত না। বাংলার রাজনীতিতে ঢাকার নবাব পরিবারের অনুপ্রবেশও হত না।

দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণের সাথে সাথে অস্ত গেল বাংলার গৌরবসূর্য। বাংলাদেশ থেকে চিরকালের জন্য সরে গেল ভারতবর্ষের রাজনীতির কেন্দ্র বিন্দু। ১৮৮৫ সাল থেকেই কলিকাতা তথা বাংলাদেশ ছিল বেসরকারী রাজনৈতিক রাজধানী। দেশবন্ধুর প্রাণের অবসানের সাথে সাথেই সে রাজধানীর অপসারণ।

দেশবন্ধুর তিরোধানের পরদিন। সকাল বেলায় Forward কাগজে "Long Live Deshbandhu" এ সম্পাদকীয় পড়তে পড়তে আমার অজ্ঞাতে দু'চোখ বেয়ে এল প্লাবন। অনবদ্য লেখনটি যেন ভাষা দিচ্ছে আমার প্রাণের লুকানো ভাবনার। প্রবন্ধটির শেষে লেখকের সই দেখে বুঝতে পারি। লেখক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

নেতৃত্বের লড়াই

দেশবন্ধুর তিরোধানের পর সুরু হয় নেতৃত্ব নিয়ে লড়াই। কোন একজন ব্যক্তিত্বশালী সর্বজন গ্রাহ্য নেতা না থাকায় গোষ্ঠি লড়াই প্রচণ্ডভাবে সুরু হয় গান্ধীজীর উপস্থিতিতেই। দেশবন্ধু বাংলার বিধান পরিষদের নেতা, কর্পোরশনের মেয়র ও প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি। তিনটি পদকে

বলা হত ত্রিমুকুট Triple Crown, তিনটি পদই দেশবন্ধুর। তিনটি পদের একজন অধিকারী হলেই কাজের সুবিধা। নীতি নির্ধারণ ও তা কার্যকরী করার জন্যে একটি কেন্দ্রই বাঞ্ছনীয়। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর কথা ওঠে যে তিনটি মুকুট আর একজন পরবে না—ধারণ করবে তিনজনে। গান্ধীজী দেশবন্ধু মেমোরিয়াল ফাণ্ডের টাকা তুলছেন বাংলাদেশের জিলায় জিলায় ঘুরে। তখন প্রায় একমাস ছিলেন বাংলাদেশে। নেতৃত্বের জট খুলে দিয়ে বাংলা পরিত্যাগ করতে চান তিনি। তিনটি পদের তিনজন অধিকারী হলে কাজের সুবিধা, এ ছিল বিরোধী গোষ্ঠীর মত। সরকারী গোষ্ঠীর মত, জে. এম. সেনগুপ্ত হবেন তিনটি পদের অধিকারী। এ নিয়ে কানাঘুষা, গোপন আলোচনায় মুখর তখন বাংলার রঙ্গমঞ্চ। গান্ধীজী মিলিত হন গোষ্ঠী নেতাদের সাথে। খোলা-খুলিভাবে তিনি আপনার মত জানান সেনগুপ্তের পক্ষে। বিরোধীরা জানায়, যে সেনগুপ্ত দেশবন্ধুর মতন ব্যক্তিত্বশালী নেতা নন—হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ করছেন, সময় কোথায় ইত্যাদি। গান্ধী এসকল কথায় যৌক্তিকতা স্বীকার করতে রাজী নন। তিনি হেসে বলেন, বাঙালী বুদ্ধিমান ও কর্মক্ষম। এন. সি. কেলকার তিনটি পদের অধিকারী—কাউন্সিলে স্বরাজ পার্টির নেতা, মহারাষ্ট্র কংগ্রেসের সভাপতি ও পুণা মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান। কেলকারের পক্ষে যা সম্ভব তা সেনগুপ্তের পক্ষে নিশ্চয়ই সম্ভব। এর পর সেনগুপ্তের ব্যক্তিগত অনেক ব্যাপার তোলেন উত্তর কলকাতার একজন কর্পোরেশন কাউন্সিলার। গান্ধীজী জোরের সাথেই বলেন যে বাংলায় সেনগুপ্তর সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি সর্বগুণসম্পন্ন নন। সাধারণ ত্রুটি বিচ্যুতির উর্ধে নন তিনি। যে সকল অভিযোগ সেনগুপ্তের বিরুদ্ধে করা হয়েছে—তা মেনে নিতে তিনি রাজী নন। তা মেনে নিলে স্বরাজ্যদলের তখনকার সর্বভারতীয় নেতা মতিলাল নেহরু ও বিঠলভাই প্যাটেলের মত নেতাকে বাদ দিতে হয়। তার জন্যে নিশ্চয়ই রাজী নন কেউ। অসাধারণ নৈতিক বলের অধিকারী গান্ধী। কর্মীরা ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় মেনে নিতে বাধ্য হন তাঁর সুপারিশ। এর পর গান্ধী কথা বলেন সেনগুপ্তের সাথে। তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ও গোপনে যে সকল অভিযোগ শুনেছেন সকলই সেনগুপ্তের গোচরে আনেন এবং বলেন তাঁর কাজের উপর নির্ভর করছে গান্ধীর প্রেষ্টিজ।

বাহ্যত আপোষ হলেও অন্তরের মিল হয়নি। বিক্ষুব্ধ নেতৃবৃন্দ যে নতুন গোষ্ঠী রচনা করেন, তা 'Big five' নামে পরিচিত। শরৎবাবু, তুলসী গোঁসাই,

নির্মল চন্দ্র, বিধান রায়, নলিনী সরকার এরা সবাই বিত্তশালী মানুষ। উপরতলার মানুষ। মাঠে ময়দানে মানুষের সাথে এদের যোগ খুবই সামান্য। এরা সকলে কলকাতার মানুষ। আইনসভা ও কর্পোরেশনের কাজে এদের উৎসাহ বেশী। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ভেতর দিয়ে এরা নেতৃত্বে আসেন নি। সেনগুপ্ত, সুভাষ বোস, বীরেন শাসমলের সাথে এখানে বিরাট ব্যবধান।

প্রাদেশিক ক্ষেত্রে উপরের দিকে যেমন পরিবর্তন হচ্ছিল, তেমনি জিলায় জিলায়ও সুরু হয় এক তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন। এসময় জিলা স্তরে বিপ্লবীদের হাতে এল কংগ্রেস অফিস। এর জন্য খুব চেষ্টা করতে হয় নি। নতুন কর্মী জোগাড় করা বিপ্লবীদের প্রধান কাজ। অতএব তাদের কর্মী সংখ্যা কখনোই কমেনি, বরং বেড়েছে অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত হওয়ার ফলে। এসকল কর্মীরা বেশীরভাগই ছাত্র যুবক। ১৯২১-২২ সালের ছাত্র ২৫-২৬ সালে যুবক। বাংলায় বর্ধমান বিভাগের ২।১ টি জিলা ছাড়া সকল জিলা কংগ্রেসই এল বিপ্লবীদের হাতে।

এর ফলে কংগ্রেসের ধারায় আসে বিরাট পরিবর্তন। বিপ্লবীরা নিষ্ঠাবান ও কষ্ট সহিষ্ণু কর্মী, চরিত্রবান। ত্যাগের জন্য ব্রতী। স্বভাবত এদের প্রতিষ্ঠা গড়ে সাধারণের মাঝে—অতএব কংগ্রেসের মধ্যেও। কংগ্রেস আন্দোলনে সততা ও সংগ্রামী মনোভাব নিয়ে আসেন বিপ্লববাদীরা। এরা কোনদিনই একান্তভাবে কংগ্রেস পন্থা গ্রহণ করেন নি। কংগ্রেসের ভেতর দিয়েই সহিংস বিপ্লব রচনা করাই ছিল তাদের কার্যক্রম।

এর ফলে কংগ্রেসের সরকারী প্রোগ্রাম অনুযায়ী খুব কম কাজ হয়েছে বাংলা দেশে। মেদিনীপুর, হুগলী, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি জিলায় কিছু গঠনমূলক কাজ হয়েছে। কিন্তু বাকি জিলাগুলিতে মোটেই হয় নি।

কোন জিলায় সরকারী নেতৃত্ব কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের হাতে থাকলেও বাস্তবে কন্ট্রোল ছিল বিপ্লবীদের হাতে। প্রতি জিলায় গান্ধী বা দেশবন্ধুর মতাবলম্বী নেতৃবৃন্দ এবং বিপ্লবীদের ভেতর অজ্ঞাতে গড়ে ওঠে একটি সূক্ষ্ম প্রাচীর। জিলা পর্যায়ে নির্ভেজাল কংগ্রেস কর্মীরা, বিশেষ করে যারা অহিংসায় বিশ্বাসী তারা কতকটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন।

বাংলায় যে সকল প্রতিষ্ঠাবান নেতা টিকে রইলেন তাদের অনেককেই থাকতে হয়েছে বিপ্লবীদের সহ্য করে, তাদের সাথে আপোষ করে। সেনগুপ্ত বাংলায় প্রথম সারির নেতা—কিন্তু তাকে জিলা স্তরে নির্ভর করতে হত

বিপ্লবীদের উপর। বিপ্লবীরা শ্রদ্ধার সাথে তাদের মর্যাদা দিতেন, কিন্তু আদর্শগত লড়ায়ের সময় বিরোধ খুব তীব্র হত।

কংগ্রেসের ভেতর এ তুটি ধারা পাশাপাশি যেতে যেতে যেমন লড়াইও করেছে, আপোষ করেছেও তেমনি। কিন্তু বিরোধ চরমে ওঠে কৃষ্ণনগরে। আমি তখন পলাতক। পলাতক অবস্থায়ই কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হই চারু চৌধুরী প্রভৃতি রাজসাহীর বন্ধুদের নিয়ে। তখন সম্মেলনে প্রতিনিধি হওয়ার নিয়ম ছিল খুব ঢিলেঢালা। আমরা সকলেই ডেলিগেট। সম্মেলনের সভাপতি বীরেন শাসমল। অধিবেশনের আগে ডেলিগেটদের কার্ড নেওয়ার সাথেই সভাপতির ভাষণ বিতরণ করা ছিল নিয়ম। যে কোনভাবেই হোক সম্মেলনের বহু পূর্বে সভাপতির ভাষণ এসে যায় প্রতিনিধিদের হাতে। প্রচণ্ড সোরগোল শুরু হয়। হঠাৎ খবর পাই—ডেলিগেটদের বিশেষ সভার কথা। হলঘরে প্রবেশ করে দেখি খুব জমজমাট। মাখন সেন বক্তৃতা করছেন। সভায় অধিকাংশই বিপ্লবীদলের সমর্থক। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে দেখলাম বরিশালের সতীন সেন এবং সন্তমুক্ত রাজবন্দী অমর চট্টোপাধ্যায় ও উপেন বন্দোপাধ্যায়। উপেনবাবুকে ২২ সালেই দেখেছি, কিন্তু অমরবাবুকে দেখলাম প্রথম! দীর্ঘকায় সুপুরুষ—ব্যক্তিত্বশালী মানুষ।

মাখনবাবুর বক্তৃতা ছিল খুব উত্তেজনাপূর্ণ। বিপ্লবীদের সম্পর্কে অবাঞ্ছিত উক্তি কিছুতেই সহ্য করা যায় না—এই ছিল তাঁর মূল বক্তব্য। বরিশালে প্রাদেশিক কমিটির সম্মেলনে মাখনবাবুর দেখেছি এক রূপ—এখানে ঠিক তার উল্টো। মাখনবাবু গান্ধীপন্থী কংগ্রেস কর্মীদের সংগঠনের সম্পাদক—স্বরাজ্য পার্টির চরম বিরোধী। সেই গান্ধীপন্থী মানুষটি দেখলাম বিপ্লবীদের সমর্থক, একটু আশ্চর্য হলাম। মাখনবাবু অবশ্য "অনুশীলন সমিতি"র প্রাক্তন সদস্য। সোনারং ন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষক। বিপ্লবী কর্মধারায় আস্থা হারানোর জন্যে অনুশীলন সমিতি ত্যাগ করেন। আজ তিনি আবার বিপ্লবীদের পক্ষে লড়াইয়ের অন্যতম সেনাপতি!

সম্মেলন সুরু হয়। বন্দেমাতরম গানের পর সত্য রচিত "তুর্গম গিরি কান্তার মরু" গানটি আবেগের সাথে গেয়ে সবাইকে মাতিয়ে তোলেন নজরুল। বারংবার তিনি উত্তর দিকে হাত তুলে দেখাচ্ছিলেন "সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর"। সে এক অনির্বচনীয় দৃশ্য।

এরপর সভাপতির ভাষণ পড়ার জন্য উঠলেন মেদিনীপুর কেশরী বীরেন

শাসমল। পর্বতসদৃশ দেহ—উঁচু কণ্ঠস্বর, ব্যক্তিত্বশালী মানুষ বীরেন্দ্রনাথ। ভাষণ পড়তে পড়তে যখন বিপ্লবীদের সম্পর্কের স্থানে এলেন তখন চারদিক থেকে ধিক্কার ধ্বনি উঠে। বীরেন্দ্রনাথের কাছে প্রস্তাব গিয়েছিল সংশ্লিষ্ট স্থান বাদ দিয়ে পড়ার জন্য। অকুতোভয় বীরেন্দ্রনাথ মাথা হেঁট করতে চান নি। তিনি সবটুকু ভাষণই পড়ার সিদ্ধান্ত নেন। সভাপতিকে তার ভাষণ পড়তে দেয়া হল না। অপমানাহত সভাপতি চোখের জল ফেলতে ফেলতে আসন গ্রহণ করেন। প্রচণ্ড হৈচৈ-এর ভেতর সম্মেলন স্থগিত হয়।

এরপর দীর্ঘকাল তিনি বাংলার প্রাদেশিক রাজনীতি ক্ষেত্রে আসেন নি। আবার এসেছিলেন ১৯৩৪ সালে। তিনি কেন্দ্রীয় আইন সভায় নির্বাচিত হন কংগ্রেস ন্যাশানালিষ্ট পার্টির তরফ থেকে। তাঁর নির্বাচনের জয়ের খবর ও মৃত্যু একই সাথে আসে।

তাঁর মত বর্ণাঢ্য নেতা খুব কম। মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে যে দক্ষতা দেখিয়েছিলেন তিনি তা ইংরেজ সরকারের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। ইংরেজ সরকার তাকে খুব ভয় ও সম্ভ্রম করত। এ মানুষটির সাথে কংগ্রেসের বিরাট অংশ ভাল ব্যবহার করেনি। বীরেন্দ্রনাথ তখনকার দিনে অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষ ছিলেন। তিনি ব্যারিষ্টার, বাগ্মী। কিন্তু তার অগ্রগতির পথে নানা রকম বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। কলকাতাবাসী নেতারা এর জন্য দায়ী। Big five ছিল তার চরম বিরোধী। তাকে মেদিনীপুরের আসন থেকে হারিয়ে দিয়েছিল Big five ও কর্মী সংঘ। কর্মী সংঘ ছিল প্রাক্তন যুগান্তরের একটি গোষ্ঠী। এদের সমর্থন করে চলত Big five। Big five এর সকলেই রক্ষণশীল শ্রেণীর মানুষ। বুর্জোয়া। কিন্তু বিপ্লব ও প্রগতিতে বিশ্বাসী কর্মী সংঘ মিলিত হল Big five এর সাথে। এর কোন আদর্শগত যৌক্তিকতা ছিল না।

বিপ্লবীদের ব্যর্থতা

বৈপ্লবিক চিন্তানায়ক ছাড়া বিপ্লব সৃষ্টি হয় না। রুশো ছাড়া রুশবিপ্লব ভাবা যায় না, ম্যাজিনি ছাড়া ইতালীর ঐক্যের সংগ্রামের কথা ভাবা যায় না—তেমনি মাওকে বাদ দিয়ে চৈনিক বিপ্লবের কথা চিন্তা করা যায় না। সেদিন বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলনের এ অনুভব করছি ভীষণভাবে। বাংলার আন্দোলনে বিপ্লবী তথা বামপন্থীদের প্রভাব চলছে দীর্ঘ দিন—স্বাধীনতা লাভ

করা পর্যন্ত। স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত বিপ্লবীদের হাতে প্রাদেশিক ও জিলা কংগ্রেস অফিস ছিল ; কিন্তু জননেতৃত্ব ছিল না। জন নেতৃত্ব থাকলে বাংলা ভাগ হত না। অফিস আঁকরে থেকে সাময়িক কিছু লাভ হতে পারে, কিন্তু দেশের তথা সমাজের রূপকার হওয়া যায় না। বিপ্লবীরা দখল করেছে অফিস—কিন্তু বাংলার জনতা তাদের বরণ করে নেয় নি। বাঙালী বিপ্লবীদের ভালোবেসেছে—শ্রদ্ধা করেছে—ত্যাগের প্রশংসা করেছে—কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্বে বরণ করেনি তাদের। বঙ্গ বিভাগ তার নিদর্শন। যেদিন বিভাগ হয়েছে সেদিন মাথা হেঁট করে তা বরণ করে নিয়েছে বিপ্লবীরা। প্রতিরোধে সোচ্চার হয় নি তারা। এমন কি দেশ বিভাগের পর পূর্ব-বাংলার অধিকাংশ বিপ্লবী নেতারা চলে এসেছিলেন পঃ বাংলায়। এদের ভেতর ব্যতিক্রম মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী ও সতীন সেন, আরও অনেকে। এরা ওখানকার বিপন্ন মানুষের সাথে ছিলেন—কারাবরণ করেছেন—মৃত্যু বরণ করেছেন। এ দুজন ছাড়া মাদারী পুরের ফণী মজুমদার, বরিশালের দেবেন ঘোষ, ময়মনসিংহের মনোরঞ্জন ধর, কুমিল্লার অতীন রায়, চট্টগ্রামের বিনোদ চৌধুরী প্রভৃতি দেশত্যাগ করেনি। পূর্ব বাংলা পলাতক সাধারণ কর্মীদের মধ্যে আমিও একজন। শেষের ২৫ বছর আমি যদিও বরিশালে কাজ করিনি তা হলেও বরিশালে আমার জন্ম। সেখানের সাধারণ মানুষের দুর্দিনে আমি তাদের সাথে থাকি নি, তার জন্য আমার লজ্জা অন্তহীন।

বিপ্লবীদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে। আশ্চর্যের বিষয় যে ঐ অঞ্চলগুলি ভারত থেকে আলাদা হয়ে রচিত হল পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব ও উত্তর বাংলা মুসলমান প্রধান। সেখানকার দুর্গত জনমানব মানেই মুসলমান জনতা। তারপরই আসে অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়। এর কোন শ্রেণীর ভেতরই বিপ্লবীরা নিবিড়ভাবে কাজ করেনি। যদি তারা সে প্রোগ্রাম গ্রহণ করত তা হলে মুসলমান জনতা ঢাকায় নবাব পরিবারের পতাকাতলে জড় হত না। বাংলার বিপ্লবীদের ভেতর যে সংখ্যক ত্যাগী, নিষ্ঠাবান ও ব্রতী কর্মী ছিল, তারা মোসলেম জনতার অন্তর জয় করতে যে সক্ষম হত সে সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এ অঞ্চলের হিন্দু ও মুসলমানদের সংস্কৃতির ভেতর ঐক্যসূত্র ছিল দীর্ঘদিন থেকে। এরা পাঠানদের মত নয়। এরা কিছুতেই মোসলেম লীগের সাথে যেত না। আমি ১৯২১ সালের মুসলিম জনতার আচরণ লক্ষ্য করেছি। বাদশা মিয়ার এক

একটি সভায় উপস্থিত বিপুল জনতার সমাবেশ ভোলার নয়। বহু মানুষ তখন জেলে গিয়েছে কংগ্রেস ও খিলাফতের ডাকে। কংগ্রেসের সাথে যখন তাদের যোগসূত্র ছিঁড়ে যায়—তার পরও তারা সরাসরি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান লীগে যোগ দেয় নি। তারা খুব প্রগতিশীল ভূমিকা নেয় তখন। প্রজা ও কৃষকদের নামে সংগঠনের আশ্রয়ে তারা বাঁচতে চায়, কিন্তু আমরা তাদের টেনে নিতে পারিনি। এখানেই আমাদের ব্যর্থতা। গান্ধীর কার্যক্রমের ভেতর হিন্দু-মোসলেম ঐক্য ছিল সবার উপর। কিন্তু গান্ধীর এ দিকটি অবহেলা করেছি আমরা। ১৯৩৭ সালেও মুসলমানরা লীগকে বরণ করতে অস্বীকার করেছে—কিন্তু জাতীয় নেতৃত্বের সাথে লড়াই করে কংগ্রেস ও কৃষক প্রজা পার্টির মিলন ঘটাতে পারে নি বিপ্লবীরা। এখানে তাদের দ্বিতীয় ব্যর্থতা। এ সময়ও যদি ফজলুল হকের নেতৃত্বে কংগ্রেস ও কৃষক প্রজার ঐক্য স্থাপিত হত তাহলেও হয়ত বঙ্গ বিভাগ হত না। কৃষক প্রজা পার্টিতে আবু হোসেন সরকার, সামসুদ্দিন আহমেদ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ সকলেই পুরানো কংগ্রেস কর্মী।

এ ব্যর্থতার প্রধান কারণ আমাদের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ও বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনার অভাব। এর জন্য প্রচণ্ডভাবে মাশুল দিতে হয়েছে আমাদের। আমরা ইতিহাস রচনা করতে পারতাম—কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি সম্পূর্ণভাবে। মহাকাল তাই আমাদের ক্ষমা করেনি।

১৯২৭-এর জুলাইতে বড় আশা নিয়ে বাইরে আসি। দুটি বড় দলের মিলন নিশ্চয়ই বাংলার রাজনীতির মোড ঘুরিয়ে দেবে। আলিপুর জেলে যাদুদার সাথে অনেক কথা হয়। আমি দলের গুপ্ত বিভাগে কাজ করি এই তাঁর ইচ্ছা। তিনি কীভাবে সার্থক বিদ্রোহ করতে হয়—তার কৌশল শিক্ষা দিতেন। ভারতবর্ষের বাইরের সাথে সম্পর্ক থাকা সকলের আগে প্রয়োজন। কিন্তু উপায় কী? সমুদ্রপথে যোগাযোগ অনিশ্চিত ও ক্ষণিকের তরে। স্থলপথে রাস্তা বের করার দায়িত্ব নিতে হবে আমাদের। তার জন্য সুরু হল পড়াশুনা। উত্তর পশ্চিম ও উত্তর পূর্ব সীমান্তের topography পড়তে সুরু করি। কেবল রাস্তা নয়—ওখানকার অধিবাসীদের সম্পর্কে জ্ঞান থাকা চাই—তাদের আচার ব্যবহার রীতিনীতি প্রভৃতি। সবচেয়ে অসুবিধা ভাষা।

* * * *

আগষ্ট মাসে কলকাতায় এসে এম, এ ক্লাশে ভর্তি হই। এই সময় ডাঃ

রাধাকৃষ্ণানের একটি আচরণ চিরদিনই স্মরণ করি। তখন Post Graduate ক্লাশের ছাত্রদের জন্য Stipendএর ব্যবস্থা ছিল। খুব সামান্য টাকা। দরখাস্ত করি আমি। Interview-র দিন উপস্থিত হই মনোনয়ন কমিটির সম্মুখে। ডাঃ রাধাকৃষ্ণন সভাপতি। সভ্য গৌরাঙ্গ ব্যানার্জী, সতীশ ঘোষ প্রভৃতি। সকল দরখাস্তকারীদের ডাকা হল—কেবল আমি বাদ। রুদ্ধদ্বারে সভা। সাক্ষাৎকার শেষ হলে—দরজা খুলে প্রবেশ করি আমি। শুধালাম, আমার দরখাস্ত ছিল কিন্তু আমাকে কেন ডাকা হয়নি? ওরা জানাল যে তালিকায় আমার মনে নেই। দরখাস্তের রসিদ দেখতে চাইলেন ওঁরা। আমি কোন রসিদ নেই নি—অকপটে তা স্বীকার করি। আমি খাদি পরতাম। একুশ বছর বয়স আমার। পুরোপুরি খাদি পরিহিত এ বয়সে সচরাচর দেখা যেত না। আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ডাঃ রাধাকৃষ্ণন আমাকে খাদি পড়ার কারণ জানতে চান। আমি বলি খাদি আমার ভাল লাগে। তারপর পাল্টা প্রশ্ন করেন, "তুমি কি রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলে?" আমি আটক বন্দী ছিলাম—একমাস আগে মুক্তি পেয়েছি একথা জানাই। ডাঃ রাধাকৃষ্ণন বলেন, "একে ত দিতেই হবে," আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, "তুমি পাবে।"

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু' বছর পড়ি। আই-এ, ও বি. এ কলেজে পড়েছি—কলেজ রেজিষ্টারে নাম রাখার জন্য—ছাত্রদের সাথে মেলামেশা করার জন্য। পড়াশুনা করিনি কখনো। তখন পড়াশুনার উপর জোর দেইনি। কিন্তু স্নাতক হওয়ার পর পড়াশুনা করেছি ছাত্রের মতনই। আধুনিক ইতিহাসের ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন পাঠন ব্যবস্থায় খুব তৃপ্ত ছিলাম বলা বাহুল্য। কয়েকজন অধ্যাপকের কথা সর্বদা মনে পড়ে। তাঁরা হলেন ডাঃ হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, Ramsbotham ও ত্রিপুরারী চক্রবর্তী। অধ্যাপক চক্রবর্তীর সাথে সম্পর্ক ছিল অন্য ধরণের। তিনি আমার সত্যিকার আচার্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতাম।

কলকাতা কংগ্রেস

বন্দী মুক্তির পর সুরু রাজনীতির নতুন অধ্যায়। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে গোলমালের অবসান হল সুভাষচন্দ্রের প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনে। বিগ ফাইভ খুসী—সেনগুপ্তও অসন্তুষ্ট নয়। তিনিও সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন সভাপতিত্ব ছেড়ে।

আবহাওয়া বদলে যায় ব্যাপক বন্দীমুক্তির সাথে। যুগান্তর ও অনুশীলন ঐক্যবদ্ধ। এ ঐক্যবদ্ধ শক্তি অন্তরের সাথে সমর্থন জানায় সুভাষচন্দ্রকে। তখন নতুন জোয়ার এল বাংলায় রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চে। সুপ্রতিষ্ঠিত হল বামপন্থী শক্তি। এ জোটের সম্মুখে সুভাষচন্দ্র ও পেছনে সংযুক্ত বিপ্লবী দল। বাংলাদেশেও Independence for India League প্রতিষ্ঠা হল। এই সংগঠনের মাধ্যমে খুলে গেল এক নতুন দিগন্ত—এক নতুন দিশা।

কিন্তু বিপিনদা ও সন্তোষ মিত্রদের সাথে গোলমাল থেকেই গেল।

হেমচন্দ্র ঘোষ এ পর্যায়ে জেলে ছিলেন না। তার কাছে যখন এ প্রস্তাব গেল তখন তিনি দুহাত দিয়ে তা গ্রহণ করেন। সূর্য সেন ও ললিত বর্মনের সমর্থন আগেই সংগ্রহ করা হয়। মোটামুটিভাবে সন্তোষ মিত্র গোষ্ঠী ছাড়া আর সকলেই ঐক্য প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানায়। আমরা কলকাতায় কাজ করি। কলকাতা থেকে সুরু হয় সাংগঠনিক ঐক্য। পার্টির কাজ করার খোলা প্লাটফরম হল স্বাধীনতা সংঘ। তা ছাড়া গোপন কাজ ত আছে। এ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত নেতা ছিলেন রবি সেন এবং ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত। দুই দল থেকে দুজন। তখনও একজনের উপর ভার দেয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয় নি। সহায়ক হিসেবেও দুদল থেকে দুজন। যুগান্তরের তরফ থেকে বন্ধুবর রসিক দাস এবং অনুশীলনের তরফ থেকে আমি। আমাদের সাথে আরো কয়েকজন ছিলেন। তার মধ্যে ক্ষিতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জ্যোতীশ ভৌমিকের নাম উল্লেখযোগ্য। ক্ষিতীশবাবুর মির্জাপুর ষ্ট্রীটের কাঠের গোলায় মিলিত হতাম আমরা। কখনো কখনো ভূপেনবাবু আসতেন। আমরা খুব উদ্যমের সাথেই কাজ সুরু করি। যাদুদা একবার কলকাতায় আসেন তখন। দেখা করে তাঁর কাছে সব রিপোর্ট করি। তিনি খুসি হন।

Independence for India League এর পুরোভাগে ছিলেন হরিকুমার চক্রবর্তী। আপন ভোলা মিষ্টভাষী, অমায়িক মানুষটি। এই মানুষটি শেষ জীবনে পঃ বাংলা বিধান পরিষদের সভ্য ছিলেন।

২৮ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেসের অধিবেশন। একাজে সকলেই ব্যস্ত। খুবই জাঁকজমকের সাথে অধিবেশন হবে। এক আপোষ সূত্রানুযায়ী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়। সেনগুপ্ত সভাপতি, বিধান রায় সম্পাদক। নলিনী সরকার প্রদর্শনী সম্পাদক, আর সুভাষচন্দ্র স্বেচ্ছাসেবক এর অধিকর্তা—G. O. C.। বিপুল সমারোহ করে ৩৪ তম অধিবেশন আরম্ভ হয়। এ

সম্মেলনের সাথে সর্বদলীয় সম্মেলনের বৈঠক হয় নেহেরু কমিটির রিপোর্ট আলোচনা করার জন্যে। এ কমিটির গুরুত্ব তখন খুবই বেশী। সাইমন কমিশন বয়কট করার জন্য বৃটিশ সরকার এক চ্যালেঞ্জ জানায়। তারই প্রত্যুত্তরে সর্বদলীয় সম্মেলনের রচনা। ভারতবর্ষের সকল দলের শীর্ষস্থানীয় নেতারা ছিলেন এই কমিটিতে। সুভাষচন্দ্রও এর অন্যতম সভ্য—সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু। নেহেরু কমিটির রিপোর্টে বলা হয় যে ভারতের আশু লক্ষ্য ডমিনিয়ন ষ্টেটাস। সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতা সংঘের অন্যতম সম্পাদক। তিনি উচ্চতম নেতৃত্বের অনুরোধে কোন Note of dissent দেন নি। কলকাতায়ই নেহরু কমিটির রিপোর্ট আলোচিত হয়ে সহজে গৃহীত হয়।

গান্ধীজীর পরামর্শ অনুযায়ী মতিলাল নেহেরু সে বছরের কংগ্রেস সভাপতি। এই দুটি সম্মেলনের নেতৃত্বে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু। কংগ্রেসের অধিবেশনে মতিলালজীর ভাষণ ও রাজনৈতিক প্রস্তাবের গুরুত্ব সম্পর্কে সবাই সজাগ। তখন বলডুইন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী। টোরী পার্টির সরকারের কাছে কংগ্রেসের এক ঐক্যবদ্ধ প্রস্তাব চাই—এ ছিল কংগ্রেসের উচ্চতম কর্তৃপক্ষের নীতি। ডমিনিয়ন ষ্টেটাস ভারতবর্ষের লক্ষ্য, এ প্রস্তাব কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে পাশ হওয়া দরকার। অথচ কংগ্রেসের তরুণ তথা বামপন্থী নেতৃত্ব পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে। এর আগের অধিবেশনে মাদ্রাজে পূর্ণ স্বাধীনতা ভারতবর্ষের লক্ষ্য হওয়া উচিত, এ ধরণের একটি বেসরকারী প্রস্তাব পাশ হয়। জওহরলাল নেহেরু তার প্রস্তাবক। জওহরলাল League Against Imperialism এর বিশ্ব সম্মেলনে যোগ দিয়ে কেবলমাত্র এসেছেন ভারতবর্ষে। অতএব মেজাজ খুব চড়া। নিয়ে এলেন স্বাধীনতার প্রস্তাব। সে প্রস্তাব পাশ হল বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে। সম্মেলনে অনুপস্থিত গান্ধীজী এ ধরণের প্রস্তাব পছন্দ করেন নি। মনে হয় গান্ধীজীর কর্মকৌশলের প্রতিকূল এ প্রস্তাব। সরকারীভাবে কখনো বলা হয়নি যে ভারতবর্ষের চরম লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা। Creed ছিল "attainment of Swaraj by all peaceful and legitimate means"। এ স্বরাজ কথাটির সীমানা নির্দেশ করা হয়নি এতদিন। তবে এ কথা পরিস্কার যে স্বরাজ মানে পূর্ণ স্বাধীনতা নয়! দেশবন্ধুর মতে স্বরাজের অর্থ হল Dominion status।

মাদ্রাজের অধিবেশনে Creed বদল হল না—অথচ একটি বেসরকারী প্রস্তাব পাশ করে ঘোষণা করা হয় যে লক্ষ্য স্বাধীনতা। অতএব Creed কি

তা সরকারীভাবে বলা শ্রেয়। কলকাতা কংগ্রেসে সে সম্পর্কে প্রস্তাব এল সরকারীভাবে। মহাত্মাগান্ধী স্বয়ং প্রস্তাবক। অতএব খুব গুরুত্বপূর্ণ এ প্রস্তাব। মহাত্মাজী স্বয়ং প্রস্তাব উত্থাপন করেন না সচরাচর। সংগ্রাম করার আগে তিনি সাধারণত প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কোন উদ্দেশ্যহীন প্রস্তাব তিনি করেন না। কোন দায়িত্বহীন উক্তিও করেন না তিনি। যেটুকু করতে পারবেন ঠিক ততটুকুই বলেন ; বরং কিছুটা কম করেই বলেন। এই-ই তাঁর ধর্ম। লিখিত বক্তব্যের প্রত্যেকটি শব্দ ওজন করেন। অভিনব রচনাশৈলী গাম্ভীর। তার ব্যবহৃত শব্দ একটিও বদল করা অসম্ভব। ভাষা মধুর-রসাল। কারো উপর বিদ্বেষ নেই—কাউকে আঘাত করে না—কখনও ভৎর্সনা করে না এমন নয়। তা হয় খুব উঁচুস্তরের। যেন গৌরীশৃঙ্গে দাঁড়িয়ে দৃঢ় কণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারণ করছেন কোন সিদ্ধ তাপস।

কলকাতা কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী কমিটি Working Committee-র প্রস্তাব সমর্থন করে। প্রস্তাবের সারমর্ম এই, জাতীয় কংগ্রেসের চরম লক্ষ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে পূর্ণ স্বাধীনতা। কিন্তু যদি এক বছরের মধ্যে বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষকে Dominion status দেয় তা হলে তা গ্রহণ করতে কংগ্রেস রাজী আছে। এক বছর পরে কংগ্রেস ঘোষণা করবে যে তার লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা। খানিকটা কর্মকৌশলের বিষয় ছিল এ প্রস্তাবে! প্রস্তাবটি সরাসরি নিছক ঘোষণা মাত্র নয়। একটি সম্ভাব্য লড়াইয়ের প্রস্তুতি। যদি এক বছরের ভেতর Dominion Status স্বীকার না করে বৃটিশ সরকার—তা হলে সুরু হবে পূর্ণ স্বাধীনতার যুদ্ধ। আর যদি Dominion Status দিতে স্বীকার করে তবে ভারত বৃটিশের অধীনে dominion হয়ে থাকতে রাজী। বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর বাংলার প্রতিনিধিদেব ভেতর প্রচণ্ড চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সম্মেলনের প্রথম দিন রাতে প্রতিনিধি বৈঠক বসে দেশবন্ধু নগরে (সম্মেলনের স্থানটির নাম ছিল দেশবন্ধু নগর) G. O. C. র তাঁবুতে। সুভাষচন্দ্র তখনও পৌঁছান নি—কিন্তু আলোচনা শুরু হয়। শরৎ বসু উপস্থিত ছিলেন গোড়া থেকে। উপস্থিত ডেলিগেটদের ভেতর অধিক সংখ্যকই বিপ্লবী দলের সভ্য। মোটামুটিভাবে ঠিক হল যে প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে হবে। প্রশ্ন হল, কে প্রস্তাব উত্থাপন করবে। সুভাষচন্দ্র Working Committeeর সভ্য। বিষয় নির্বাচনীতেও পাশ হয়েছে Working Committeeর প্রস্তাব। কোন পর্যায়ই সুভাষচন্দ্র তার

বিরোধিতার কথা জানান নি। বরং working Committee তে আভাষ দিয়েছেন যে অধিক সংখ্যকের মতের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন না তিনি। সুভাষ চন্দ্রের এ আশ্বাসের ইজ্জৎ দেয়া উচিত। অতএব বিরোধিতা করবেন শরৎবাবু। এমন সময় সুভাষচন্দ্র এলেন—এবং খোলাখুলিভাবে জানালেন সব কিছু। হঠাৎ বরিশালের সতীন সেন তীব্র ভাষায় জানান যে শরৎবাবুকে দিয়ে বিরোধিতার জোর হবে না, সুভাষচন্দ্রকে বিরোধিতা করতে হবে।

সুভাষচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন—"I am in your hands" Working Committee ও বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে যা ঘটেছে সবই বললেন তিনি। মহাত্মাজী কী ভাববেন সে প্রশ্ন তোলেননি। তবে তিনি ও জওহরলাল প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন না সে ধরণের ইঙ্গিত যে গান্ধী পেয়েছেন তা সত্যি। বাংলার প্রতিনিধিরা তাকে যা বলবেন তাই করবেন তিনি। সাব্যস্ত হল যে তিনিই করবেন বিরোধিতা।

পরের দিন যথারীতি মহাত্মা গান্ধী প্রস্তাব উত্থাপন করে তাঁর বক্তব্য রাখেন—আর বিরোধিতা করেন সুভাষচন্দ্র। সুভাষচন্দ্রের সমর্থনে ওজস্বীনী ভাষায় বক্তৃতা করেন সত্যমূর্তী। সুবক্তা সত্যমূর্তীর বক্তৃতা আজও মনে পড়ে আমার।, উচ্চারণভঙ্গী দক্ষিণ ভারতীয়—কিন্তু বলার ধরণ খুব আকর্ষণীয়। গান্ধীজীর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সাধারণ সভায় জেতা একেবারেই অসম্ভব। আমরা চারশ' ভোটে হারলাম। নয়শ ভোট পায় সুভাষচন্দ্র। জওহরলালজীও সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন জানান। প্রসংগত বলা যায়, তিনি ওয়ারকিং কমিটিতে যে আশ্বাস দিয়েছেন সে কথাও জানান। তবে যখন সম্মেলনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে তখন তার পক্ষে নীরব থাকা সম্ভব নয়। নীতি হিসেবে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে। গান্ধীজীর প্রস্তাবে নেহেরুর বিরোধিতা তেমন জোরালো হয় নি।

কলকাতায় দেশবন্ধু নগরে কংগ্রেসের অধিবেশনের সমারোহ হয়েছিল খুব বেশী। এর আগে কোন কংগ্রেসের অধিবেশনে এমনটি হয় নি। এ সময় সুভাষচন্দ্রের পরিচালনায় ২০০০ স্বেচ্ছাসেবক সংগঠিত হয়। এরা সকলেই সামরিক পোষাক পরিহিত। সুভাষ চন্দ্র নিজেও। তিনি ছিলেন G. O. C.। হাওড়া ষ্টেশন থেকে ৩৪ ঘোড়ার গাড়ীতে আসেন নির্বাচিত সভাপতি মতিলাল। তাঁর গাড়ীর আগে সামরিক কায়দায় ২০০০০ স্বেচ্ছা সৈনিক। এদের পুরোভাগে সুভাষচন্দ্র। সে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।

এ অধিবেশনের আগে থেকে কলকাতায় শিল্পাঞ্চলে পাটকলের ধর্মঘট চলছিল। এদের নেতা ছিলেন ডাঃ প্রভাবতী দাশগুপ্তা, কালী সেন প্রভৃতি। এদের সাথে বঙ্গীয় প্রাদেশীক কংগ্রেস কমিটির সম্পর্ক ভাল ছিল না। বরং ক্ষুব্ধ ছিলেন ওরা। এ হরতালের বিষয়ে কংগ্রেসের কিছু করার ছিল না—নৈতিক সমর্থন ছাড়া। সম্মেলনের সময় একদিন প্রায় ১০,০০০ ধর্মঘটী শ্রমিকদের শোভাযাত্রা আনে দেশবন্ধু নগরে। উদ্দেশ্য খুব ভাল ছিল না। কংগ্রেস সম্মেলন পণ্ড করার গোপন উদ্দেশ্যও ছিল কারো কারো মনে। শোভাযাত্রা দেশবন্ধু নগর প্রবেশ করবে কিনা, এ নিয়ে কংগ্রেসের উচ্চতম কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিচার বিশ্লেষণ হয়। সুভাষচন্দ্র খুব বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ। তার মত জানান নেতৃবৃন্দদের। সুভাষচন্দ্র, সেনগুপ্ত, ডাঃ বিধান রায় প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত বৈঠকে। সব কথা শুনে গান্ধীজী বলেন যে শ্রমিক নেতাদের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন ওদের আসতে দেয়া হ'ক। গান্ধীজী সব দায়িত্ব নেন। এল বিরাট শোভাযাত্রা, প্যাণ্ডেলের সামনে জড় হয় শ্রমিকরা। শ্রমিক নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করতে থাকেন। সংবাদ এল যে গান্ধীও ওদের সামনে আসছেন। বিশাল জনতা উদ্বেল হয়ে ওঠে। এলেন মহাত্মা গান্ধী। এসে একখানি মোটর গাড়ীর ছাদের উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেন। শ্রমিকদের বলেন, "তোমরা ২ ঘণ্টার জন্য প্যাণ্ডেলে যেতে পার কিন্তু সম্মেলনের অধিবেশন সুরু হওয়ার একঘণ্টা আগে প্যাণ্ডেল থেকে বেড়িয়ে আসতে হবে। তোমরা রাজী কিনা জানাও।" সমস্ত শ্রমিক জনতা 'গান্ধী মহারাজ কী জয়' ধ্বনি করে সম্মতি জানায়। শ্রমিক নেতৃবৃন্দ অবাক বিস্ময়ে দেখলেন যে তাদের প্রভাবের চেয়ে কৃশকায় এই ফকিরের প্রভাব সহস্রগুণে বেশী।

কমিটি নিয়ে অনৈক্য

কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনের পর থেকে শুরু হয় যুগান্তর ও অনুশীলন দলের সাংগঠনিক ঐক্য প্রচেষ্টা। বন্দী জীবনে মানুষ থাকে আবেগে ভরপুর। এ অবস্থায় মানুষ স্বতঃই আদর্শবাদী হয়—হয় ভাববিহ্বল। অনুশীলন ও যুগান্তর নেতৃবৃন্দের মানসিকতা ছিল ঠিক তেমনি। আশা ছিল যে আদর্শবাদের তাপপ্রবাহ কার্য ক্ষেত্রের কঠিন বাস্তবকে গলিয়ে দিয়ে নতুন সৃষ্টি রচনা করতে পারবে। বিপ্লবী নেতাদের কাছে কৈশোর তথা যৌবনের আদর্শবাদ

emotion, sentiment সব অতীতের বিষয়বস্তু। প্রচণ্ড বাস্তববুদ্ধি প্রণোদিত এরা। বাস্তববুদ্ধি স্বভাবত স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা সীমিত। তাই কাজের ক্ষেত্রে এল যৌথ সংগঠন রচনা করার সমস্যা।

বন্দীজীবনে এই দু'দলের মিলন প্রচেষ্টা আঘাত পেল কার্যক্ষেত্রে এসে। জেলায় জেলায় ঐক্যবদ্ধ সংগঠন তৈরী হতে পারে নি। হয়তো তা সম্ভব হত; কারণ সাধারণ কর্মীরা বরণ করে নিয়েছিল এ মিলন প্রচেষ্টা। বিরোধ হল উচ্চতম কর্তৃপক্ষের মধ্যে। বিরোধ চূড়ান্ত পর্যায়ে ওঠে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন নিয়ে। কেন্দ্রীয় কমিটির কারা সভ্য হবেন – বিরোধ এখানে। অনুশীলন দলের প্রস্তাব হল যে, তুই দলের উচ্চতম কর্তৃপক্ষের সমসংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে কমিটি হোক। এর বাইরে হেমচন্দ্র ঘোষকে নেয়া যেতে পারে। হেমদা যুগান্তরের সাথে যুক্ত ছিলেন না। হেমচন্দ্র ঘোষ প্রাচীনতম বিপ্লবীদের মধ্যে অন্যতম। অনুশীলনের নরেন সেনের সমবয়স্ক হেমচন্দ্র। যুগান্তর দলের প্রস্তাব ছিল অন্য ধরণের। তাদের বক্তব্য বিভিন্ন জেলায় natural leader নিয়ে গঠিত হবে এ কমিটি, জেলাভিত্তিক গোষ্ঠিসমুহের প্রায় সকল নেতাকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে না রাখলে যুগান্তরের অসুবিধা। কিন্তু এ সূত্র মেনে নিলে কেন্দ্রীয় কমিটিতে অনুশীলনের ভাগে কম সভ্য পড়ে। দলগত শক্তির ভারসাম্য বজায় থাকে না। সাংগঠনিক শক্তিকে ভিত্তি না করে ব্যক্তিকে ভিত্তি করে কমিটি গঠিত হবে। এ ছিল বিকল্প প্রস্তাব। বন্দীশালার দেওয়ালের ভিতর যে সৃষ্টিকর্ম রচিত হয়েছে—তা ভেঙে চুরমার হল। এর জন্য বাংলার তুটি বৃহৎ দলের নেতৃবৃন্দ সম্পূর্ণ দায়ী, ইতিহাস তাদের ক্ষমা করেনি। ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী ও ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তীর কাছে মানুষ অনেক আশা করেছিল। কিন্তু তারাও ব্যর্থ হয়েছিলেন সম্পূর্ণভাবে। এঁরা তুজনে একত্র হয়ে প্রচণ্ড চাপ দিলে হয়তো অঘটন ঘটতে পারত। কিন্তু তাঁরা তা করেননি সেদিন। ডাঃ মুখার্জী প্রত্যক্ষ রাজনীতির সংস্রব ত্যাগ করে রাঁচীর স্থায়ী বাসিন্দা হলেন। আর মহারাজ আপন দলের চৌহদ্দির মধ্যে এসে আশ্রয় নিলেন। ঐক্য ভাঙার প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক, তুটি দলের ভেতর শুরু হল অনৈক্য—কেবল অনৈক্য নয়, বিরোধও। সাধারণ কর্মীদের কাছে ধরা পড়ে গেল এরা। তারা বুঝল যে, দলের নেতৃত্ব হচ্ছে একধরনের কায়েমী স্বার্থ, নতুন কিছু দেয়ার ক্ষমতা এদের নেই।

কর্মীরা নতুন পথ ও নতুন নেতৃত্বের খোঁজে থাকে। শুরু হয় ব্যাপক

আলোচনা। এ আলোচনা উভয় দলের কর্মীদের ভেতরই হত।

এ সকল আলোচনায় কোন ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা হতে পারেনি—কারণ নেতৃত্বের অভাব। নতুন পথ নির্দেশের মত নেতা ছিল না। প্রধানত দুটি মত দেখা দিল। একটি হল আশু টেররিজমের রাস্তায় যাওয়া। এখুনি কিছু একটা করে দাগ রেখে যাওয়ার উদগ্র ইচ্ছা। তারা জানতেন যে স্রেফ সন্ত্রাসবাদের সম্ভাবনা কিছু নেই—কেবল দেশকে একটা নাড়া দেওয়া চাই।

অনুশীলন যুগান্তর দলের কর্মীদের ভেতর এর সমর্থন ছিল। অনুশীলন দলে এর প্রধান সমর্থক ছিলেন যতীন দাস। উত্তর ভারতের হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান দলের সাথে কাজ শুরু করেন তিনি। কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনের সময় ভগবতীচরণের নেতৃত্বে কয়েকজন আসেন অনুশীলনের নেতাদের সাথে কথা বলার জন্যে। প্রতুল গাঙ্গুলী প্রভৃতিদের সাথে কথা হয়ও। কিন্তু ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা হয় নি। ভগবতীচরণ ভগৎ সিং এর সমপর্যায় মানুষ। কিছুদিন পরে বোমা তৈয়ারী করতে গিয়ে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হয়। ভগবতীচরণের মত কর্মী তখন হাতে গোনা যেত। এর কিছুদিন পরে ভারতীয় সংসদে বোমা নিক্ষেপ করে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত গ্রেপ্তার হন। অনুশীলন নেতৃবৃন্দ নিছক সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করতে পারেননি—কিন্তু পাল্টা কোন বৈজ্ঞানিক কর্মপন্থাও দেখাতে পারেন নি।

এ সময় যে বিরোধ সৃষ্টি হয় তাতে আমি আমার অন্তরঙ্গ সাথীদের সাথে একমত হতে পারি নি। এদের ভেতর ছিলেন সতীশ পাকড়াশি ও নিরঞ্জন সেন। রাজনৈতিক জীবনের গোড়া থেকে নিরঞ্জন আমার সহযাত্রী। আমার থেকে সামান্য কিছু বয়সে বড়। ১৯২১-২৫ সালে একত্র কাজ করেছি আমরা। সতীশ-দা ছিলেন বড় ভাই এর মতন। প্রথম জীবন থেকে রাজনীতি শিক্ষা করেছি তাঁর কাছ থেকে, ১৯২১-২৩ সালে বরিশাল জিলার অনুশীলন দলের সংগঠক ছিলেন। এ দু'জনের সাথে বিচ্ছেদ ছিল খুব বেদনাদায়ক। সতীশদার সাথে অনেক তর্ক করেছি—কিন্তু একমত হতে পারি নি। তিনিও আমাকে বোঝাতে পারেন নি। এদের সাথে মতান্তর হল কিন্তু মনান্তর হয়নি কোনদিন। আমরা শেষ পর্যন্ত সৌহার্দ বজায় রেখেছি।

এ অধ্যায়ে যুগান্তর দলের অবস্থা অনুশীলন দলের মতনই। যুগান্তর দলের ভাঙন ছিল আরো গভীর, আরো ব্যাপক। বরিশাল ও মাদারীপুরের ভাঙন ছিল সবচেয়ে বেশী। চট্টগ্রামের দল কতকটা স্বতন্ত্রভাবে চলা শুরু করে।

এদের সাথে যুগান্তর ও অনুশীলন দলের বিদ্রোহীদের সম্পর্ক ছিল খানিকটা। একটি তৃতীয় দল গঠনের চেষ্টা করেন সকল বিদ্রোহীরা—কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি—কারণ নেতৃত্বের অভাব।

যতীনদাস ও উত্তর ভারতের আন্দোলন

এ তো গেল আভ্যন্তরীণ অবস্থা। বাইরের দিকে অর্থাৎ কংগ্রেসের রাজনীতিতে খুব বিরোধ বেঁধে ওঠে। কংগ্রেসের নিজস্ব সরকারী সংগঠন ছিল না। মহাত্মা গান্ধীর অনুগামীরা কংগ্রেসের বাইরে গঠনমূলক কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। ফলে বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেসকে বিপ্লবীদের উপর নির্ভর করতে হত প্রচণ্ডভাবে। দুটি বড় দলের বিরোধ কংগ্রেস নেতৃত্বের ভেতর ফাটল সৃষ্টি করে। বাংলায় দুজন প্রথম সারির নেতা ছিলেন—সেনগুপ্ত ও সুভাষ বোস। পরিতাপের বিষয়, এরাও এই দুটি দলের ঝগড়ার সাথে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেন। প্রাদেশিক কংগ্রেসের ভেতরও প্রচণ্ড বিরোধ শুরু হয়, ফলে কংগ্রেসের কাজ ব্যাহত হয় বিরাটভাবে।

২৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর আমার সহকর্মী বন্ধু যতীন দাস প্রায়োপবেশন করে মৃত্যুবরণ করেন। বন্দীনিবাসে রাজনৈতিক বন্দীদের মর্যাদা ছিল না কিছুই। সাধারণ কয়েদীর ব্যবহার পেত তারা। অত্যন্ত জেদী, দুঃসাহসী যতীন দাস। রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য প্রাণ দিয়ে ইতিহাসে অমর হলেন। যতীন দাস ভারতবর্ষের টেরেন্স্ ম্যাক্সুইনি। যতীন ছিলেন সত্যিকার বিপ্লবী। বাংলাদেশে বিদ্রোহীদের সাথে ছোট গোষ্ঠী রচনা করার সার্থকতায় আস্থা স্থাপন করেন নি যতীন দাস। সে উত্তর ভারতে অনুশীলনের সহযোগী দল হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান দলের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ শুরু করে। উত্তর ভারতের বিপ্লবী দলের আদি সংগঠক ছিলেন শচীন সান্যাল। ১৯২২ সালে সেখানে কাজের দায়িত্ব নিয়ে যান যোগেশ চট্টোপাধ্যায়। যোগেশবাবু ছিলেন উঁচু পর্যায়ের সংগঠক। অল্পদিনের ভেতর সেখানে ব্যাপক সংগঠন গড়ে ওঠে। তারই ফলশ্রুতি কাকোরী ট্রেণ ডাকাতি ও ষড়যন্ত্র মামলা। যোগেশবাবু ও শচীনবাবু উভয়েই এ মামলার আসামী ছিলেন। এ ছাড়া কর্মীদের ভেতর ছিলেন রাম প্রসাদ বিসমিল, আশফাকুল্লা ও রাজেন লাহিড়ী। উত্তরকালে এ তিনজনের ফাঁসী হয়। কাকোরী মামলায় নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হলে পরে দলের দায়িত্ব এসে পড়ে তরুণ নেতা চন্দ্রশেখর আজাদের উপর। আজাদ

তার পদবী নয়। জেলে থাকাকালীন এই তরুণ কর্মীর উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হয়। তার জন্য তখনকার কংগ্রেস নেতারা চন্দ্রশেখরকে আজাদ পদবীতে ভূষিত করেন। সেই থেকে চন্দ্রশেখর আজাদ নামে পরিচিতি। এই দুর্ধর্ষ বিপ্লবী দীর্ঘ দিন পলাতক থেকে উত্তর ভারতে—বিশেষ করে উত্তর প্রদেশ ও অবিভক্ত পাঞ্জাবে জোরদার সংগঠন গড়ে তোলেন। তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য বড রকমের পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়। ভগৎ সিং, রাজগুরু, বটুকেশ্বর তখন ধরা পডলেও আজাদ গ্রেপ্তার এড়িয়ে চলেছেন। উত্তরকালে এ বিপ্লবী বীরের মৃত্যু হয় এক প্রত্যক্ষ সংগ্রামে। এলাহাবাদে পুরুষোত্তম পার্কে দিনের বেলায় পুলিশের সাথে লড়াই করে মৃত্যু বরণ করেন চন্দ্রশেখর।

কাকোরী মামলার পর থেকে সরকারীভাবে উত্তর ভারতের সংগঠনের দায়িত্ব নেন জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার। তিনি প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, বিহার বিদ্যা-পীঠের অধ্যাপক। তার বোন পার্বতী দেবী। পার্বতী দেবী ছিলেন নিরলস কর্মী। নিখিল ভারত নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনের সভাপতি। তার ছোট ভাই ইন্দ্রচন্দ্র নারাং যাদবপুরে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটের ছাত্র। ১৯৩০ সালে গ্রেপ্তার হয়ে আমাদের সাথে একসাথে বন্দীনিবাসে ছিলেন।

জয়চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার যে বিপ্লবী সংগঠনে যুক্ত থাকতে পারেন—এ ধারণা অনেকেরই ছিল না। ভগৎ সিংহ প্রভৃতি নওজোয়ান ভারত সভার নেতৃবৃন্দ বিদ্যালঙ্কারের নির্দেশ মতনই কাজ করতেন। যতীন দাস ১৯২৫ সালের গ্রেপ্তারের আগে কলকাতায় সক্রিয় জংগী কর্মী ছিলেন। তখন শচীন সান্যাল অনুশীলন দলের ভার নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। নরেন্দ্রমোহন সেন আনুষ্ঠানিকভাবে শচীনবাবুকে ভার অর্পণ করেন এবং শচীনবাবুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। কলতাতায় তখন যতীন দাস শচীনবাবুর ঘনিষ্ট সহকারী। সে সময়ই উত্তর ভারতের কর্মীরা শচীনবাবুর সাথে দেখা করতে আসত। তার জন্য যতীনের সাথে উত্তর ভারতের কর্মীদের পরিচয়। জেল থেকে বেরিয়ে আসার পরও যতীন উত্তর ভারতের সাথীদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন। দিল্লী, লাহোর প্রভৃতি কেন্দ্রে যতীনের যাতায়াত ছিল। এ সম্পর্ক ধরেই লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হয় যতীন দাস। কলকাতায় কংগ্রেসের সময় যতীন সুভাষচন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের Major

ছিলেন। যতীন এ সময় সুভাষচন্দ্রের সান্নিধ্য লাভ করেন। সুভাষচন্দ্র তাকে খুব স্নেহ করতেন। যতীনের মৃত্যুর পর তার শবদেহ লাহোর থেকে কলকাতা পর্যন্ত আনার ব্যবস্থা করেন সুভাষচন্দ্র। হাওড়া টাউন হল থেকে কেওড়াতলা শ্মশানঘাট পর্যন্ত যে বিরাট শোভাযাত্রা হয়, তার পুরোভাগে ছিলেন সুভাষচন্দ্র। সমস্ত পথ পায়ে হেঁটে এই ঐতিহাসিক শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন। দেশবন্ধুর শবদেহ নিয়ে কলকাতায় যে বিরাট শোভাযাত্রা হয়—এ শোভাযাত্রাও তারই সমতুল্য ছিল। কলকাতার নাগরিকরা সেদিন রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে মৃত্যুঞ্জয়ী বীরকে সম্বর্ধনা জানায়। যতীন বাঙালীর আদরের সন্তান।

১৯২৯ সাল থেকেই রাজনৈতিক হাওয়া দিনের পর দিন গরম হতে থাকে। কলকাতা কংগ্রেস থেকে মহাত্মাজী আবার কংগ্রেসের হাল ধরেন। তিনি সর্বসম্মতিক্রমে লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। কংগ্রেস কর্মীরা স্বতঃই মনে করে যে এক ধরণের চরমপত্র যখন দেওয়া হয়েছে, তখন গান্ধীজীর সভাপতি হওয়া উচিত। কিন্তু গান্ধী পদত্যাগ করে জওহরলালকে সভাপতি করেন। দূরদর্শী নেতা একজন যুবক নেতাকে কংগ্রেস সভাপতি করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। আর বিশেষ করে জওহরলালের মতবাদ যতই চরমপন্থী হোক না কেন—তিনি কোনদিনই গান্ধীর অবাধ্য হবেন না। এ নির্বাচন কংগ্রেসে বামপন্থী মতবাদের স্বীকৃতি।

বাংলায় বৈপ্লবিক আন্দোলন শুরু না হলেও উত্তর ভারত ছিল খুব গরম। বাংলায় মেছুয়াবাজারে একটি বাড়ীতে গ্রেপ্তারের পর মেছুয়াবাজার বোমার মামলা শুরু হয়। নিরঞ্জন সেন ও সতীশ পাকড়াশি তার প্রধান আসামী। উত্তর ভারতে একের পর এক action হতে থাকে। কিছু ডাকাতিও হয় অর্থের জন্য। বিহারের মৌলানিয়া ডাকাতি তার অন্যতম। যোগেন্দ্র শুকুল ছিলেন এ মামলার প্রধান আসামী। দীর্ঘদিন পলাতক থেকে পরে ধরা পড়েন।

এ সময় বাংলাদেশে যুগান্তর ও অনুশীলন দল তাদের আভ্যন্তরীন গোলমাল মেটাতে ব্যস্ত। তার উপর বাইরের দিকে কংগ্রেসের কর্তৃত্ব নিয়ে বিরোধ। এ এক অস্বাস্থ্যকর অবস্থা। Independence for India League এর কাজ একরকম বন্ধ। কারণ যে ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবীদের প্রচেষ্টায় লীগের সৃষ্টি—তারা আত্মকলহের জন্য কোন কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে নি।

ছাত্র আন্দোলনে পার্টির ঝগড়া

এ অধ্যায়ের সব চেয়ে গর্বের বিষয় ছিল ছাত্র আন্দোলন। অসহযোগ আন্দোলনে ছাত্ররা ছিল এক বিরাট শক্তি, তারা বিদ্যায়তন ত্যাগ করে কংগ্রেসের কাজেই আত্মনিয়োগ করেন। কেউ কেউ বা আবার ফিরে যান আপন আপন বিদ্যায়তনে। বিপ্লবীদের শক্তির কেন্দ্র ছিল ছাত্র সমাজ। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীও ঘোষণা করলেন—সক্রিয় রাজনীতিতে ছাত্রদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তিনি আঘাত দেন তখনকার শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর। তখনকার শিক্ষাব্যবস্থা বিজাতীয়। ইংরেজের স্বার্থে গোলাম তৈয়ারী করার যন্ত্র মাত্র। শিক্ষায়তন ছিল গোলাম খানা। এখানে অসহযোগ করার আহ্বান জানান মহাত্মাজী। জাতীয় শিক্ষার কথাও তোলেন তিনি। কিন্তু এর সত্যিকার রূপ দেয়ার অবসর ছিল না তাঁর।

এমনি অবস্থার ভেতর গড়ে ওঠে একটি প্রাদেশিক ছাত্র সংগঠন। এর সভাপতি ছিলেন আচার্য প্রফুল্ল রায়। খুব প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে যুক্ত না থাকায় এর খুব বিস্তার হয়নি। ঐ সময় আমার সতীর্থ ও বন্ধু রংপুরের বীরেন দাসগুপ্ত সম্পাদক ছিল একটি প্রাদেশিক ছাত্র সংগঠনের। কিন্তু এরও জোর ছিল না খুব।

জোরদার আন্দোলন শুরু হয় ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। ৩রা ফেব্রুয়ারী সাইমন কমিশন এল ভারতবর্ষে। উদ্দেশ্য—কী ধরণের স্বায়ত্ত শাসন দেয়া যাবে ভারতবর্ষকে—তারই অনুসন্ধানের জন্য। কংগ্রেস চেয়েছিল গোলটেবিল বৈঠক, কিন্তু পেল রয়াল কমিশন। সাতজন বৃটিশ সভ্যের এ কমিশন বর্জন করার সিদ্ধান্ত নেয় কংগ্রেস। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সারা ভারতে হরতাল ডাকা হয়। ছাত্ররাও সেদিন কলেজ বয়কট করে। প্রেসিডেন্সি কলেজে সাধারণতঃ হরতাল হত না। ৩রা ফেব্রুয়ারী পিকেটিং শুরু হয় প্রেসিডেন্সি কলেজের গেটে। পিকেটারদের ওপর বেপরোয়া লাঠি চালায় পুলিশ। তখন ঐ কলেজের জনপ্রিয় ছাত্র প্রমোদ ঘোষাল আহত হয়। পুরোপুরি বয়কট হতে পারে নি। ঐদিন যারা হরতালের বিরোধিতা করে কলেজে উপস্থিত হয় তার ভেতর একজন কৃতী ছাত্র ছিল—যিনি উত্তরকালে স্বাধীন ভারতবর্ষে পার্লামেন্টের সভ্য হন।

এই লাঠি চালানোর ফলে প্রাণ সঞ্চারিত হয় ছাত্র আন্দোলনে। গড়ে ওঠে একটি প্রাদেশিক ছাত্র সংগঠন—প্রমোদ ঘোষাল সভাপতি এবং বীরেন

দাসগুপ্ত সম্পাদক। যারা এর পুরোভাগে এসেছিলেন, তাদের মধ্যে শচীন মিত্র, কৃষ্ণ চ্যাটার্জী, অমর রায়, কুমুদ ভট্টাচার্য ও জগদীশ চ্যাটার্জী অন্যতম। সুশীল দেব "ছাত্র" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বিরাট আকার ধারণ করে এ সংগঠন All Bengal Students Association—উত্তরকালে A. B. S. A নামে খ্যাত। সাড়া পড়ে গেল সর্বত্র। জিলায় জিলায় সংগঠন তৈয়ারী হয়। ছাত্ররা যেন এরই জন্যে অপেক্ষা করছিল। A. B. S. A. একটি বিরাট শক্তি হয়ে দাঁড়াল বাংলার রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে। ১৯২৮ সালে সমারোহ করে একটি ছাত্রসম্মেলন হয় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে। জহরলাল ও সুভাষ উপস্থিত ছিলেন সে সম্মেলনে। প্রাণ মাতানো দেশাত্মবোধক গান গাইলেন দিলীপ রায়। কিন্তু ১৯২৯ সালের মাঝামাঝি ভাঙন এল ছাত্র আন্দোলনে। A. B. S. A. সংগঠনে রাজনৈতিক প্রভাব অনুপ্রবেশ করে। অনুশীলন ও যুগান্তর দলের ঝগড়া তখন তুঙ্গে। যুগান্তরের নেতৃবৃন্দ এই সংগঠনের উপর প্রভাব কায়েম করতে চান। একে কুক্ষিগত করার চেষ্টার অর্থ হল আন্দোলনের স্বাভাবিক ধারাকে প্রতিহত করা। দুর্ভাগ্যক্রমে তাই হল। A. B. S. A. থেকে বেরিয়ে B. P. S F. নামে একটি সমিতি গড়ে তোলে একটি গোষ্ঠি। প্রাদেশিক কংগ্রেসের দ্বন্দ্ব ডেকে আনা হল ছাত্র আন্দোলনে। বিপ্লবীদের ভেতর বিরোধ, কংগ্রেসে বিরোধ, ছাত্র আন্দোলনেও বিরোধ। রাজনৈতিক গোষ্ঠির গন-সংগঠন (mass organisation) দখল করার প্রয়াস এক ধরণের ব্যাধি। এ ব্যাধি আজও কাটেনি।

*   *   *

লাহোর কংগ্রেস

অনুশীলন কর্তৃপক্ষ ঠিক করেন যে, লাহোর কংগ্রেসের সময়েই চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হবে সারা ভারতের সংগঠনের। ১৯২৯ সালের মাঝামাঝি সাব্যস্ত হয় যে অনুশীলন ছোট খাট terrorism এর রাস্তায় যাবে না। বড় ধরণের armed rising এর দিকে এগোবে পার্টি। পর পর হয়তো কয়েকটি বিদ্রোহের প্রয়োজন হবে। গান্ধীর আন্দোলনের সাথে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হওয়া ছাড়া আর রাস্তা নেই। এ সম্পর্কে চিন্তায়িত পরিকল্পনা কিছু সম্ভব হয়নি তখনও। ঐ সময় উত্তর ভারতের আন্দোলনেও বিভেদ ছিল। হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান দলের অধিকাংশ ছিল ভগৎ সিং এর মতাবলম্বী। তখনকার উত্তর ভারতের মানসিকতা কতকটা বাংলার ১৯১৪-১৫ সালের

মতন। টেররিজমে অটল বিশ্বাস। আর সে টেররিজম হবে প্রচারমূলক। তার জন্যেই ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের মতন প্রথম সারির কর্মীদের Legislative Assemblyতে সংঘর্ষের পরিকল্পনা। তারা জানত যে Assemblyর লবি থেকে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা কম। কিন্তু এ কাজে প্রচার হবে সবচেয়ে বেশী। সে উদ্দেশ্যেই লাজপত রায়ের উপর লাঠি চালায় যে পুলিশ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা। ডিসেম্বর মাসে নিজামুদ্দিন ষ্টেশনে বড় লাট লর্ড আরউইনের গাড়ী ওল্টানোর চেষ্টা। এতে করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ হবে—একথা ওরা ভাবেনি—ভেবেছে যুব সমাজকে উদ্দীপ্ত করার এই পথ।

লাহোরে আমরা হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান দলের কর্মীদের সাথে মিলিত হয়ে আমাদের রাস্তায় তাদের আনা যায় কিনা তার জন্যে চেষ্টা করি। এ ছাড়া উত্তর পশ্চিম সীমান্তের উপজাতিদের ভেতর কি করা যায় এবং বিদেশের সাথে যোগাযোগ রাখার রাস্তা আবিষ্কার বিষয়ও আলোচনা হয়। উপজাতিদের নিজেদের তৈয়ারী অস্ত্রশস্ত্রও জোগাড় করা যায় কিনা সে সম্পর্কে বিচার করা হয়।

আমাদের ভেতর রমেশ আচার্য উর্দু জানতেন—কিছুটা লিখতেও পারতেন। ঠিক হল লাহোর অধিবেশনের পর রমেশবাবু পেশোয়ার হয়ে উপজাতি অঞ্চলে যাবেন। সবকিছু ব্যবস্থা করার জন্য রমেশবাবু ও আমি ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে লাহোরে রওনা হই। আমরা দিল্লীতে একদিন থাকি। তখন দিল্লীতে ছিল হীরেন মজুমদার ওরফে ঝুমু মজুমদার। আমরা লাহোরে পৌঁছে জয়চন্দ্র বিদ্যালংকার ও পার্বতী দেবীর সাথে মিলিত হই। ওদের সাহায্যেই সর্বভারতীয় সম্মেলনের ব্যবস্থা করি। জয়চন্দ্র বিদ্যালংকারের প্রচেষ্টায়ই নেতা নিবাসের সুরক্ষিত অঞ্চলে আমাদের স্থান ঠিক করা হয়। মহাত্মা গান্ধীর তাঁবুর পাশেই ছিল মতিলাল নেহেরুর তাঁবু—তার সাথে সেনগুপ্তর ও আমাদের তাঁবু। আমরা দুটি তাঁবুতে ছিলাম। পরের দিন প্রতুল গাঙ্গুলি, রবি সেন, মদন ভৌমিক পৌঁছান। মহারাজ ও মদনবাবুর সাথে আন্দামানে বহু শিখ নেতাদের বেশ ভাব হয়। তাদের এক অংশ কীর্তি কিষান পার্টি স্থাপন করেন। লাহোরে বাবা শোহন সিং ও অন্যান্য শিখ নেতাদের সাথে কথা হয়। কীর্তি পার্টি ছিল কতকটা কম্যুনিষ্ট মতাবলম্বী। লাহোরে এসে যোগেন্দ্র শুকুল আমাদের ব্যবস্থাপনায় অবস্থান

করেন। জয়চন্দ্র বিদ্যালংকারের মাধ্যমে নও জোয়ান ভারত সভার নেতাদের সাথে আলোচনা হয়। বিদ্যালংকার আমাদের মতাবলম্বী ছিলেন। Terrorismএ কিছু হবেনা এ ছিল তার বিশ্বাস। কিন্তু তরুণ কর্মীরা তার সাথে একমত ছিল না। লাহোরে সারা ভারতের বিপ্লবীদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়, খানিকটা ভাবের আদানপ্রদানও হয়। কিন্তু ফল কিছু হয়নি।

সম্মেলনের পর রমেশবাবু পেশওয়ারের অধিবাসী ডাঃ চারু ঘোষের সাথে সীমান্ত প্রদেশে রওনা হয়ে যান। হিন্দুস্থানী সেবাদলের সাথেও যুক্ত হলাম আমরা। ডাঃ হাদিকারের সাথে দীর্ঘ আলোচনা হয়। প্রতুলবাবু হিন্দুস্থানী সেবাদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য নির্বাচিত হন। এভাবে সারা ভারতের ক্ষেত্রে একটি দল গড়ার ধাঁচ তৈয়ারী করে অনুশীলন দল ফিরে এল বাংলায়।

* * *

কলকাতা অধিবেশনের সিদ্ধান্ত প্রতিপালিত হল লাহোরে। পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ হল বিপুল ভোটাধিক্যে। সুভাষচন্দ্র একটি বিকল্প সরকার প্রতিষ্ঠা করার সংশোধন নিয়ে আসেন। মূল প্রস্তাব ছিল গান্ধীর। তিনি তার বক্তব্যে নতুন আন্দোলনের ইশারা দেন এবং তিনি তার দায়িত্ব নেবেন—তার আভাষও দেন। সে অবস্থায় Parallel Govt. রচনা করার কথা খুব জোর ধরেনি। জহরলালের ভাষণে সমাজবাদের কথা ছিল বিস্তারিত ভাবে। নিঃসন্দেহে কলকাতার পর লাহোর একটি বড় পদক্ষেপ।

লাহোরে আসার পথে গান্ধী তাঁর নীতি অনুযায়ী আরউইনের সাথে দেখা করেন। গান্ধী একা নন। সকল মতবাদের মানুষ নিয়ে গঠিত হয় প্রতিনিধি দল। গান্ধী ভাইসরয়কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জিজ্ঞেস করেন যে, বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষকে অনতিবিলম্বে Dominion Status দিতে প্রস্তুত কিনা। আরউইনও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানান যে, তা সম্ভব নয়। স্বায়ত্ত শাসনের বেশী বৃটিশ সরকার কিছু দিতে প্রস্তুত নয়। গান্ধী তাঁর মনস্থির করেন যে, আপোষ আলোচনার মাধ্যমে আর কিছু পাওয়া সম্ভব নয়। অতএব লড়াই ছাড়া আর রাস্তা নেই। সেই কথাই বলেন তিনি লাহোরে। দিল্লীতে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সভায় ভাইসরয়ের উপর বোমা বিস্ফোরণের নিন্দা করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এটিও গান্ধী নীতির অনুযায়ী। প্রস্তাবে সুভাষচন্দ্র মত দেননি। জওহরলালও প্রথমে Statementএ নাম সই করতে রাজী হননি। কিন্তু গান্ধীর অনুরোধে সই করেন তিনি।

চার ঃ অস্থির অবস্থা

রাভি নদীর তীরে সম্মেলনে, ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর রাত ১২টার সময় প্রচণ্ড শীতের মধ্যে কংগ্রেস সভাপতি পূর্ব স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন। ১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ারী সকল কংগ্রেস সভ্য ফিরে এলেন বিরাট আশা ও উদ্দীপনার মধ্যে। সকলের মনেই এক কথা—লড়াই ত ঘোষণা করা হল অতঃ কিম্?

১৯৩০ সালের গোড়া থেকেই সর্বত্র চাপা চাঞ্চল্য। নতুন সৃষ্টির আগের অবস্থা। কংগ্রেসের ভেতর সাজ সাজ রব। স্বরাজ দলের হাতে ক্ষমতা যাওয়ার পর থেকে গান্ধী ছিলেন গঠনমূলক কাজ নিয়ে ব্যস্ত। কংগ্রেস পরিচালনার দায়িত্ব নেননি তিনি। মতিলাল, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, বিঠলভাই প্যাটেল প্রভৃতি স্বরাজ দলের কাজের অবাধ সুযোগ করে দেওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। জহরলাল ও সুভাষচন্দ্র, নরিম্যান প্রভৃতিরা ছিলেন যুব আন্দোলনের পুরোধা, কংগ্রেসের কাজের সাথে যুব আন্দোলনের কাজেও যথেষ্ট সক্রিয় যোগাযোগ ছিল। শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যোগ ছিল এদের। সুভাষচন্দ্র ছিলেন টাটার শ্রমিক আন্দোলনের নেতা। জওহরলাল A. I. T. U. C-র সভাপতি হন নাগপুর সম্মেলনে। কংগ্রেস জাতীয় আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সংগঠন। তাকে সমৃদ্ধ করে যুব, ছাত্র ও শ্রমিক আন্দোলন। নাগপুরে জাতীয় পতাকার সম্মানার্থে সত্যাগ্রহ, ভাইকাম সত্যাগ্রহ, বন্দবিলা সত্যাগ্রহ। সবার উপর ছিল বার্দোলী সত্যাগ্রহ। এই সকল সত্যাগ্রহে জনসাধারণ বিশেষ করে কৃষক সাধারণ জড়িত ছিল নিবিড়-ভাবে। ভাইকাম্ সত্যাগ্রহ তো হরিজনদের জন্যেই। হরিজনদের আন্দোলন জাতিকে বুঝিয়ে দেয় যে, অস্পৃশ্য, পঞ্চম ও পারিয়া প্রভৃতি সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এ সকল আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনের গণভিত্তিকে গভীর ও ব্যাপক করে। ফলে জাতীয় আন্দোলনের দাবী দাওয়ার ভেতর এদেরও স্থান হয়। ১৯২১ সালের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ও বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশ ও সমর্থনের সাথে যুক্ত হল নিম্ন মধ্যবিত্ত ও কৃষক জনতা। ফলে সুরের পরিবর্তন হল বিপুল

ভাবে। মানুষের জীবনে কৈশোরে, বদল হয় দেহের, বদল হয় কণ্ঠস্বরের। ১৯২১ ও ১৯৩০ সালের ব্যবধান এ ধরণের। ১৯২১ সাল গণ আন্দোলনের শৈশব, আর ১৯৩০ সালের আন্দোলন কৈশোর। দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও বেসরকারীভাবে গঠিত হল। মহারাজ, প্রতুল গাঙ্গুলী, রবি সেন ও রমেশ আচার্য—এদের নিয়ে ছিল কেন্দ্রীয় nucleus এদের কাছাকাছি ছিল আবু কহিলী, অতীন রায়, মদন ভৌমিক, যতীন রায় ওরফে ফেগু রায়। এদের সাথে দ্বিতীয় সারিতে ছিল কুমিল্লার মনীন্দ্র চক্রবর্তী, অমূল্য মুখার্জী, ময়মনসিংহের অমূল্য অধিকারী, ঢাকার পূর্ণানন্দ দাসগুপ্ত, পাবনার মনীন্দ্র লাহিড়ী, রংপুরের সুনীল দেব, মুর্শিদাবাদের মিহির মুখার্জী ও নরেন দাস।

গান্ধীজী পরিচালিত আসন্ন আন্দোলন সম্পর্কে বিষদ আলোচনা হয়। আমরা কতকটা অনুমানে আলোচনা করি। কার্য্যক্রম লাহোর থেকেই ঘোষণা করা হয়েছে। এই কার্যক্রমটি দেখে আমরা অনুমান করি যে, ১৯২১ সালের কার্যক্রমের পুনরাবৃত্তি হবে প্রথম—তারপর আইন অমান্য। তার আগে ছাত্রদের শিক্ষায়তন বর্জন আইনজীবীদের কোর্ট বর্জনের প্রোগ্রামও অনিবার্য। এ কাজের জন্য ৫।৬ মাস যাবে—আর বছরের শেষের দিকে সুরু হবে আইন অমান্য। এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকতে হবে—কিন্তু সমস্ত পার্টি আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করবে না।

অস্ত্র সংগ্রহ

এ উদ্দেশ্যে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন। আমাদের হাতে যে অস্ত্র ছিল তা সামান্য। তা দ্বারা গনআন্দোলনের পরিপূরক কোন আন্দোলন করা সম্ভব নয়। বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে অস্ত্র জোগাড় করাও সহজ। তার জন্য মহারাজ ব্রহ্মদেশে যান। তখনও ব্রহ্মদেশ থেকে আরাকাণের ভেতর দিয়ে অস্ত্র আমদানী করা সহজ হবে মনে করেই মহারাজের ব্রহ্মদেশ পরিভ্রমণ। ব্রহ্মদেশের ফুংগীদের সাথে আলাপ আলোচনা হয় মহারাজের। ফুংগীদের প্রতিষ্ঠা ছিল প্রচণ্ড। তারা বৈপ্লবিক আন্দোলনে বিশ্বাস করতেন। মহারাজ ফিরে এলে পর রাজসাহীর সুধীরানন্দ রায়কে মালয় ও সিংগাপুরে পাঠান হয় বৈদেশিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য। জাপানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার দিকে নজর ছিল বেশী। তার প্রধান কারণ রাসবিহারী বসু।

আমি তখন থাকি মির্জাপুর ষ্ট্রীটে একটি মেসে। ঐ ঘরে থাকতেন

আমাদের একজন নীরব কর্মী গিরিজা ঘোষ। গিরিজাবাবু রাজসাহী কলেজ থেকে আমার সহকর্মী ও বন্ধু। ঘরে অনেক মানুষ আসে, অনেক গোপন কাজ হয়। তার জন্যেই একই ঘরে থাকতাম আমি ও গিরিজাবাবু। পাশের ঘরে ছিল আমাদেরই সহকর্মী জামালপুরের নরেশ সোম। আমার ঘরেই অস্ত্রশস্ত্র আসত এবং ওখান থেকেই বিলি ব্যবস্থা হত। অস্ত্র রাখার ভার ছিল ক্ষিতীশ বন্দোপাধ্যায়, জীতেন গুপ্ত ও রাধাবল্লভ গোপের উপর। একদিন একটি পিস্তল নিয়ে এল টাংগাইলের নরেশ ঘোষ। তখন ঘরে বসা রবিদা ও ক্ষিতীশবাবু। নরেনবাবু অস্ত্র ক্ষিতীশবাবুর হাতে দেয়। পিস্তলটি পরীক্ষা করার জন্যে ট্রিগারটি টেনে দেন ক্ষিতীশবাবু। হঠাৎ বিরাট আওয়াজ হয়ে একটি গুলি রবিদার হাতের তেলো ও উরু ভেদ করে চলে যায়। রবিদার হাত উরুর উপর আলতোভাবে ছিল (ঐ পিস্তলে যে একটি একটি টোটা ছিল, তা নরেন ঘোষের জানা ছিল না। টোটা ও পিস্তল আলাদা আলাদা ভাবেই নিয়ে আসে নরেনবাবু। ভুলে একটি টোটা রয়ে গিয়েছিল পিস্তলে—তাই এ দুর্ঘটনা। ডাঃ সতীন সেনকে খবর দেয়া হয়। তিনি একজন সার্জন নিয়ে আসেন—কিছুদিনের মধ্যেই নিরাময় হয় রাধাদা। সকল জায়গা থেকে অস্ত্র এনে একত্র করার কাজ শুরু হয়। রাজসাহীতে কিছু অস্ত্র ছিল আমার স্নেহাস্পদ সহকর্মী তাতা চৌধুরীর কাছে। তাতা সে অস্ত্র কাউকে দিতে অস্বীকার করে। আমি যেতে সে তা দিয়ে দেয়। অস্ত্রের ব্যাপারে একটি অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকে আমরা সাহায্য পেতাম—তিনি হলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া গ্লাশ ওয়ার্কসের অনাদি সেন।

স্বাধীনতার সংকল্প

এদিকে সারা ভারতে কংগ্রেসের কাজ এগিয়ে চলে তড়িৎ গতিতে। প্রথম ধাপ ছিল ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতার সংকল্প বাক্য পড়া হবে। সংকল্প বাক্য রচনা করে ওয়র্কিং কমিটি। বাংলা কংগ্রেস তখন দ্বিধাবিভক্ত—সেনগুপ্ত ও সুভাষচন্দ্রের দল। জানুয়ারী মাসে শেষের দিকে উভয় গোষ্ঠির কোন নেতাই কলকাতায় উপস্থিত নেই। সেনগুপ্ত রেঙ্গুন জেলে বন্দী। আর সুভাষচন্দ্র বেআইনী শোভাযাত্রা পরিচালনা করার জন্য আলিপুর জেলে। এদের অনুপস্থিতিতেই ২৬শে জানুয়ারী উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠান পালন করার জন্য কোন সাংগঠনিক প্রস্তুতি ছিল না।

২৬শে জানুয়ারী শীতে সকালে স্নান করে শুভ্র ও শুদ্ধ খাদি পরে সংকল্প বাক্য পাঠ করার জন্য শ্রদ্ধানন্দ পার্কে যাই। ধীরে ধীরে পূর্ণ সংকল্প বাক্য পড়া হয়। আমরাও সাথে সাথে মন্ত্রের মত উচ্চারণ করি পর পর। যখন পড়া শেষ হল—তখন মনে হল উপস্থিত জনতা সংকল্প রক্ষা করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সে এক মহিমাময় অনুভূতি। আমি যেন আর একা নই। উপস্থিত জনতার অবিচ্ছেদ্য অংগ। ব্যষ্টি মনোভাবের জায়গায় সৃজন হল এক মধুর সমষ্টি মানসিকতা। সংকল্প বাক্যের রচনাশৈলী অপূর্ব। ইংরেজ ভারতবর্ষের কি কি ক্ষতি করেছে—তার বর্ণনা। অথচ কোন আক্রোশ বা অসূয়া নেই কোথাও।

সারা কলকাতা মহানগরীর কী এক অপরূপ সজ্জা। সেদিন কলকাতায় শতকরা ৮০টি বাড়ীতে জাতীয় পতাকা গর্বোন্নতভাবে উড্ডীন। শতকরা ৮০ জন মানুষ আনুষ্ঠানিকভাবে জানাল যে তারা ইংরেজ শোষন থেকে পূর্ণ মুক্তি চায়। কোথাও আপোষ রফার স্থান নেই। দেখে মনে হল গান্ধী এক বিরাট যাদুকর। একটি কাজের ভেতর দিয়ে বুঝে নিলেন তার সমর্থনের পরিধি কত। গান্ধীকে আর কোন পার্থিব শক্তি ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। অনুশোচনায় মাথা অবনত আমার। ঠিক এক বছর আগে কলকাতা কংগ্রেসে তার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ভোট দিয়েছি—আমাদের অনুমান যে কত ভুল—তা হাতেনাতে প্রমানিত হল।

পার্টির নেতৃবৃন্দের কিন্তু এ ধরণের অনুভূতি ছিল না। সুভাষচন্দ্র মান্দালয় জেল থেকে মুক্তির পর থেকে সংগ্রামের কথা বলেছেন। তিনি গান্ধীর কাছে যান সংগ্রামের প্রস্তাব নিয়ে। গান্ধী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় জানান—"সুভাষ আমাকে যদি সেনাপতি বলে মানো তাহলে কখন এবং কি ভাবে সংগ্রাম হবে—তা আমি ঠিক করব। এখন সংগ্রামের সময় নয়—গঠনমূলক কাজের সময়।" তারপর দু'বছর Independence for Indian Leagueএর ভেতর দিয়ে নতুন নেতৃত্বের অনুসন্ধান চলে। কিন্তু অযাচিত ভাবে গান্ধী এলেন সংগ্রামের বাণী নিয়ে। কে তাকে অস্বীকার করবে? Independence for India League ভেঙে গেল। গান্ধীর এই নিজস্ব ভঙ্গিমা ও কর্মনীতির সাথে যারা পরিচিত নন, তারা তাকে বুঝতে অক্ষম। কম্যুনিষ্টরা তাকে কোনদিনই বুঝতে পারেনি।

ফেব্রুয়ারী মাসে ওয়ার্কিং কমিটির সভা হয়। সভা থেকে ফিরে এলেন

বাংলার একমাত্র সভ্য জে· এম সেনগুপ্ত। এলগিন রোডে তার ভাড়া বাড়ীতে গেলাম আমরা। কার্যকরী সমিতির সিদ্ধান্তের তাৎপর্য বুঝতে চাই। সেনগুপ্ত জানান যে, গান্ধী লবন আইন ভেঙে সত্যাগ্রহ শুরু করবেন ৬ই এপ্রিল। গান্ধীজীর কার্যক্রম সম্বন্ধে সেনগুপ্ত খুব আশাবাদী ছিলেন না। তিনি খোলাখুলি জানান "লবন আইন ভেঙে কি হবে? কিন্তু গান্ধী খুব আশাবাদী।" নেতাদের সাথে পিছনের সারিতে বসেছিলাম আমি। ভাবলাম কি বিচিত্র অবস্থা। বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত নেতা জানেন না যে লবন আইন ভেঙে কি হবে! অথচ গান্ধীজী ১২ই মার্চ রওনা হবেন সাবরমতি আশ্রম থেকে পাদপরিক্রমায়। ২০০ মাইলের দীর্ঘ পথ ৬১ বছরের বৃদ্ধ পায়ে হেঁটে যাবেন ডাণ্ডি পর্যন্ত। সাথে ৭৯ জন বাছাই করা স্বেচ্ছাসেবক। কোন নামজাদা নেতা নেই তাঁর সাথে। ভারত পথিক যাত্রা করবেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অন্বেষণে। এ এক মহিমাময় যাত্রা—গান্ধী এই যাত্রীদলের সবার আগে।

"আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী"

শ্রদ্ধেয় নন্দলাল বসু নিখুঁত ছবি এঁকেছেন আঁধারের যাত্রীর। যাত্রী এগোচ্ছেন—আঁধারও দূর হচ্ছে। যাত্রার আগে গান্ধীজী জানালেন যে—স্বাধীনতা না পেয়ে তিনি আর সাবরমতি আশ্রমে ফিরবেন না। সাবরমতি আশ্রমে বাস করার জন্য আর কখনও ফেরেন নি। তিনি আরও জানিয়ে-ছিলেন—স্বাধীনতা না পেলে তার দেহ আরব সাগরের জলে ভাসবে। এতো আবেগের কথা—যেমন ছিল ১৯২১ সালে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে স্বরাজ আনার প্রতিশ্রুতি। গান্ধী নিজেও জানতেন যে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে স্বরাজ লাভ অসম্ভব। কিন্তু গণজাগরনের জন্য হয়তো এ প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন ছিল।

আশ্রম থেকে যাত্রা শুরু করে রোজই ১০ মাইল করে হেঁটেছেন এ সত্যাশ্রয়ী রাজনৈতিক তাপস। এক একটি দিন পড়ছে, আর সারা ভারত উথলে পড়েছে। পথিক চলেছে—আর সারা ভারতে কর্মীরা হাজির হচ্ছে তাঁর কাছে। লবন আইন অন্যান্য সম্বন্ধে নানান প্রশ্ন। কি কর্মনীতি, কোন ধরণের কর্মকৌশল, সরকারী দণ্ডনীতি সম্পর্কে কি কর্তব্য, সত্যাগ্রহ সংগঠনের রূপ কি প্রভৃতি? পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু গেলেন সদলবলে। গেলেন

বাংলার বিপ্লবীরা। তাদেরও নানা প্রশ্ন। যেন ছাত্র প্রশ্ন করছে শিক্ষকের কাছে—আর শিক্ষক দিচ্ছেন তার উত্তর।

বাংলাদেশে প্রস্তুতিপর্ব চলছে। দু-দল আলাদা আলাদাভাবে কাজ করবে। সত্যাগ্রহ পরিষদ আর প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি। পরিষদের নেতা সতীশ দাসগুপ্ত আর প্রাদেশিক কংগ্রেসের পূর্ণচন্দ্র দাস। এ ছাড়া পরিষদের সাথে যুক্ত আর একটি দল আইন অমান্য করে কাঁথিতে। এ দল বাঁকুড়া অভয় আশ্রম থেকে যাত্রা স্বরু করে পায়ে হেঁটে কাঁথি যায়।

৬ই এপ্রিল স্বরু হয় প্রত্যক্ষ আইন অমান্য। স্বাভাবিক ভাবে নেমে আসে পুলিশের দণ্ড, নির্যাতন শুরু হয় সকল কেন্দ্রে। নীলায় মৃত্যুবরণ করেন একটি কর্মী। সর্বত্র আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে দাবানলের মত। সে এক ঘুম ভাঙান প্রাণ মাতান উৎসব। আন্দোলনে যোগ দিল ছাত্রসমাজ, A. B. S. A এর তরফ থেকে কলকাতা ও অন্যান্য সহরাঞ্চলে বেআইনী সাহিত্য পড়ে আইন অমান্য করা হয়। স্বয়ং সেনগুপ্ত কলেজ স্কোয়ারে নিষিদ্ধ পুস্তক "দেশের ডাক" পড়ে কারাবরণ করেন। এখন আইন অমান্য কেবল লবন তৈয়ারী করার মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। বেশীর ভাগ জায়গায় বেআইনী নুন তৈয়ারী করে আইন অমান্য করা হয়। সাথে সাথে বিলিতি সামগ্রী বয়কট। বিলিতি বস্ত্র বিক্রয় সম্পূর্ণ বন্ধ। বিলিতি সিগারেটও। রাস্তাঘাটে বা ট্রামে বাসে কেউ সিগারেট খেতে সাহস করত না। জিলায় জিলায়, গঞ্জে গঞ্জে আন্দোলন। কারাবরণ করার জন্য পড়ে গেল কাড়াকাড়ি। জেল ভরে গেল। নতুন জেল তৈয়ারী হল দমদমে।

এ উতরোল অবস্থায় এল প্রাদেশিক সম্মেলন। সম্মেলন হবে রাজসাহীতে। নির্বাচিত সভাপতি অধ্যাপক যতীন ঘোষ কারাগারে। তার পরিবর্তে নির্বাচিত হলেন বিপ্লবী নায়ক বিপিন গাঙ্গুলী। রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনের সভাপতি মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী ও যুব সম্মেলনের প্রতুল গাঙ্গুলী। গুড্ ফ্রাইডের ছুটিতে সম্মেলন। ১৮ই এপ্রিল সম্মেলন শুরু হয়। ঐ দিন শেষ রাত্রে স্থানীয় নেতা সুরেন মৈত্রের বাড়ী ঘেরাও। বিপিনবাবু, মহারাজ ও প্রতুলবাবু গ্রেপ্তার হন। কারণ কি জানা নেই। পরে শোনা গেল যে চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুঠ করেছে বিপ্লবীরা। তার জন্যই এ গ্রেপ্তার। বাংলায় বিভিন্ন জায়গায় গ্রেপ্তার শুরু হয়। কলকাতায় যারা গ্রেপ্তার হন, তাদের মধ্যে সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ, রমেশ আচার্য প্রভৃতি রয়েছেন। রাজ-

সাহীতে উপস্থিত রবীন্দ্র মোহন সেন ও আমার বিরুদ্ধেও গ্রেপ্তারী পরওয়ানা রয়েছে। আমরা সেদিন ডেল্লিগেট ক্যাম্পে ছিলাম না—ছিলাম আমাদের বন্ধু সুধাংশু ব্যানার্জীর বাংলো বাড়ীতে। ওখানে খবর যায় যে আমাদের খোঁজ করছে পুলিশ। আমরা গ্রেপ্তার হলাম না।

চট্টগ্রামে সূর্যবাবু ও বন্ধুরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে কাজ করেছেন—অন্য কারও সাথে যোগ রাখেননি। বাইরের বিপ্লবী দলের সাথে যে সম্পর্ক ছিল তা স্রেফ সৌহার্দ্দিমূলক ও ভাসা ভাসা। আইরিশ বিদ্রোহের অনুকরণে Easter rising করতে চেয়েছিলেন তারা। এখানেও গুড ফ্রাইডের ছুটিতে তারা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রয়াস পান। তারা একথা কখনও ভাবেননি যে ভারতবর্ষের পূর্ব সীমান্তে একটি জিলায় বিদ্রোহ সংগঠিত করে ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটাবেন। তারা সজোরে ধাক্কা দিতে চেয়েছিলেন মাত্র। তারা ভেবেছেন যে চট্টগ্রাম অভ্যুত্থান সশস্ত্র বিদ্রোহের একটি উজ্জ্বল নমুনা মাত্র।

চট্টগ্রামের ঘটনার পরে চরম দণ্ডনীতি অবলম্বন করে সরকার। বিপ্লবের যে ধারা খোলা রাস্তায় প্রবাহিত করার পরিকল্পনা করেছিলাম আমরা—তা গোপন পথে যেতে বাধ্য করে ইংরেজ সরকার। সকল দলের প্রথম ও দ্বিতীয় সারির কর্মীরা বিনা বিচারে আটক হন।

উদ্ভব হল এক নতুন পরিস্থিতি। আমরা আবার নীতি নির্দ্ধারণের জন্য বিশদ আলোচনা করি। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ বা কোন জিলায় অভ্যুত্থানের পথে যাওয়া সঙ্গত মনে করি নি। সন্ত্রাসমূলক কাজের রাস্তায় যাব না ঠিক হল। কিন্তু এতো নেতিবাচক কথা। ইতিবাচক কি করা কর্তব্য, তা ঠিক করা ছিল খুব কঠিন। বিশেষ করে আইন অমান্য আন্দোলন তখন তুঙ্গে।

অহিংসার কার্যকারিতা

পাবনাতে নিরস্ত্র ছাত্রদের উপর লাঠি চালাতে অস্বীকার করে ১৯ জন পুলিশ চাকুরী থেকে বরখাস্ত হয়। অহিংস আচরণ যে কেমন করে সরকারী দুর্গে ভাঙন ধরায় তার প্রমাণ পাবনার পুলিশ। তারপর এল পেশওয়ার ও চারসাদ্দায় খুদাই খিদমদ্গারের অহিংস অভ্যুত্থান। সেখানে অহিংস জনতা armoured Car দখল করে পুড়িয়ে দেয়। পাবনাতে যা ছিল ক্ষুদ্র আকারে এবং পুলিশের ভেতর সীমিত—তার স্ফুরণ দেখতে পাই সৈন্যবাহিনীর মধ্যে পেশওয়ারে। গারওয়ালী কোম্পানীর হাবিলদার চন্দন সিংহ অহিংস সত্যা-

গ্রহীদের উপর গুলি চালাতে অস্বীকার করে কারাবরণ করেন তার সতীর্থদের সাথে। এ এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত। এর চেয়ে আর এক ধাপ এগিয়ে গেল শোলাপুর। সেখানে জনতা পুরো শহরটিকে দখল করে রাখে তিন দিন। ৭২ ঘণ্টার জন্য কোন ব্রিটিশ রাজ ছিল না সেখানে। জনতার সরকার ছিল ঐ তিন দিন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে অহিংস গণ আন্দোলনের কার্যকারিতার উপর নির্ভর করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। বিশেষ করে যে দেশে অস্ত্র রাখা বেআইনী এবং সামরিক বাহিনী শক্তিশালী, সেখানে সশস্ত্র বিদ্রোহ সার্থক করা কঠিন। যতক্ষণ পর্যন্ত সেনাবাহিনীর ভেতর ভাঙন না ধরে এবং তার বড় অংশ বিপ্লবের শিবিরে যোগ না দেয়, ততদিন পর্যন্ত বিপ্লব সার্থক হওয়া অলীক কল্পনা মাত্র। পড়শী শক্তিশালী বৈদেশিক সামরিক বাহিনী সরাসরি যুদ্ধ না করলে সরকারী বাহিনী পরাস্ত হবে না। বৈদেশিক সামরিক সাহায্যের ঝুঁকি প্রচণ্ড। এক ধরণের রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়। সে বাধ্যবাধকতা অনেক সময়ই কল্যাণকর হয় না।

কিন্তু এর পরও কিছু কিছু action হয়েছে। তার উদ্দেশ্য শাস্তিমূলক অথবা প্রচারধর্মী। মেদিনীপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট পেডী, কারা বিভাগের আই জি সিম্‌সন, চট্টগ্রামের পুলিশ ইনস্পেক্টর আসানুল্লা ও তারিনী মুখার্জী প্রভৃতির হত্যা শাস্তিমূলক। তাদের অপরাধের জন্য শাস্তি। আবার কোন কোন হত্যা ছিল মুখ্যতঃ প্রচারমূলক। কিছুটা ভীতি প্রদর্শনের ইচ্ছা ছিল না—তা বলা যায় না।

এ সকল ঘটনা আমার মনকে দোলা দেয় প্রচণ্ডভাবে। বিপ্লবী দলের সক্রিয় দায়িত্বশীল কর্মী আমি। অথচ ভারতবর্ষে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা সম্পর্কে আমার মনে বিরাট জিজ্ঞাসা—অহিংস গণসংগ্রাম যদি সশস্ত্র অভ্যুত্থান অপেক্ষা বেশী কার্যকরী হয়, তবে আমাদের দলের সার্থকতা কোথায়? দল ছেড়ে দেব? কিন্তু তা তো হয় না। বয়ঃজ্যেষ্ঠ নেতারা আমার উপর অনেক দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। তা সুসম্পন্ন না করলে নীতিহীনতার দোষে দুষ্ট হব। আমি এ সময় পলাতক অবস্থায়। দলের ভেতর রবিদা বাইরে ছিলেন। রবিদার সাথে কিছুটা আলোচনা করি। কিন্তু বেশীদূর এগোয়নি তা। কারণ নতুন অধ্যায় শুরু করা তখন আর সম্ভব নয়। আন্দোলনের মোড় ঘোরানো বা রাজনীতির পরিবর্তন করা যাবে বর্তমান অধ্যায় শেষ হওয়ার

পর, তখন নতুন যাত্রা শুরু হবে।

এ সিদ্ধান্ত নিয়েই যুগান্তর দলের নেতাদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করার চেষ্টা করা হয়। তখন মনোরঞ্জন। দা (মনোরঞ্জন গুপ্ত) বাইরে। রবিদা মনোরঞ্জনদার সাথে দেখা করেন। বিশদ আলোচনাও হয়। কিন্তু একত্র কাজ করা বা একধরনের কাজ করা সম্পর্কে কোন ঐক্যমত হয় না।

গোয়েন্দা দলের ভেতর

ধীরে ধীরে সাধারণ রাজনৈতিক আবহাওয়াও পরিবর্তন হয়। আইন অমান্য আন্দোলনও স্তিমিত হয়ে পড়ে। সরকারের প্রচণ্ড দণ্ডনীতির সামনে স্বাভাবিকভাবে শেষের দিকে আইন অমান্যকারীরা ইতস্ততঃ সামান্য হিংসাত্মক কাজ করে। ফলে পুলিশের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যায়। রবিদা গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ার পর গুরুদায়িত্ব এসে পড়ে আমার উপর। বয়ঃজ্যেষ্ঠদের ভেতর কেবল আশুতোষ কাহালি বাইরে ছিলেন। পলাতক অবস্থায় সারা বাংলার ভাঙা সংগঠন পুনর্বার পরিপাটি করার জন্য ভ্রমণ করি। চট্টগ্রাম যাওয়ার পথে চাঁদপুর ষ্টেশনে অসুবিধায় পড়ি। চট্টগ্রামে এর আগে কখনও যাই নি। ঐ দিন-ই চাদপুর ষ্টেশনে তারিনী মুখার্জীকে হত্যা করা হয়। আমি চট্টগ্রাম যাওয়া স্থগিত রেখে কুমিল্লায় যাই। কুমিল্লায় কয়েকদিন থেকে অবস্থা শান্ত হওয়ার পর চট্টগ্রাম পৌছাই। চট্টগ্রাম তখন অবরুদ্ধ শহর। রাতে পাশ ছাড়া বের হওয়া যায় না। আমি বন্ধুবর দয়ানন্দ চৌধুরীর বাড়ীতে উঠি। ওখানে বেশীদিন থাকি নি। চট্টগ্রাম হতে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন জিলায় সংগ্রামের ভার তরুণ কর্মীদের উপর দিই। পুলিশের নির্মম অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্যে সংগঠনের বিকেন্দ্রীকরণ করি। উত্তর বাংলার ভার একজন প্রবীণ ব্যক্তিকে দেওয়া ঠিক করি অনুদার সাথে পরামর্শ করে। তাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য তার হোটেলে যাওয়া স্থির করি। আমি বন্ধু জীবেন গুপ্তের বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ি—সাথে আমার তরুণ সহকর্মী নিরঞ্জন ঘোষাল। নিরঞ্জন খুব সাহসী ও শক্তিধর। সে সর্বদা আমার সাথে থাকতে চাইত। তার ধারণা যেন ২।৪ জন লোক আমাকে রাস্তাঘাটে গ্রেপ্তার করতে পারবে না—যদি সে কাছে থাকে। সেদিনও নিরঞ্জন ছিল। কিন্তু আমার গন্তব্যস্থলে ছিল বিরাট গোয়েন্দাবাহিনীর সমাবেশ। সকলেরই সাদা পোশাক। বেশ কয়েকজন অফিসার। বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত অফিসার

শশধর মজুমদার। আমাকে কাঁধে করে তুলে নিয়ে গেল ওরা। যে প্রধান কর্মীটিকে উত্তরবঙ্গের দায়িত্ব দিতে চেয়েছিলাম, সেই ছিল গুপ্তচর। তার কাছে যে যাব—তা বগুরা নিবাসী ঐ কর্মীটি ছাড়া আর কেউ জানত না। ১৩ নম্বর লর্ড সিংহ রোডে যখন আমাকে নিয়ে যাওয়া হল, তখন গোয়েন্দা পুলিশের কর্তা নলিনী মজুমদারের সাথে দেখা। সে বলল, আপনাকে ধরার জন্য আমাদের একটি important source expose করতে হল। ভিন্ন পর্যায়ে পুলিশের গোয়েন্দা ছিল বিভিন্ন দলে। খুব ছোট গোষ্ঠিতে গোয়েন্দার সংখ্যা ছিল কম। কোথাও কোথাও নেতৃস্থানীয় লোকেরা গোয়েন্দার কাজ করত। জেলের ভেতরেও পুলিশের গুপ্তচর ছিল। কংগ্রেসের ভেতরেও উচ্চ পর্যায় গোয়েন্দার বেতনভোগী মানুষ ছিল। বাংলা কংগ্রেসে উচ্চ পর্যায়ের একজন নেতা রিপোর্ট দিত হোম সেক্রেটারীর কাছে। পুলিশের মাধ্যমে সে রিপোর্ট দিত না—কেউ কেউ গভর্নরের কাছেও দিত। স্বাধীনতা লাভের পর সম্ভবত বৃটিশ আমলের দুজন গোয়েন্দা পশ্চিম বাংলায় মন্ত্রী হয়। ১৯৩৯-৪০ সালে প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্মকর্তাদের ভেতরও ছিল গোয়েন্দা। আমি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সহকারী সম্পাদকের মধ্যে একজন। সুভাষচন্দ্রের সাথে গভীর রাত্রে গোপন বৈঠক হত আমাদের। তারমধ্যে ঐ প্রবীন কর্মীও থাকত। কিছুদিন পরে জানা যায়, সে গুপ্তচর। শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় সরকারের ভেতরকার খবর পেতেন। তিনি গুপ্তচরদের তালিকা পেতেন কোন উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তির কাছ থেকে। সেই তালিকায় ঐ প্রবীণ সহকর্মীর নাম পাওয়া যায়। তারপর থেকে সকলেই সাবধান হয় তার সম্পর্কে।

চুক্তি ও সমালোচনা

যখন গ্রেপ্তার হই তখন আইন অমান্য নেই বললেও চলে। কিছু কিছু কংগ্রেসী বন্দী মুক্তিও পাচ্ছে তখন।

বৃটেনের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দল রাষ্ট্রক্ষমতায় আসে। তারা সাইমন কমিশনের উপর জোর না দিয়ে গোল টেবিল বৈঠক ব্যবস্থা করে। প্রথম গোল টেবিল বৈঠক বসে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে। আলোচনায় দেখা গেল যে দেশের সত্যিকার প্রতিনিধিদের বাদ দিয়ে কোন মীমাংসা সম্ভব নয়। তাই ভারতীয় প্রতিনিধিদের বিশেষ করে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, তেজবাহাদুর সাপ্রু ও এম. আর. জয়াকরের চাপে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদের মুক্তি দেয়া

হয়। প্রতিনিধিরা দেশে ফিরে আসার পূর্বেই এদের মুক্তি হয়। গান্ধীজী ও তাঁর সহকর্মীদের মুক্তির সাথে সাথে আইন অমান্য আন্দোলনের সমাপ্তি হয়। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মুক্তির পরই কার্যকরী কমিটি বৈঠক বসে। শুরু হয় ভারত সরকারের সাথে আলাপ আলোচনা। কংগ্রেসের পক্ষে গান্ধীজী ও অন্য পক্ষে ভাইসরয় লর্ড আরউইন। দীর্ঘ আলোচনার পর গান্ধী আরউইন চুক্তি সই হয়। চুক্তি সই হওয়ার পর কংগ্রেসের সকল বন্দী মুক্তি পায়। কেবল হিংসাত্মক কাজে জড়িত মানুষদের মুক্তি ভবিষ্যৎ আলাপ আলোচনার জন্য স্থগিত রাখা হয়। লিখিত চুক্তি ছাড়া আরও দু'একটি বিষয়ে প্রতিকার চান গান্ধীজী। তার মধ্যে একটি হল Police Excesses পুলিশী অত্যাচারের অপরাধের একটি ছিল সুভাষচন্দ্রের উপর লাঠির আঘাত। গান্ধী আরউইন প্যাক্ট্ সই হওয়ার কয়েকদিন আগে শোভাযাত্রা পরিচালনা করতে গিয়ে মনুমেন্টের কাছে সুভাষচন্দ্রের উপর নির্মমভাবে লাঠি চালায় পুলিশ। গান্ধী এ ব্যাপারটির উপর গুরুত্ব দেন আলোচনাকালে। কিছুদিন পরে কলকাতা পুলিশের কমিশনার কুখ্যাত Sir Charles Teggart কে ভারতবর্ষ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়।

ভারত সরকারের সাথে চুক্তির বহু সমালোচনা হয়েছে। কংগ্রেস নেতাদের অনেকে সমালোচনা করেছিল খুব তীব্র ভাষায়। এ চুক্তি ভারতবর্ষের পক্ষে অপমানজনক—এই ছিল অভিযোগ। আমার সেদিনও মনে হয়েছে এবং আজও মনে করি এ চুক্তি ভারতবর্ষের জয় সূচনা করে। এ চুক্তিতেই বৃটিশ সরকার লিখিতভাবে কংগ্রেসকে তার বিকল্প বলে মেনে নিয়েছিল। ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ চার্চিল এ কথাটি বুঝেই ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিলেন An inner temple lawyer, how a seditions fakir, striding, half naked on the steps of viceroy's palace, to parley with his Majesty's representative on equal terms.

চার্চিলের গায়ের জ্বালা ফুটে উঠেছে এই উক্তিতে। Equal terms এ আলোচনা করা চার্চিল সহ্য করতে পারেনি। এ চুক্তি গান্ধীর জয়—ভারতের জয়। বৃটিশ সরকারের কেবল কংগ্রেসই বিকল্প, এ সম্মান ১৯৪৬ সালে বজায় রাখতে পারেনি…কংগ্রেস নেতৃত্ব। তখন কংগ্রেসকে মোসলেম লীগের সাথে যুক্ত করেছে ইংরেজ সরকার—আর তা মেনে নিয়েছে কংগ্রেস নেতৃত্ব। এখানেই কংগ্রেসের ব্যর্থতা।

দ্বিতীয়বার গ্রেপ্তার

যে রাত্রে গ্রেপ্তার হই, সেই রাত কাটাই ১৩ নং লর্ড সিংহ রোডে। সারা রাত একটি চেয়ারে বসে। পরের দিন গোধূলির আলো আঁধারে প্রেসিডেন্সি জেলে প্রবেশ করি। সেখানে বন্ধুরা অভ্যর্থনা জানায়—আমার প্রিয় বন্ধু অসিত ভট্টাচার্য তরুন বন্ধু তারানাথ লাহিড়ীর হাত ধরে তার ঘরে নিয়ে যায়। তখন নেতাদের মধ্যে রমেশবাবু ছিলেন ঐ জেলে। তার সাথে দেখা করে সকল খবর জানাই তাকে।

এখানে অল্প কিছুদিন থাকার পর বক্সা দুর্গে স্থানান্তরিত হই। বক্সা দুর্গ ভুটান সীমান্তে। ২৫০০ ফুট উঁচু পাহাড়। দুর্গম স্থান। পুলিশের খাতায় যারা বেশী অপরাধী তাদের আটক রাখার জন্যে এই সাবধানী ব্যবস্থা। কাঁটাতারের ঘেরা দুর্গটি। অল্প দূরে দূরে উঁচু Sentry Box। সশস্ত্র প্রহরী পাহারায় রত। বক্সাতে সকল দলের নেতৃবৃন্দই ছিলেন। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, জ্যোতিষ ঘোষ, সুরেন ঘোষ, মনোরঞ্জন গুপ্ত, প্রতুল গাঙ্গুলী, অরুণ গুহ ও ভূপতি মজুমদার, রবি সেন, ভূপেন দত্ত প্রভৃতি।

এবারে কোন রাজনৈতিক ঐক্যের কথা ওঠেনি। আর ওঠানোর মত ব্যক্তিত্বশালী মানুষও ছিল না কেউ। বাইরের ঝগড়ার রেশ ছিল তখনও। দ্বিতীয় সারির নেতারাও ছিলেন ওখানে। মজার কথা, যারা বাইরে আপন আপন দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল—তারা জেলে এসে কিন্তু পুরানো গোষ্ঠীর সাথে মিলিত হয়।

নেতৃবৃন্দ যেন কতকটা শ্রান্ত-ক্লান্ত। ধরে নিয়েছিল যে দীর্ঘদিনের জন্য জেলে থাকতে হবে, অতএব লেখাপড়া করে কাটানো যাক্। অনুশীলন দলের ভেতর ভবিষ্যৎ কাজকর্ম কি হবে—তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। দলের উদ্দেশ্য কী কেবল ইংরেজ বিতাড়ন না আরো কিছু—তার চর্চাও শুরু হয়। সাধারণভাবে ঠিক হয় যে সোস্যালিজম্ হবে দলের চরম লক্ষ্য। ১৯৩১ সালে সোস্যালিজম সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়। সোস্যালিজম সম্পর্কে কিন্তু পরিচ্ছন্ন ধারণা ছিল না অনেকেরই। এটুকু ধরে নেয়া হয়েছে যে দুর্গত মানুষের সরকার হবে এবং তার রাজ্যে গণবিপ্লব প্রয়োজন। অনুশীলনের সারা ভারতে দল গঠনের প্রচেষ্টা আগে থেকেই ছিল এবং terrorism করা উচিত নয়—এ ধারণাও ছিল। অতএব মধ্যবিত্তদের নিয়ে বিদ্রোহ না করে—জনমানবকে নিয়ে বিদ্রোহ অহিংস গণ আন্দোলন সম্পর্কে তখন পর্যন্ত

আমাদের ধারণা অপরিচ্ছন্ন।

গণ আন্দোলনে আস্থা স্থাপন কর্মপদ্ধতির দিক দিয়ে এক বিরাট পদক্ষেপ। গণমুখী মনোভাব সৃষ্টি হলে সমাজবাদ ছাড়া অন্য কোন রাস্তা নেই। পার্টির এ পরিবর্তনে ব্যক্তিগত ভাবে আমি খুব আনন্দিত।

বক্সাতে রবীন্দ্রনাথের ৭০ তম জন্মদিন অত্যন্ত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন পরিস্থিতিতে উদ্‌যাপিত হয়। একটি মধুর মানপত্র পড়া হয়। এই মানপত্রটি রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দেই আমরা। কবি তখন দার্জিলিং-এ। ঢিল ছোঁড়ার দূরত্বের দিক থেকে আমাদের কাছেই। কবি মানপত্রটি পেয়ে তার হাতে লেখা, একটি কবিতা পাঠান আমাদের। "বকসা দুর্গে বন্দীদের প্রতি" —এ কবিতাটি পরিশেষেতে ছাপা হয়।

"নিশীথের লজ্জা দিল অন্ধকারে
রবির অঙ্গন
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা সঙ্গীত না মানিল বন্ধন।"

এরপরই চিকিৎসার জন্য প্রেসিডেনসি স্থানান্তরিত হই। বৈপ্লবিক কাজে (action) তখন ভাঁটায় টান। মাঝে মাঝে দু একটি ঘটনা হয়েছে মাত্র। কুমিল্লায় Stevens হত্যা—বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে গভর্ণরের উপর গুলি চালানো তার অন্যতম। এ সব কাজে এগিয়ে এসেছিল বাংলার মেয়েরা। চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুর—এ দুটি জেলা কখনই শান্ত হয়নি। এ সকল কারণে সরকার এক দীর্ঘমেয়াদী নীতি গ্রহণ করে। তার জন্যেই Black and Tan এর কুখ্যাত কর্মচারী বৃটিশ স্বরাষ্ট্র বিভাগের স্থায়ী সচিব Sir John Anderson কে পাঠান হয় বাংলার গভর্ণর রূপে। এণ্ডারসন এসেই খুব দ্রুত রদবদল করে শাসনযন্ত্র। সারা বাংলা যেন যুদ্ধরত দেশ—চট্টগ্রাম যেন যুদ্ধক্ষেত্র। শুরু হয় অমানুষিক পুলিশী অত্যাচার।

এমনি অবস্থায় অনুশীলন দলের বক্সা জেলে বন্দী নেতৃবৃন্দ আশু সশস্ত্র সংঘর্ষের জন্য এক জরুরী কার্যক্রম গ্রহণ করেন। সোশ্যালিজমের যে নীতি গ্রহণ করা হয়—এ কার্যক্রম সে অনুযায়ী হয়নি। জেলের ভেতর এক ধরণের অস্থিরতা এর কারণ। সমাজবাদের সম্পর্কেও খুব গভীর প্রত্যয় জন্মায়নি তখনও। বক্সা থেকে দুজন বন্দী প্রহরীদের চোখ এড়িয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এ ছাড়াও গ্রামের অন্তরীণের স্থান থেকে পালিয়ে যায় আরও ২।৩ জন। এরা বাইরে গিয়ে ভাঙা সংগঠনকে পুনর্গঠনের চেষ্টা করে এবং প্রত্যক্ষ কিছু

করার প্রয়াস পায়। এর পরিণতি আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা। প্রত্যক্ষ ভাবে কিছু করার আগেই কর্মীরা ধরা পড়ে যায়।

সরকারী নীতি অনুযায়ী বাংলার বিপ্লবীদের বাংলার বাইরে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়। এর ফলে দু'চারজন করে বাংলার বাইরে জেলে পাঠানো হয়। এর ভেতর ছিলেন ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ, মনোরঞ্জন গুপ্ত, প্রতুল গাঙ্গুলী, ভূপেন রক্ষিত, রবি সেন, রমেশ আচার্য, সত্য গুপ্ত, অরুণ গুহ, ভূপেন দত্ত প্রভৃতি। এ ছাড়া দেওলী জেল তৈয়ারী হয় বেশী সংখ্যক বন্দী রাখার জন্য।

১৯৩২ সালের ২২শে মে প্রেসিডেন্সি জেল থেকে প্রথম দল রওনা হই দেওলী অভিমুখে। এ দলে আমরা যারা ছিলাম তাদের মধ্যে হরিকুমার চক্রবর্ত্তী, অনিল রায়, সতীশ সেন ও হেমচন্দ্র ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য। কড়া পুলিশ পাহারা। যেন যুদ্ধবন্দীদের স্থানান্তরের ব্যবস্থা। কানপুর কাশী ঝাঁথা প্রভৃতি ষ্টেশন পার হয়ে এলাম কোটায়। স্পেশাল সুরক্ষিত বগী। রাস্তায় সকল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোটাতে পৌছি গোধূলি বেলায়। রাত ১০টা পর্যন্ত বাগীতে বসে। ওখানে কিছু রাতের খাবার দেয়া হয়। তারপর বাসে শুরু হয় যাত্রা। প্রায় ৭০ মাইল পথ। অসহ্য গরম, মে মাসে রাজপুতানার গরম হাওয়া। তার ভেতর দিয়ে চলেছে বন্দীরা। আগে পিছে রাইফেল উঁচিয়ে রক্ষী দল। রাত ১২টার পর গাড়ী এসে দাঁড়াল বড় দেয়াল ঘেরা এক দুর্গের সম্মুখে। এটি বুন্দির কেল্লা। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর যক্ষপুরীর দরজা খুলে গেল। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখি বুন্দির কেল্লা রক্ষা করার প্রহরীকে। ছোট প্যাণ্ট পরা—নগ্ন দেহ এক হাতে বন্দুক—অন্য হাতে হ্যারিকেন লণ্ঠন। বুন্দির কেল্লা মাটির পার রক্ষা করার এ দৃশ্য রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন বলে মনে হয়; নতুবা এ কেল্লা রক্ষা করা যে অসাধ্য কাজ তা জানবেন কেমন করে! এ নকল বুন্দি নয়, সত্যিকারের বুন্দির কেল্লায় প্রবেশ করে তার আঁকা বাঁকা পথ বেয়ে চলে আমাদের ক্যারাভ্যান। প্রায় আধঘণ্টা পরে আবার একটি বড় দরওয়াজা খুলে গেলে আমাদের বাস এঁকে বেঁকে বুন্দির বিখ্যাত কেল্লা পরিত্যাগ করে। অর্দ্ধনগ্ন সাস্ত্রী বা হাতে বন্দুক ও লণ্ঠন ধরে দীর্ঘ সেলাম জানাল পুলিশবাহিনীকে রাত ২টা নাগাদ আমরা দেওলী জেলে পৌছাই। অভ্যর্থনা জানাল বক্সা জেলের ভূতপূর্ব সুপার মিঃ Finney দীর্ঘ ছয় বছরের জন্য রাজপুতানার এ মরুভূমির কারাগারে কারাবাস।

পাঁচ ঃ বন্দীজীবনের আত্মানুসন্ধান

আইন অমান্য আন্দোলনের আলোড়নকারী প্রভাব সম্পর্কে বিপ্লবীরা সচেতন ছিল বলে মনে হয় না। কেবল কোন একটি বিশেষ গোষ্ঠির কথা নয়—সকলের সম্পর্কেই এ কথা প্রযোজ্য। পাঞ্জাব থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত। বিপ্লবীরা কখনই বিশ্লেষণ করে দেখেননি যে সারা ভারতের রাজনীতিতে বিপ্লবীদের ভূমিকা কী বা তাদের কাজের কার্যকরী প্রভাবই কী? গান্ধীর অভ্যুত্থানের পর পরিস্থিতির এক গুণগত পরিবর্তন অনুশীলন। কংগ্রেস ধনীক শ্রেণীর বৈঠকখানা থেকে নেমে এল সাধারণ মানুষের দুয়ারদেশে।

বক্‌সাতে ঠিক হয় যে, অনুশীলন পার্টির লক্ষ্য সাম্যবাদ। সেই সমাজবাদ কী, কেমন করে পৌছানো যাবে লক্ষ্যস্থলে—এসব আলোচনা হয়। এ আলোচনার পথ বেয়ে আমরা মার্কস্‌বাদ পড়তে সুরু করি। তখন মার্কসের সব লেখাই পড়ি—Capital-এর প্রথম খণ্ড বিশেষ করে। জেলে এসব বই পাওয়া যেত না। তার জন্য পড়ার আরও অনুরাগ। পড়ার পর মনে হল মার্কস এঙ্গেলসের মতবাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অস্বীকার করা শক্ত।

কম্যুনিষ্টরাও মার্কসবাদী! কম্যুনিষ্টদের সম্পর্কে পার্টির ধারণা ভাল ছিল না। তার কারণ—ভারতবর্ষ সম্পর্কে ওদের সাহিত্য। ২২ সাল যখন M. N. Roy-এর সম্পাদিত vanguard ও Advanced guard পড়তাম। তখন স্বতঃই মন বিরক্তিতে ভরে যেত অসহযোগ আন্দোলন, বিশেষ করে গান্ধী সম্পর্কে ওদের বক্তব্যে সত্যের লেশমাত্র ছিল না। তখনকার ঘটনাবলীর ওপর তাদের বিশ্লেষণ ছিল একাদশদর্শী ও অজ্ঞানপ্রসূত। তারপর workers Peasant Partyর কাজও ছিল সম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক ও কংগ্রেসের আন্দোলনের বিরোধী। তাছাড়া সবচেয়ে আপত্তিজনক ছিল কম্যুনিষ্টদের ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের বিরোধিতা তখন বিলিতী বর্জন তুংগে। বিলিতী কোন জিনিস লোকলজ্জায় কেউ কিনত না। কাপড় ও সিগারেটের উপর আক্রমণ ছিল সবচেয়ে বেশী। তখন সিগারেট বর্জন সিগারেট কেউ খেত না, কিন্তু জেলে কম্যুনিষ্টরা সিগারেট খেত। তারা বিলিতী কাপড়ও পরত। ওদের বক্তব্য, বর্জনের ফলে বিলেতের শ্রমিকরা বেকার হবে—অতএব এ বর্জন আন্দোলন প্রতিক্রিয়াশীল।

অদ্ভুত যুক্তি। বৃটিশ শ্রমিকরা যেমন বেকার হবে তার চেয়ে বেশী শক্তিশালী হবে বৃটিশ capitalist—ওদের কথায় মনে হত যে বৃটেনে শ্রমিক রাজত্ব কায়েম রয়েছে।

জেলে কয়েকজন কম্যুনিষ্ট ছিল আমাদের সাথে। তারমধ্যে জালামুদ্দিন বোখারী অন্যতম। বোখারী বোম্বাই-এ মানুষ। খুব সাদাসিধে মিশুক মানুষটি। তার সাথে দীর্ঘ আলোচনা হত। কেবল কতকগুলি বাঁধা বুলি জানত। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা-এর বৈশিষ্ট্য তারা কিছুই জানত না। ভারতবর্ষ যেন সোভিয়েত রাশিয়া। সোভিয়েত রাশিয়ায় Proletarian Dictatorship আছে—অতএব ভারতবর্ষের আশু লক্ষ্য হবে—Proletarian Dictatorship. ভারতবর্ষের জাতীয় বিপ্লব সম্পর্কে এদের কোন মৌলিক চিন্তাই ছিল না। এই অত্যুগ্র মনোভাবই শেষ পর্যন্ত Trade Union Congress এ ভাঙ্গন আনে। ১৯৩১ সালে Red Trade Union Congress গঠন করা তাদের বালকসুলভ চপলতার পরিচায়ক।

মার্কস্ ও এংগেল্সের লেখা পড়ে আমার মনে হয়েছে—ভারতীয় কম্যুনিষ্টরা ভ্রান্ত। ওরা ওদের বক্তব্য আহরণ করত লেনিনের লেখা থেকে। লেলিন তাঁর শাসিত রাশিয়ায় যে বিধান দিয়েছেন—সেই বিধানই ওরা প্রয়োগ করতে চেয়েছে ভারতবর্ষে। সেদিনকার রাশিয়ায় যা প্রযোজ্য—তা কেমন করে সার্থক হবে ভারতবর্ষে।

মার্কসবাদ পড়ার পরে আমরা আদর্শনীতির রূপরেখা রচনা করেছিলাম—তা ভারতবর্ষের জাতীয় বিপ্লবের পর্যায়কে ভিত্তি করে। এই রেখাচিত্রটি মনে হয় মোটামুটিভাবে নির্ভুল। যারা এর রচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন—তাদের মধ্যে ছিলেন অতীন রায়, জ্ঞান মজুমদার, অমূল্য অধিকারী, মনী লাহিড়ী ও বর্তমান লেখক। এর পরে যখন আরো ৪টি ক্যাম্প চালু হয়—তখন অনেক সহকর্মীর সমাবেশ হয়। তাদের ভিতর কয়েকজন এই খসড়া রচনা করতে অংশ গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে আমার স্নেহস্পদ সহকর্মী ত্রিদিব চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য।

দেওলীতে ৫টি ক্যাম্প জমজমাট হয় ১৯৩৪ সালের প্রথম ভাগে। আমরা Scientific Sociationকে ভিত্তি করে আমাদের আদর্শনীতি রচনা করি। যুগান্তর যে দল হিসাবে কোন নতুন ideology গ্রহণ করেনি। দুটি বড় দলের বাইরে যারা ছিলেন—তার একটি অংশ বাইরে কম্যুনিষ্ট দলের সাথে

কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এদের পুরোভাগে ছিলেন ভবানী সেন, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী, নিরঞ্জন সেন, প্রমোদ দাশগুপ্ত, প্রমথ ভৌমিক। হেমদা ও সত্যবাবু (বকসী) তাদের আগের মতে দৃঢ় ছিলেন এবং দলে ভাঙন রোধ করে। শ্রীসংঘের ভেতর গোপন গুঞ্জন দেখা দেয়। অনিল রায় সমাজবাদে বিশ্বাস করতেন—কিন্তু Historical Materialism এ তার আস্থা ছিল না। অনিলবাবু ভারতীয় ধারার ভেতর সমাজবাদ গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন।

কিছুদিন পরে পার্টির আদর্শনীতির বিরুদ্ধে পার্টি থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ পার্টি ছেড়ে যায়। যারা জেলে আসার আগে পার্টি ছেড়ে আলাদা হয়েছিল—তারাই ছেড়ে যায়। খানিকটা গোষ্ঠীমনোভাবও কাজ করেছে এ ব্যাপারে। বিভেদের বিষয় ছিল খুবই সামান্য।

তখন দেওলী জেলে একটা Communist Consolidation গঠিত হয়। এদের নেতাদের সাথে বাইরের Communist Partyর যোগ ছিল। এ গোষ্ঠীর বক্তব্য ছিল যে জেলের ভেতরে Consolidationএ সামিল না হলে বাইরে Communist পার্টির সাথে কাজ করা সম্ভব হবে না। অতএব Consolidationএ যোগ দাও। কম্যুনিষ্টরা একান্তভাবে চেয়েছে প্রত্যেকে আপন আপন পার্টি ছেড়ে দিক। সংগঠিত দলগুলি ভাঙাই ছিল তাদের প্রথম সোপান। সুসংগঠিত বিপ্লবী দল ভাঙলেই কম্যুনিষ্ট পার্টি পরীক্ষিত নিষ্ঠাবান কর্মী পাবে অনেক। এর ফলে অনুশীলন, যুগান্তর, শ্রীসংঘ, চট্টগ্রামের দল ভেঙে বহু কর্মী Consolidation এ যোগ দেন।

এ ভাঙনের মুখে আমরা আশার আলোক দেখতে পাই পণ্ডিত নেহেরু ও কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির কাছে। ভারতবর্ষ সম্পর্কে ওদের বিশ্লেষণ ছিল আমাদের মতন। পণ্ডিত নেহেরুর প্রবন্ধ Whither India আমাদের বিশ্লেষণ সমর্থন করে। উত্তরকালে আচার্য নরেন্দ্র দেও ও জয়প্রকাশ নারায়ণের মার্কসবাদ সম্পর্কে বিচারধারা যথার্থ সাহায্য করে আমাদের। পণ্ডিত নেহেরু নিজেকে তখন মার্কসিষ্ট বলে ঘোষণা করতেন—কিন্তু তিনি ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির বিচারধারার বিরোধী ছিলেন।

পার্টিতে যারা মার্কসীয় সোস্যালিজমের বিরোধী ছিল, তাদের সংখ্যা খুব অল্প নয়। দেওলীতে আমরা মোটামুটি এই সিদ্ধান্ত নিই যে—অনুশীলন সমিতির আর বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী দল হিসেবে থাকা নিষ্প্রয়োজন। এর

ঐতিহাসিক ভূমিকাও আর নেই। অতএব এ দলের সমমতাবলম্বী সম-গোত্রীয় দলের সাথে বিলীন হওয়া উচিত। তখন সারা ভারতে দুটি মার্ক্সবাদী ভাবধারার দল। একটি কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল, আর একটি কম্যুনিষ্ট পার্টি। আর তখন এ দুটি দল একসঙ্গে কাজ করার কার্যক্রম গ্রহণ করে। আমরা কম্যুনিষ্ট পার্টির জাতীয় বিপ্লবের নীতি ও কর্মধারার সাথে একমত ছিলাম না। আমাদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে কম্যুনিষ্ট জাতীয় বিপ্লবের নীতি ভ্রান্ত। আমরা কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টিতে মিলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। কম্যুনিষ্টদের সম্পর্কে আমাদের বিচারধারা পুরোপুরি সত্য ও সঠিক বলে প্রমাণিত। কম্যুনিষ্টরা স্বাধীনতা লাভের পরও জাতীয় বিপ্লবের বিরোধিতা করে এসেছে। ১৯৪২ সালে তাদের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টা সমর্থন—আগষ্ট বিপ্লবের তীব্র বিরোধিতা, নেতাজী পরিচালিত আজাদ হিন্দ বাহিনীর আন্দোলনের বিরোধ—তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

মহারাজ, প্রতুল-দা, রমেশ-দা ও রবি-দা প্রভৃতি দেওলীতে আমাদের সাথে না থাকায় ওদের সাথে বিচার বিশ্লেষণ হতে পারে নি। তাদের ভেতর খুব তাত্ত্বিক কেউ ছিলেন না। হঠাৎ এক সুযোগ দেখা দিল। অসুস্থ মাকে দেখার জন্য ৭ দিনের ছুটি পাই আমি। তখন ১৯৩৭ সালের মে মাস। বাংলায় হক্ মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে মাত্র। আমি বাড়ী থেকে ফিরে প্রেসিডেন্সি জেলে আসি। তখন ওখানে রমেশদা ছিলেন আলাদাভাবে ১০ ডিগ্রীতে। রমেশদাকে গোপনে সকল খবর জানাই। আমাদের চিন্তাধারা মার্ক্সবাদী কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টিতে যোগ দেওয়া সম্পর্কে। রমেশদা সম্পূর্ণভাবে আমাদের সমর্থন জানান, কেদারবাবু ও রমেশদা কিছুটা তাত্ত্বিক। তাদের বোঝাতে পারলে সমস্যা সহজ হয়ে আসে। রমেশদা আপন হাতে লিখে তাঁর মত জানান। আমাদের সমর্থনে একটি দলিল এল হাতে। এ পত্রটি সকল জেলে পাঠাই আমি। হাই কম্যাণ্ডের সমর্থন ছাড়া সোস্যালিজম্ গ্রহণ করা যায় না, এ যুক্তি যাদের, তারা একটু অসুবিধায় পড়ে।

কয়েকদিন পরে আমি যাই বহরমপুর জেলে। এ-তো আটক বন্দীদের জেল নয়। পুরোপুরি নাৎসী কন্‌সেণ্ট্রেসন ক্যাম্প। প্রবেশ পথে বর্বরোচিত দেহ তল্লাসী থেকেই তার আভাষ পাই। জেলে অভ্যর্থনা জানায় আমার দীর্ঘদিনের সহকর্মী রাজসাহীর তাতা চৌধুরী, ঢাকার রাখাল ঘোষ প্রভৃতি। এই ক্যাম্পে সকল জিলার তরুণ কর্মীদের সমাবেশ। পার্টির আদর্শ ও কর্ম-

নীতি সারাদিন ধরে আলোচনা হত। দুটি জেল। হাসপাতালে ২ ঘণ্টার জন্য দু'জেলের বন্দীরা মিলিত হতে পারত। আমি হাসপাতালে যেতাম রোজই। ঐ স্বল্প সময়ের মধ্যে সকলের সাথে আদর্শ নীতি নিয়ে আলোচনা করতে হত। যারা এ কাজে সাহায্য করেন, তাদের মধ্যে ঢাকার অনিল গাঙ্গুলী, অমর ব্যানার্জী, রাখাল ঘোষ, তাতা চৌধুরী ও কুমিল্লার নীহার রায়। যারা কম্যুনিষ্ট পার্টিতে সামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে—তাদেরও ডাকলাম আলোচনার জন্যে। তাদের মার্কসবাদ সম্বন্ধে জ্ঞান খুব অগভীর। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ধারার সাথেও পরিচিত নয়। যুক্তিতে হারলেও পরাজয় স্বীকারে রাজী নয়। আমার সাথে কথা বলে কিছু সাথী পার্টিতে ফিরে আসে।

দেওলী বন্দীরা এলেন—আর ক্যাম্পে ২।৩ দিন থেকে অনেকে মুক্তি পাচ্ছেন। আমাদের কাজ তখন আরও বেড়ে যায়। যারা বাইরে যাচ্ছেন তাদের বুঝিয়ে দিতে হল নতুন ধারায় কাজ করার জন্যে। আমরা যে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীয় দলের সাথে একত্র হয়ে যেতে চাই—সে কথাও জানাই সবাইকে। সমাজবাদী কর্মধারায় অনেকেরই বিশ্বাস। কিন্তু এরা অনেকেই পার্টির অস্তিত্ব লোপ করতে রাজী নয়। তাদের বক্তব্য, অনুশীলন দল সমাজতন্ত্রীদল হিসেবে কাজ করুক। এ এক বিরাট সমস্যা আমাদের কাছে। সমাজবাদী দল করব কিন্তু দেশের সমাজবাদী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় ধারার সাথে যুক্ত হব না—এ এক বিচিত্র মনোবৃত্তি। Group mind খুব সাংঘাতিক জিনিস। এ মনোভাব থেকে আমাদের নেতৃবৃন্দও মুক্ত ছিলেন না! মহারাজ মুক্ত মনের মানুষ। তাঁর সমস্যা ছিল কম। আর সকলের মনে ইতস্ততা ছিল খুবই। তখন কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি খুব জনপ্রিয়। আচার্য নরেন্দ্র দেও, জয়প্রকাশ নারায়ণ ও অচ্যুত পট্টবর্ধনকে নেহেরু Working Committeeতে নিয়েছেন। জয়প্রকাশকে নিয়ে সারা ভারত পরিভ্রমণ করছেন কংগ্রেস সভাপতি নেহেরু। জয়প্রকাশের মার্কসবাদী বিশ্লেষণ যুবজনের—বিশেষ করে বাংলার বাইরের যুবজনের চিত্ত আকর্ষণ করে।

একটি ঘটনা আমাদের খুব সাহায্য করে। ১৯৩৭ সালে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেই কংগ্রেস মন্ত্রীসভা উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে চান। কিন্তু গভর্নরের তরফ থেকে বিরাট বাধা আসে। এই দুই রাজ্যে মন্ত্রীমণ্ডল পদত্যাগ করে। ইংরেজ সরকার এর জন্য প্রস্তুত ছিল না।

শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের কথা মেনে নেয়া হয়। বন্দীরা মুক্ত হন। কাকোরী মামলায় সকলেই বেরিয়ে এসে বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন। বন্দীদের নেতা যোগেশ চ্যাটার্জী। যোগেশবাবু, দামোদর স্বরূপ শেঠ, মোহনলাল গৌতম চন্দ্রভানু গুপ্তের বন্ধু। মুক্তির পর আচার্য নরেন্দ্র দেওর সাথেও দীর্ঘ আলোচনা হয় যোগেশবাবুর। যোগেশবাবু কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলে যোগ দেন। যোগেন্দ্র স্কুলও যোগ দেন বিহারে। উত্তর ভারতের এ কাজের ফলে হাওয়া কিছুটা অনুকূলে আসে। কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টিতে যোগদান করার পথ খানিকটা সহজ হল। বাধা কেবল কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট পার্টিতে যোগ দেয়ার ব্যাপার ছিল না—আদর্শ হিসাবে সমাজবাদ গ্রহণ সম্পর্কেও বাধা ছিল প্রচুর। বহরমপুরে যারা মুক্তি পেলেন তাদের ভেতর দু'দলই ছিল। তবে সমাজবাদে বিশ্বাসীর সংখ্যা ছিল বহু।

ক্রমান্বয়ে বহরমপুর ক্যাম্প খালি হতে থাকে। ৭০০ বন্দী মুক্তি পাওয়ার পর যে ৪০০-র মত ছিলেন—তারা একের পর এক থানায় নজরবন্দী হয়। এক সময় আমার পালাও এল। আলিপুর ডুয়ার্সে ফালাকাটা নির্দ্ধারিত হল আমার স্থান।

১৯৩৮ সালের আগষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহে মুক্ত বন্দীদের শেষ তালিকাটি বের হয়। তার মধ্যে আমার নাম দেখি সংবাদপত্রে। কিন্তু সংবাদপত্রের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে আমাকে মুক্তি দেয়া চলে না। সরকারী অর্ডার এল আরো দু'দিন পরে।

ভুলের বোঝা

৩৮ সালে অবস্থার চাপে পড়ে বিপ্লবী নেতৃত্ব যে নীতি গ্রহণ করেন—সে নীতি গ্রহণ করা উচিত ছিল ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময়। এ নীতি গ্রহণ করলে হয়তো বাংলা দু'ভাগ হত না। একথা অনস্বীকার্য যে বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনে বিপ্লবীদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারা যদি কেবল বাংলার মধ্যবিত্ত যুবকদের নিয়ে সংগ্রামে নিজেদের সীমিত না রেখে জন আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তেন তাহলে বাংলার ইতিহাসের ধারা অন্য খাতে বইত। তখনকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আন্দোলন—মূলতঃ হিন্দু আন্দোলন। তখনো মুসলমানদের ভেতর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গড়ে ওঠেনি—গড়ে ওঠেনি হিন্দু অনুন্নত শ্রেণীর ভেতর শিক্ষিত সমাজ। ফলে ইচ্ছায় হোক

অনিচ্ছায় হোক মুসলমান ও অনুন্নত হিন্দুদের ভেতর কাজ হয়নি তেমনভাবে। পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের দুর্গত জনতা বিপ্লবী আন্দোলনের আওতার বাইরে রয়ে যায়। বিপ্লবীদের হাতে জিলা কংগ্রেসের কর্তৃত্ব। তাদের প্রভাবে কংগ্রেসের কাজ কেবল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সীমিত। এর ঠিক বিপরীত ছবি দেখি মেদিনীপুরে। সেখানে জন আন্দোলন হয়েছে গোড়া থেকে। তার জন্যেই গ্রামের সাধারণ কৃষকও শরিক হয়েছে জাতীয় আন্দোলনে। মুসলমান প্রধান পূর্ব ও উত্তর বাংলায় কংগ্রেস আন্দোলন হয়ে দাঁড়ায় হিন্দুদের আন্দোলন। অন্য কথায় কৃষক ও প্রজা সাধারণ রইল কংগ্রেস থেকে দূরে। কিন্তু বর্ধমান বিভাগে ঠিক এর বিপরীত। যদি পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে মেদিনীপুরের মত ব্যাপক গণআন্দোলন হত তাহলে হয়তো বর্তমান বাংলাদেশ ভারতবর্ষ থেকে ছিঁড়ে যেত না। বিপ্লবীদের এ নীতির ফলে ওই অঞ্চলে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় তা পূর্ণ করল প্রথমে কৃষক প্রজা পার্টি এবং পরে মোসলেম লীগ। এ শূন্যতার বিষয়টি কংগ্রেসের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ কখনও বোঝেননি—আর বাংলার প্রতিনিধিরাও ভাল করে বোঝাতে পারেন নি। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের ফলাফল দেখে কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ডের বাংলার রাজনীতির এ দিকটা বোঝা উচিত ছিল। সীমান্ত প্রদেশে বাদশা খানের মতন জনদরদী গান্ধিবাদী নেতা থাকার জন্যে সীমান্ত প্রদেশের রাজনীতির বৈশিষ্ট্য গান্ধীজীর গোচরে এসেছিল সার্থকভাবে। কিন্তু বাংলার বিষয়টা গান্ধীজীর নজরে আনা হয়নি অথবা আনা হলেও কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড বুঝতে পারেনি। দেশবন্ধুর সময় পর্যন্ত এ সমস্যাটি ছিল উচ্চতম কর্তৃপক্ষের সম্মুখে। তারপর সূতো ছিঁড়ে যায়। এ সূতো আবার যুক্ত করা যেত ১৯৩৭ সালে নির্বাচনের পর। যখন শরৎবাবু প্রভৃতি কৃষক প্রজা পার্টির সাথে যুক্ত সরকার গঠন করতে চেয়েছিলেন, তখন তাদের অনুমতি দিলে হয়তো অবস্থা অন্যরূপ ধারণ করত। কারণ ফজলুল হক তখনও বাংলায় মুসলমানদের অবিসংবাদী জননেতা। তাঁকে লীগের গহ্বরে ঠেলে দেওয়া হয়েছে কংগ্রেস নেতৃত্বের ভুলের জন্যে। ইতিহাসের গতি বিচিত্র। ইতিহাস বারংবার সুযোগ নিয়ে আসে না। ১৯৩৭ আর ১৯৪৬। এই নয় বছরে ফজলুল হকের নেতৃত্ব অবসান—আর লীগের অভ্যুত্থান।

ছয় ঃ ত্রিপুরীর জয় ও বিপর্যয়

১৯২৮ সালে জেল থেকে মুক্তি আর এবারের মুক্তির ভেতর তারতম্য ছিল প্রচুর। এবার আমার কাঁধে দায়িত্ব অনেক। প্রথম কাজ কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির সাথে বোঝাপড়া। আমার মুক্তির প্রায় ১ বছর আগে তরুণ সাথীরা বাইরে এসেছেন। তারা এদিকে যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালান। এদের পুরোভাগে ছিলেন ত্রিদিব চৌধুরী, সতীশ সরকার প্রভৃতি। কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি সম্পর্কে সকল রিপোর্ট পাই এদের কাছে। পার্টিতে প্রবেশ করা যতটা সহজ মনে হয়েছিল—বাস্তবের সাথে তার মিল খুবই কম। সারা ভারতের পার্টি আর বাংলার পার্টির ভেতর অনেক ব্যবধান। অন্যান্য রাজ্যে বামপন্থী কংগ্রেসীরা এ পার্টির সভ্য. কিন্তু বাংলাদেশে নয়। এখানে পার্টি গড়ে ওঠে এক বিচিত্রভাবে। ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র। ডাঃ লোহিয়া A B.S.A র সাথে যুক্ত ছিলেন। স্বতঃই ছাত্র আন্দোলনের সহকর্মীদের নিয়ে আসেন এ পার্টিতে। এদের ভেতর ছিলেন অমর রায়, অতুল বসু, সুধীন মজুমদার, অশ্বিনী দত্ত প্রভৃতি। সারা ভারতের ক্ষেত্রে কম্যুনিষ্টদের সাথে একত্রে কাজ করার নীতি এ পার্টির। কেন্দ্রীয় কমিটিতে কয়েকজন বিশিষ্ট কম্যুনিষ্ট ছিলেন! সেই সুবাদে বাংলা পার্টিতেও ছিলেন কয়েকজন কম্যুনিষ্ট। তাদের ভেতর হীরেন মুখার্জী, নৃপেন চক্রবর্ত্তী ও গোপাল হালদারের নাম উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন গোষ্ঠি এসে যোগ দেন। তার মধ্যে Labour Association এর ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জী, দেবেন সেন, দয়ারাম বেরি প্রভৃতি। এছাড়া ছিলেন ডাঃ চারু ব্যানার্জী ও শিবনাথ ব্যানার্জী।

বাংলায় কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির পার্টিগত প্রভাব খুব বেশী ছিল না। কারণ প্রায় সকলেরই ছিল গোষ্ঠিগত পেছনটান। এ যেন একটি ঢিলাঢালা Platform, সকলে আপন আপন পার্টির স্বার্থ সম্বন্ধে সজাগ। কেউ কম্যুনিষ্ট পার্টির, কেউবা অভয় আশ্রমের, কেউ বা শ্রমিক সংগঠনের। কেবল প্রাক্তন ছাত্র কর্মীরা ছিলেন নতুন পার্টির প্রগতির জন্য আগ্রহী। বিভিন্ন গোষ্ঠীর কারো সাথেই কারো মিল ছিল না। অনুশীলনের সভ্যদের পার্টিতে যোগ

দেওয়া সম্পর্কে কারো আপত্তি নেই, কিন্তু কেউ-ই আগ্রহী নন। কারণ এত বড় একটি প্রভাবশালী দল—যার সংগঠন খুবই শক্তিশালী,রাজনৈতিক প্রভাব সর্বজন স্বীকৃত, যার নেতৃত্বে রয়েছেন ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী, প্রতুল গাঙ্গুলী, রবি সেন, রমেশ আচার্য প্রভৃতির মত শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ—তারা এলে কোন গোষ্ঠির সাথে যাবেন এ নিয়ে ছিল এদের প্রশ্ন। অনুশীলন সকল কর্মী নিয়ে পার্টি'তে যোগ দিলে এরাই সংখ্যাধিক্য হবেন—অতএব বেশী সংখ্যক সভ্যদের membership দেওয়া ঠিক নয়। এই ছিল Policy. কেবল প্রাক্তন A. B S. Aর কর্মীরা আমাদের সকলকেই নিতে চাইতেন। ফলে সামান্য কয়েক-জন অনুশীলন সভ্যকে membership দেওয়া হয়। অনুশীলন পার্টি'র বিরাট সংখ্যক নেতা ও কর্মীরা বাইরে রয়ে গেল। ত্রৈলোক্য মহারাজের মতন মানুষও applicant member হয়ে ঝুলতে থাকেন—আমাদের তো কথাই ওঠে না। এর ফল ভাল হয়নি। অনুশীলন দল এক হিসেবে আলাদা রয়ে গেল—বিলীন হল না।

আমরা ছোটখাটো অপমানও গলাধঃকরণ করি। কিন্তু শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দের তো প্রেষ্টিজের প্রশ্ন আছে। বাংলার কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি'র ভুলের জন্যে অনুশীলন হিসেবেই আবার সংঘবদ্ধ হতে থাকি। পার্টি ভেঙে সবাই যেতে চাচ্ছি আমরা, কিন্তু প্রবেশ দুয়ার বন্ধ। এ এক অসহনীয় অবস্থা। বাধ্য হয়ে আমরা জয়প্রকাশ, মেহের আলি প্রভৃতির কাছে যাই। জয়প্রকাশ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ আমাদের নেয়ার জন্য খুব আগ্রহী। আমরা আমাদের আপন শক্তিতে "Socialist" নাম দিয়ে একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক বের করি। আমরা সর্বক্ষণের কর্মীরা সকলেই ৬ নং ফেডারেশন স্ট্রীটে থাকতাম। কাগজের অফিসও ওখানে। সতীশ সরকার কাগজের সম্পাদক।

এর মধ্যেই এল কংগ্রেসের নির্বাচন। প্রাদেশিক কমিটিতে অনুশীলনের সিংহ ভাগ। A. I. C. Cর নির্বাচনে অনুশীলনের প্যানেল সকলের চেয়ে বড়। C. S. P. থেকে হঠাৎ whip এল যে তাদের নির্দ্ধারিত Paneeএ আমাদের ভোট দিতে হবে। C. S. Pর সভ্য হবার সময় প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি করা হয়—কিন্তু প্রদেশ কংগ্রেসে অনুশীলন দলের প্রভাব লক্ষ্য করে whip issue করা এক বিচিত্র ব্যাপার! আমরা ঐ whip গ্রহণ করলাম না। C. S. Pর সর্বভারতীয় নেতৃত্ব বুঝলেন অনুশীলনের প্রতি অন্যায় আচরণের গভীরতা। কেন্দ্র থেকে মাসানিকে পাঠানো হয়। মিনু মাসানী এলেন ফেডারেশন

স্ট্রীটে। তিনি বাংলাদেশের C. S. Pর আজব অবস্থার কথা স্বীকার করেন। তিনি আমাদের সাপ্তাহিক কাগজ চালানো অসঙ্গত বলে জানান—কারণ পার্টির Bombay থেকে "Congress Socialist বলে একটি সাপ্তাহিক রয়েছে। তিনি আমাদের কাগজটিকে মাসিকপত্র রূপে পার্টির Ideological মুখপত্র হিসেবে চালাবার পরামর্শ দেন। আর এই কাগজের সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি হবেন আচার্য নরেন্দ্র দেও—আর বোর্ডে থাকবেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, অচ্যুত পট্টবর্ধন, মাসানি প্রভৃতি। সতীশ সরকার হলেন Editor। মাসানীর সাথে ঠিক হয়, পার্টির প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতাদের সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা হবে। আমরা যাদের যাদের নাম সুপারিশ করব—তাদের সকলের নামই গ্রহণ করা হবে। এ ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার পদ্ধতির জন্যে বাংলার C.S.Pর এক অংশের ক্রোধের সঞ্চার হয়।

বিরোধ

১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে উত্তর প্রদেশের অধিবাসী জওহরলালকে সভাপতি করেন গান্ধী। যে প্রদেশে অধিবেশন হয়—সে প্রদেশের অধিবাসীর সভাপতি হওয়া ছিল বিধি বহির্ভূত। জনচিত্তের সাথে নিবিড় যোগ মহাত্মা গান্ধীর। তিনি তার জন্যেই চাপ দিয়ে এ ব্যবস্থা করেন। জওহরলাল ঝড়ের গতিতে সারা দেশে বক্তৃতা করে বেড়ান। সাথে জয়প্রকাশ। এতে হাই কম্যাণ্ড অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। তারা নানা অভিযোগ আনেন জওহরলালের বিরুদ্ধে। জওহরলাল মার্ক্সবাদী। প্রাক্তন কম্যুনিষ্ট জয়প্রকাশ তার প্রিয় সহকর্মী। জওহরলাল চরকা কাটে না, খাদি সম্পর্কে খুব তীব্র আগ্রহ নেই ইত্যাদি। গান্ধী তখন মহীশূরে Nandy Hillsএ বিশ্রাম করছেন; সে সময় গেল অভিযোগের ফিরিস্ত নিয়ে হাই কম্যাণ্ডের প্রতিনিধি। জওহরলাল পদত্যাগ করতে চান। গান্ধী দারুণভাবে সমর্থন করেন জওহরলালকে। মাথা হেঁট করে ফিরে এল হাইকম্যাণ্ড। পরের কংগ্রেস মহারাষ্ট্রের ফয়েজপুরে। বল্লভভাই সভাপতি হতে চান—কারণ জওহরলাল অনেক ক্ষতি করেছে কয়েক মাসে। খোলাখুলিভাবে না হলেও বাম ও দক্ষিণপন্থী শক্তিবিন্যাস দানা বেঁধে ওঠে। গান্ধী সর্দার প্যাটেলকে নিরস্ত করেন। কেবল নিরস্ত করেন না—জওহরলালকে এ কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি করার পরামর্শ দেন। জওহরলাল আবার সভাপতি

হলেন। হরিপুরাতেও এই ধারা প্রবহমান।

৩৮ সালের শেষের দিক থেকেই কে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি হবে সে নিয়ে বিরাট জল্পনা কল্পনা। হরিপুরায় সভাপতি সুভাষচন্দ্র। গান্ধীজীর আশীর্বাদ ছিল তাঁর পেছনে। কিন্তু এবার? কংগ্রেসের বামপন্থী ও প্রগতিশীল অংশের ইচ্ছা যে সুভাষচন্দ্র আবার নির্বাচিত হন। চারদিক যখন আগামী সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচনের ব্যাপারে সোচ্চার, তখন হাই কম্যাণ্ড মৌলানা আজাদের নাম প্রস্তাব করেন। মৌলানা সাহেব প্রথম সারির নেতা। অত্যন্ত চতুর, পরিণত রাজনীতিবিদ। ইসলামের ধর্মগুরু। মক্কায় জন্ম। আলহাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। আরবী, ফারসী ভাষায় গভীর জ্ঞান। অত্যন্ত সুপুরুষ। চলা বলার প্রতি ছন্দে আভিজাত্যের ছাপ। খুব বর্ণাঢ্য মানুষ। হাই কম্যাণ্ডের তরফ থেকে এল তাঁর নামের সুপারিশ। এদিকে সুভাষচন্দ্রের দিকে অনুকূল হাওয়া বইতে থাকে, চতুর মৌলানা সাহেব তার নাম প্রত্যাহার করে নেন! সুভাষচন্দ্রের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে চাননি তিনি।

গান্ধীর পরাজয়

সুভাষচন্দ্র জয়লাভ করেন বিপুল ভোটাধিক্যে। সেদিন প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীটের B. P. C.C. অফিসে এ সম্পাদকের ঘরে বসে মাখনদা (মাখন সেন)। টেবিলের উপর ডেলিগেট লিষ্ট। Associated Press এর প্রখ্যাত রিপোর্টার আমার সহপাঠী নৃপেন ঘোষকে ফোন করে খবর নিচ্ছি। এক একটি ভাল খবর আসছে আর প্রবীণ সাংবাদিক মাখনদা বালকের মতন নৃত্য করছেন। সে দৃশ্য ভোলার নয়। বাংলায় ৪০০ ভোট সুভাষচন্দ্রের পক্ষে, আর ৭৯টি ভোট তাঁর বিরুদ্ধে। গোপন ভোট। অতএব আন্দাজ করতে পারলেও কে-কে আছেন ঐ ৭৯ জনের মধ্যে তা বার করা নিশ্চয় শক্ত নয়। পরে যে খবর পেয়েছি, তাতে মনে হয়—অধিকাংশ ভোট খাদি গ্রুপের। এ ভোটের জন্য বাংলার জনচিত্ত কিভাবে উদ্বেগ হয়েছিল, তা বোঝা যায় পরের দিনের ঘটনায়। পরের দিন বিকালে ৭৯টি গাধার এক অদ্ভুত শোভাযাত্রা এল উত্তর কলকাতার দিক থেকে। কাদের লক্ষ্য করে এ শোভাযাত্রা, তা সহজে অনুমেয়!

এ নির্বাচন উপলক্ষ্যে কংগ্রেসের উচ্চতম কর্তৃপক্ষের মধ্যে যে কলহ শুরু

হয়, তা কেবল দুঃখের নয়, লজ্জারও। সবচেয়ে বেদনাদায়ক হল—গান্ধীজীর প্রতিক্রিয়া। গান্ধী ভারতবর্ষের অবিসংবাদী নেতা। অত্যন্ত সংযত একজন পরিপূর্ণ মানুষ! তার সূক্ষ্ম রুচিবোধ ও পরিশীলিত মনের তুলনা নেই। তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন "It is my defeat"। যারা সীতারামাইয়ার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন তার ভেতর অধিকাংশ প্রতিনিধি মোটেই গান্ধী-বিরোধী নয়। তাঁর আর একটি উক্তি খুবই মারাত্মক—"After all Subhas is not an enemy of the country"—এ কথায় বোঝা যায় তার বিরক্তি ও পরাজয়বোধ কি তীব্র ও গভীর!

গান্ধীজীর একান্ত মহলের খবর আমি কিছুটা শুনেছি। তিনি এ সম্পর্কে কারও কাছেই তার অনুমান প্রকাশ করেন নি। তার কাছের মানুষেরা তাকে এ সংবাদে খুব বিচলিত দেখেছেন। তাদের ধারণা যে এটা তার রাজনৈতিক জীবনে প্রথম পরাজয়। তার ধারণা তার সহকর্মীরা তার নির্দেশানুযায়ী চলবে। সহকর্মীরা তার সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হতেন—কিন্তু শেষ পর্যন্ত গান্ধীর সিদ্ধান্ত মেনেও নিতেন। বল্লভভাই, রাজেন্দ্রবাবু, শঙ্কর রাও দেও প্রভৃতি তাঁর অন্ধ ভক্ত। কিন্তু জওহরলাল নন। পণ্ডিতজী তার বিরোধী মনোভাব গান্ধীজীর গোচরে রাখতেন এবং দীর্ঘ বিতর্কের পর একটি সিদ্ধান্তে আসতেন। অথবা একে অন্যকে বোঝাতেন। এর জন্যই উভয়ের সম্পর্ক ছিল খুবই মধুর। কতকটা পিতাপুত্রের মতন। সুভাষচন্দ্রও জওহরলালের মতন আচরণ করুক—এই চেয়েছিলেন গান্ধীজী। কিন্তু প্রচণ্ড ধাক্কা খেল তার এতদিনের ধারণা বা পরিকল্পনা। তাতে অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েন তিনি এবং কিছুটা ভারসাম্য হারান। গোড়ার দিকে বল্লভ ভাইরা তাকে ভুল বুঝিয়েছেন যে প্রতিনিধিদের ভেতর তাদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে, এবং এর জন্যই প্রতিক্রিয়া এতটা তীব্র।

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামার আগে সুভাষচন্দ্র তার একান্ত সহকর্মীদের সভা ডাকেন। গভীর রাত্রে তাঁর বাড়ীতে সভায় তিনি উপস্থিত বাংলার কর্মীদের মতামত জানতে চান। তিনি আভাষে জানান যে গান্ধীজী তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা পছন্দ করেন না। প্রারম্ভিক বক্তৃতায় একটি কথা স্পষ্ট করেন যে তাঁর আবার দাঁড়ানোর উদ্দেশ্য রাজনৈতিক। তিনি একবছর সভাপতি থাকাকালীন বুঝতে পেরেছেন, গোপনে গোপনে বল্লভভাইদের সাথে ইংরেজ শাসকদের একটি মীমাংসার চেষ্টা চলছে এবং তা হচ্ছে কংগ্রেস সভাপতির অগোচরে।

Provincial Autonomy কার্যকরী করার চেষ্টা প্রথম ধাপ এবং দ্বিতীয় ধাপ Federation গ্রহণ করা। ভুলাভাই দেশাই-এর মাধ্যমে এ সম্পর্কে আলাপ আলোচনা শুরু হয়েছে তার সভাপতি হওয়ার আগে থেকেই—অর্থাৎ পণ্ডিত নেহেরুর কার্যকালেই। সুভাষচন্দ্র সেই আপোষ মনোভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চান। তাকে সভাপতি করতে অস্বীকার করার তাৎপর্য হচ্ছে, বশংবদ সভাপতির সম্মতিক্রমে আপোষের পথ রচনা করা। আর একটি বিষয়ে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন—তা হল মহাযুদ্ধ। তার ধারণা ৮।১০ মাসের ভেতর বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবে, আর সেই সুযোগেই ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার শেষ লড়াই লড়তে হবে। তার বক্তব্য বিশ্লেষণাত্মক ছিল না—ছিল conviction। Statesman কাগজে তখন Rome-Berlin-Tokyo axis এর কথা প্রচার করতে থাকে এবং প্রকারান্তরে জানায় যে সুভাষচন্দ্রের সাথে এদের যোগাযোগ। সুভাষচন্দ্র ইয়োরোপে থাকাকালীন জার্মানীর সামরিক প্রস্তুতি সম্পর্কে অনেকটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন।

তার বক্তব্য শুনে সবার মত হল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাই প্রয়োজন। আমাদের তরফ থেকে মুখপাত্র ছিলেন—আনন্দবাজারের সুরেশ মজুমদার। তখন সুরেশবাবু বাংলা কংগ্রেসের কেন্দ্রবিন্দুর মতন। ১৯২৩-৩০ সালে সুরেশবাবু এবং অনুশীলন দল ছিল সেনগুপ্তের সাথে; আর কিরণশঙ্কর রায়, নলিনী সরকার ও যুগান্তর দল ছিল সুভাষচন্দ্রের সাথে। ৩২ থেকে ৩৬ সালের ভেতর এমন কতগুলি ঘটনা ঘটেছিল যাতে বাংলার রাজনীতিতে শক্তি বিন্যাসের বিরাট রদবদল হয়। সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র বসুর কারাবাস কালে এমন কিছু ঘটেছিল যার ফলে শরৎবাবু নলিনী সরকার প্রভৃতির থেকে আলাদা হতে বাধ্য হন। সেনগুপ্তের মৃত্যুর পর সুরেশবাবু শরৎবাবুকে বিনা শর্তে সমর্থন জানান। তখন থেকেই শরৎবাবুও সুরেশবাবুর উপর খুব নির্ভর করতে থাকেন। সুরেশবাবু ২৯-৩০ সালে ছিলেন সুভাষ বিরোধী। কিন্তু ৩২-৩৩ সালের পর বসু পরিবারের সঙ্গে নলিনী সবকার ও সুরেশ ঘোষের দলের সঙ্গে মতান্তর হয়। তখন হ'তেই সুরেশবাবুর সঙ্গে শরৎবাবুর মধুর সম্পর্ক।

সুরেশ মজুমদার

১৯৩৮ সালে আগষ্ট মাসে শেষ যখন মুক্তি পাই তার পর ৫নং চিন্তামনি দাস লেনে গৌরাঙ্গ প্রেসের উপরের তলার হলঘরে সেনগুপ্ত গোষ্ঠির একটি সভা

হয়। তাতে সুরেশবাবু সকল পরিবর্তন ও development জানান আমাদের। তার স্বভাবসুলভ রসিকতার ভেতর দিয়ে তার কাজ ও কর্মকৌশল সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য শুনতে চান। সকলেই তার কাজের সমর্থন করেন এবং শরৎবাবু ও সুভাষবাবুকে সমর্থন জানান। প্রসঙ্গত তিনি কংগ্রেস ন্যাসন্যালিষ্ট পার্টি রচনা হওয়ার ইতিহাস এবং সরকারী কংগ্রেসকে সব কয়টি সীটে হারাবার ইতিহাসও জানান।

এখানে সুরেশবাবু সম্পর্কে কিছু বলার লোভ সম্বরণ করা শক্ত। তাঁর মত চতুর ও বুদ্ধিমান মানুষ কম দেখেছি! তাঁর উদারতার তুলনা নেই। নিরহংকার, সাধাসিধা আপনভোলা। এতবড় দুটি সংবাদপত্রের মালিক—কলকাতার রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতা সুরেশচন্দ্র। কলকাতা কর্পোরেশনের কংগ্রেস partyকে পেছন থেকে পরিচালনা করার দায়িত্ব ছিল তাঁর। কর্পোরেশনের মেয়র পদের প্রার্থী মনোনয়ন করায় তাঁর হাত ছিল প্রচণ্ড! কিন্তু তিনি নিজে কখনই মেয়র হতে চাননি। অথচ ইচ্ছা করলেই এ পদ তিনি পেতে পারতেন। তিনি পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীও হতে পারতেন। রাজ্যসভার সভ্য ছিলেন কিছুদিনের জন্য, এ বিষয়েও তাঁর আগ্রহ ছিল না একেবারেই। একটি বিষয়কেই সহজে বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা ছিল অদ্ভুত। B. P. C. C-র কার্যকরী সমিতির সভা। বিরোধিতা চালাচ্ছেন কিরণশঙ্কর রায়ের মত ধুরন্ধর মানুষ। আমাদের spokesman সুরেশবাবু তখনও আসেন নি সভায়। দেরীতে এসে একবার শুনে নিলেন বিষয়বস্তুটি। তার পর তাকে যুক্তিতে পরাজিত করা ছিল খুবই শক্ত। তাঁর সবচেয়ে বড় মূলধন ছিল তাঁর পরোপকার। বহু কংগ্রেস কর্মী নানাভাবে তার কাছে ছিল অনুগৃহীত। তার ভেতর B. P. C. C.র কার্যকরী সমিতির সভ্যও ছিলেন। তারা বিরোধী পক্ষের হলেও সুরেশবাবুর ব্যক্তিত্বের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হত। তিনি কংগ্রেস বা Conferenceএ যেতেন তৃতীয় শ্রেণীতে। সাথে উত্তর কলকাতার সকল কর্মচারী। খোল করতাল নিয়ে। গান বাজনা হত অবাধে। অথচ পাশে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যেতেন তাঁরই কর্মচারী সত্যেন মজুমদার।

প্রেসের কাজে অসাধারণ দক্ষতা! তিনি বলতেন—"নরেনবাবু একটি ট্রেড্‌ল মেসিনে বিয়ের উপহার ছাপাতাম।" আজ গৌরাঙ্গ প্রেস কত বড়। এখানেও তিনি রোজ একবার এসে একঘণ্টা কাটাতেন। ঐ একঘণ্টার

ভেতর সকল কাগজপত্র নিপুনভাবে দেখতেন। কর্মচারীরা বলত, কাগজ দেখে কোথায় ত্রুটি রয়েছে তা আবিষ্কার করতে মোটেই সময় নিতেন না সুরেশবাবু।

সুভাষচন্দ্রের বিপর্যয়ের সাথে শুরু হয় এক নূতন অধ্যায়। অতীতের ধারার সাথে এ যেন একটি ছেদরেখা। নতুন সভাপতি নির্বাচনের কয়েক মাস পরে খোলা অধিবেশন। কি হবে কারও জানা নেই। গান্ধীর বক্তব্যের পর পুরানো working committeeর ১২ জন সভ্যের যৌথ পদত্যাগ। কেবল পণ্ডিত নেহেরু আর শরৎ বোস পদত্যাগ করেননি। ত্রিপুরীতে খোলা অধিবেশন। তার আগে working committeeর বৈঠক হবে। কিন্তু working committee কোথায়? নতুন committee হবে তো অধিবেশনের পর। এই সংঘবদ্ধ পদত্যাগ এক টুকরো লাল মেঘের মতন জানিয়ে দিল ভবিষ্যতের গতিছন্দ। শুরু হল দক্ষিণপন্থীদের যুদ্ধ ঘোষণা। তাদের অভিযোগ, কংগ্রেস সভাপতি কটাক্ষপাত (aspersion) করেছেন তাদের সততার বিরুদ্ধে। একথা ঠিক যে সুভাষচন্দ্রের দু'একটি বক্তব্যের ভেতর কিছুটা অভিযোগের সুর ছিল। কিন্তু তাও মীমাংসাযোগ্য। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে বিদায়ী সভাপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও নির্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত নেহরুর মধ্যে সভামঞ্চে, প্রেসের সম্মুখে অবাঞ্ছিত কলহ সকলের জানা। তা সত্বেও তারা তো একসাথে কাজ করতে অস্বীকার করেন নি।

সৃষ্টি হল এক অচল অবস্থা। অন্যদিকে বামপন্থীদের ভেতর অসম্ভব উল্লাস। নানারকম জল্পনা কল্পনা। Working Committee কেমন হবে—নতুন কর্মধারাই বা কী এ সম্বন্ধে অন্তহীন জল্পনা। তখনও আন্দাজ করতে পারেনি অপর পক্ষের কর্মকৌশল। ৩৯ সালের ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে কলকাতায় সুভাষ সমর্থকদের সর্বভারতীয় বৈঠক ডাকা হয়। ১নং উডবার্ণ পার্কের ছোট বাড়ীটির ছাদে সম্মেলন। সম্মেলনের আগে C. S. Pর নেতৃবৃন্দের ঘরোয়া বৈঠক হয় তুলসী গোস্বামীর বাড়ীতে। সেখানে ব্যারিষ্টার পুরুষোত্তম ত্রিকমদাসের বাসস্থান ঠিক হয়। তার জন্যই ওখানে সভাস্থল। আমরা অনুশীলনের কর্মীরাও নিমন্ত্রণ পেয়েছি সভায় উপস্থিত থাকার জন্য। প্রতুল গাঙ্গুলী, রবি সেন, জ্ঞান মজুমদার প্রভৃতি উপস্থিত হন। সভায় জয়প্রকাশ একাই বক্তৃতা করেন। তিনি C S Pর দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্লেষণ করে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

বিকেলের সভায় সভাপতি M. S. Aney তার স্বভাবসুলভ ভাষায় বক্তব্য রাখেন। এ সম্মেলনের প্রকৃতি কি সে প্রশ্ন তোলেন শ্রীএ্যানে। তিনি জানান—"I am not a rightist, nor a leftist, but an up-rightist" সভাপতির বক্তৃতার পর ডাক পড়ে জয়প্রকাশের। সকলের দৃষ্টি জয়প্রকাশের দিকে। তার মতের গুরুত্ব সবাই জানেন। জয়প্রকাশ বলেন—"সুভাষবাবুর জয়—তাঁর ব্যক্তিগত জয়। ডঃ সীতারামাইয়ার চেয়ে সুভাষবাবু ব্যক্তিত্বশালী জনপ্রিয় মানুষ। তার জন্যে তিনি বেশী ভোট পেয়েছেন। বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রীসভার কাজে অসন্তুষ্ট দক্ষিণপন্থীরাও সুভাষবাবুকে ভোট দিয়েছেন, অতএব সুভাষবাবুর বিজয়কে স্রেফ বামপন্থীদের জয় বলে আখ্যা দেয়া ঠিক নয়। কংগ্রেস একমাত্র সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রতিষ্ঠান। সেখানে ভাঙন সৃষ্টি করা ভুল হবে।

জয়প্রকাশ নারায়ণের বক্তৃতার পর বামপন্থীদের শুরু হয় নতুন চিন্তাধারা। প্রশ্নটি ছিল পরিষ্কার। বিকল্প নেতৃত্ব (alternative leaderehip) না মিশ্র (composite) নেতৃত্ব। এ সূত্র ধরে শুরু হয় আলোচনা। অনেকেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সুভাষচন্দ্রের সমর্থকদের মধ্যে অধ্যাপক রংগাস্বামী সহজানন্দ, লালা শঙ্করলাল, সর্দার শার্দুল সিং প্রভৃতি। কম্যুনিষ্ট পার্টির তরফ থেকে বক্তব্য রাখেন ভরদ্বাজ। জয়প্রকাশের বক্তব্যের পর সম্মেলন কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নেয়নি। সারা দেশব্যাপী প্রশ্ন, alternative বা composite নেতৃত্ব ?

গান্ধী নীতি

গান্ধীজীর ভবিষ্যৎ রাজনীতি সম্পর্কে পরিকল্পনা অনুমান করা শক্ত ছিল না। এর প্রথম প্রকাশ পায় অমৃতসর কংগ্রেসে। সেখানেও তিনি খোলাখুলিভাবে তাঁর বক্তব্য ও কর্মধারা রাখেন উপস্থিত নেতৃবৃন্দের কাছে। তিনি জানান যে জালিনওয়ালাবাগের হত্যালীলার প্রতিকার বা ব্যাপক ক্ষেত্রে স্বরাজ লাভের আন্দোলন চালাতে হবে নতুন ধারায়। এতদিন যে ধারা অনুসরণ করা হয়েছে—তা অচল। এ কথা বলে তিনি অহিংস গণসংগ্রামের কর্মনীতি বিশ্লেষণ করেন। কিভাবে জনমন কাজ করে, কেমন করে জনমানসিকতা সংঘবদ্ধ করতে হয়, আবার সেই সংহত জনমনকে একটি বিশেষ লক্ষ্যে ধাপে ধাপে পরিচালিত করতে হয়—তার একটি নিখুঁত ছবি রেখেছেন

তিনি। কিছুটা আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেন যে—এতদিন যারা দেশকে পরিচালনা করেছেন—তারা নতুন কিছু করতে অপারগ।

গান্ধী নীতিতে সংগ্রাম যেমন অপরিহার্য, আপোষ করাও তেমনি একটি অংশ। গান্ধী এ কথা কখনও লুকোন নি। তাঁর বক্তব্য কোষমুক্ত তলোয়ারের মতন। সংগ্রাম ও আপোষ—এ হল তার নীতি। এ নীতিতে জওহরলালও আস্থাবান। কিন্তু সুভাষচন্দ্র আপোষ বিরোধী। গান্ধী পূর্ণ স্বরাজের সঙ্কল্পবাক্য গ্রহণ করার পরও আরউইনের সাথে চুক্তি করতে পেছপা হননি। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন তিনি। কোন মানুষই গোল টেবিল বৈঠকের মাধ্যমে পূর্ণ স্বাধীনতার কল্পনা করত না। গান্ধীজীও নিশ্চয় করতেন না। কিন্তু মীমাংসার জন্য কোন পথই পরিহার করেননি। আবার সংগ্রাম করেছেন ১৯৩২ সালে। এ তীর্যক গতিচ্ছন্দ গান্ধীজীর মূল কথা। সুভাষচন্দ্র এ ধরণের নীতিতে বিশ্বাস করতেন না। তার বক্তব্য "All or nothing" কোন মধ্যপন্থা নেই। প্রকৃতিগত পার্থক্যই দুজনের মধ্যে সেতুবন্ধন করতে পারেনি। উভয়ে উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু ব্যাপক কর্মক্ষেত্রে একমত হননি। বৈপ্লবিক বা সংস্কারপন্থী সংজ্ঞা দিয়ে উভয়ের সবকিছু বিচার সম্ভব নয়।

যে বিষয়ে গান্ধীর সমতুল্য কেউ ছিল না—তা হল সমাজ সংস্কার। ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ কেমন হবে, কি ধারায় অগ্রসর হবে, তার প্রতিটি অঙ্গ কেমন হবে এবং সবার উপর তার সামগ্রিক ছবিটি কেমন হবে এ সম্বন্ধে পৃথিবীর কোন মনীষীর সাথে মহাত্মা গান্ধীর তুলনা হয় না। এদের অনেকেই বিপ্লবী দার্শনিক এবং চিন্তানায়ক—কিন্তু সে দিগ্‌দর্শনকে রূপায়িত করার জন্য তাদের অবদান খুবই কম। তারা নিছক চিন্তানায়ক। কিন্তু গান্ধী কেবল চিন্তানায়ক নন, কর্মতপস্বী। তাঁর কর্মযজ্ঞই মূল কথা।

প্রাদেশিক সম্মেলন

নির্বাচনের পরেই জলপাইগুড়িতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন। সম্মেলনের সভাপতি শরৎচন্দ্র বসু। প্রাদেশিক সম্মেলন বাংলায় চিরদিনই খুব জনপ্রিয়। কতকটা বাৎসরিক উৎসবের মতন। প্রদেশের সক্রিয় কংগ্রেস কর্মীরা একত্রে থাকবেন তিন দিন। একত্র থাকা খাওয়া—বিষয় নির্বাচনী সমিতির বৈঠক

ও খোলা অধিবেশন খুব জমজমাট হত। প্রাদেশিক সম্মেলনের সিদ্ধান্তের কোন সাংবিধানিক গুরুত্ব ছিল না।

সম্মেলনের উপস্থিতিতে আগামী দিনের ইশারা পাই। ঝড়ের আগে কালো মেঘের মর্তন। তখন থেকে left ও right এ দুটি সংজ্ঞার চালু হয়। তথাকথিত দক্ষিণপন্থীরা প্রায় সকলেই অনুপস্থিত। খাদি গ্রুপের নলিনী সরকারের সমর্থক, যুগান্তর দল অনুপস্থিত বললে অত্যুক্তি হয় না। মনে হয় উপরের নির্দেশেই এমনি হল। সভাপতি নির্বাচনের সময় খাদি গ্রুপ ভোট দেয়নি। যুগান্তর দল দিয়েছিল বলে আমার ধারণা, কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তাদের আচরণে পরিবর্তন সন্দেহের অবকাশ রাখে।

সুভাষচন্দ্র শারীরিক অসুস্থতার জন্য উপস্থিত হতে পারেননি। সম্মেলনের সভাপতি শরৎ বসুর বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাতে বলা হয় যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ছয় মাসের ultimatum দেওয়া উচিত। নির্দ্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলে গণ আন্দোলন শুরু হবে। বক্তব্য শুনে মনে হল শরৎচন্দ্রের অভিভাষনে সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠস্বর। সম্মেলন হল কতকটা একতরফা। তখন সুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। কারোরই কিছু বলার ছিল না। গান্ধীজীর Statement ও working committeeর সভ্যদের পদত্যাগ প্রচণ্ড বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল সাধারণ কর্মীদের মনে। সকলের মনই উচ্চতম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। আগামী ৬ মাসের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার ইশারা, আর যুদ্ধ শুরু হলেই স্বাধীনতা সংগ্রামের সুবর্ণ সুযোগ। এই দৃপ্ত ও জঙ্গী মানসিকতার ভেতর সমাপ্তি হয় সম্মেলনের।

এই সম্মেলনের সময় সারা বাংলায় অনুশীলন দলের কর্মীদের বৈঠক হয়। নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রতুলদা, রমেশদা উপস্থিত ছিলেন। নতুন কর্মসূচী নতুন আদর্শ ও C. S. Pর সাথে সম্পর্ক সব কিছুই পরিস্কার করা হয়। সমাজবাদ গ্রহণ সম্পর্কে সকল বাধা দূর হল এই সম্মেলনে। কারণ, জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর আর এত সংখ্যায় কখনও মিলিত হওয়ার সুযোগ হয়নি। এর আগে কয়েকজন প্রথম সারির নেতা বসে সিদ্ধান্ত নিতেন। সেই সিদ্ধান্ত বিভিন্ন ইউনিটকে দিয়ে কার্যান্বিত করা হত। কতকটা oligarchyর মত। কোন সংবিধান ছিল না বিপ্লবী দলের। সবকিছুই informal। জলপাইগুড়িতে যে সব কিছু গণতান্ত্রিকভাবে হয়েছিল—তা নয়। তবে অনেক বড় ক্ষেত্রে আলোচনা। কর্মীদের এ এক নতুন অভিজ্ঞতা।

কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট পার্টিতে যোগদান

এর পর থেকে সকলের চোখ ত্রিপুরীর দিকে! সবার মনে আশা ও আশঙ্কা। কেউ কেউ Working Committeeর সভ্য হবার জন্য ব্যাকুল। তার জন্য চেষ্টাও কম হয়নি। প্রায় রোজই বিকেলে Advance অফিসে যেতাম। তখন সত্যরঞ্জন বক্সী সম্পাদক। তাঁর সাথে বসে জল্পনা কল্পনা করতাম। আমরা সুভাষচন্দ্রের own regiment।

সত্যবাবুর বাড়ীতে আমাদের সভায় সাধারণতঃ সুভাষচন্দ্র আসতেন না। এ সভায় আসতেন সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী বাগচী, তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেনদা (দেব) সুরেশ বাবু, কিশোরী চাটার্জী (খুলনা), ছত্রপতি রায় (বহরমপুর) হাওড়ার হরেন ঘোষ, কৃষ্ণ চ্যাটার্জী, জীতেন মিত্র আশ্রাবুদ্দিন চৌধুরী, বসন্ত দাস, প্রতুল গাঙ্গুলী, ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী, রবি সেন, পূর্ণ দাস, ফণি মজুমদার, অতুল কুমার, সত্যগুপ্ত এবং আরো অনেকে। আর কলকাতায় উপস্থিত থাকলে অনিল রায়, লীলাদি ও মনীন্দ্রচন্দ্র রায়। উপস্থিত হতেন জ্যোতিষ জোয়ারদার, কামিনী দত্ত। এ সভায় বরদা পাইন, সন্তোষ বসু, তুলসী গোস্বামী প্রভৃতি আসতেন। আর এদের দায়িত্ব ছিল শরৎবাবুর উপর। সুভাষচন্দ্র রসিকতা করে বলতেন—"ওরা মেজদার সভাসদ"।

এদিকে কংগ্রেসের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ কোমর বেঁধে লেগেছে তাদের ব্যূহ শক্ত করার জন্য। আটটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীরা সব রাজকাজ ফেলে সুভাষবাবুকে হারাবার জন্য সচেষ্ট। আমাদের তরফ থেকে চেষ্টা করার লোক কম ও প্রলোভনও কম। তবু কিছু কিছু চেষ্টা হয়নি—এমন নয়। ত্রৈলোক্য মহারাজ গেলেন পাঞ্জাবে ও মহারাষ্ট্রে। পাঞ্জাবের বহু কর্মী মহারাজের সাথে আন্দামানে বন্দী ছিলেন। এদের ভেতর কীর্তি পার্টির মানুষ অনেক। মহারাজ গেলেন তাঁর পুরানো বন্ধু রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা হেদাধিকারের কাছে। যোগেশ চ্যাটার্জীকে দিয়ে উত্তর ভারতে কিছু চেষ্টা হয়। কিন্তু এদের হাতেও Power নেই। খুব বেশী কিছু লাভ হয়নি। সরকারী চাপের ফলে আমাদের দিকের সমর্থনের ঘাটতি হতে শুরু করে। Congress High Command এর হাতে কেবল প্রাদেশিক শাসন ছিল না—তাদের হাতে ছিল বিত্তশালী শ্রেণীও। বড় বড় দেশী ব্যাঙ্ক, বিড়লা, টাটা, বোম্বাই ও আহমেদাবাদের ধনিক গোষ্ঠি সবাই ত বল্লভভাইদের সাথে। পরোক্ষে ইংরেজ ধনিক গোষ্ঠিও ছিল ওদের সাথে। তখনকার কংগ্রেসের

প্যাটেল গোষ্ঠি কতখানি শক্তিশালী ও কতখানি নীতিভ্রষ্ট তা পণ্ডিত নেহরুর পত্রাবলী থেকে অনুমান করা যায়। পণ্ডিত নেহেরু ক্রুদ্ধ হয়ে লিখেছেন—"The Congress from top to bottom is a caucus and opportunism triumphs"।

* * *

বাংলাদেশে ও এই Caucus এবং Opportunism এর আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বাংলার এ যুগ অন্ধকারাচ্ছন্ন। [এখানে দ্বিতীয় সত্যাগ্রহ আন্দোলন ততটা শক্তিশালী ছিল না। তার অন্যতম কারণ সন্ত্রাস। বিপ্লবী আন্দোলনেও তখন ভাটা। তা সত্বেও এণ্ডারসনী রাজত্বে শুরু হয় এক ধরণের সন্ত্রাসের রাজত্ব (reign of terror) কতকটা আধা মিলিটারী শাসন। পরিচয় পত্র (Identity Card) কার্ফু প্রভৃতি সমাজে চালু ছিল। সর্বত্রই এক প্রকার ভয়জনিত হতাশা। ছাত্ররাও ভীত। তাদের Union Jack অভিবাদন করতে বাধ্য করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। সে ছিল এক নিদারুন ব্যবস্থা।] Congress সংগঠন ঐ Caucus এর মুঠোয়। বাংলা প্রাদেশিক Committee পুনর্গঠিত হয়। এ সকল পুনর্গঠনের পিছনেও ছিল একটি Caucus। এ দুঃসময়ে পণ্ডিত নেহেরু আসেন দুর্গত বাংলার পাশে দাঁড়াবার জন্য। তিনি এসে কংগ্রেস সংগঠনের কোন ভাল ব্যবস্থা করতে পারেন নি। ভাবাবেগপূর্ণ মানুষ তিনি। আলবার্ট হলে ভাষণ দেবার জন্য হল ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। এ সময়কার বাংলা কংগ্রেসের প্রতি তার মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তার একটি উক্তিতে—"The Bengal Congress is the Society for the advancement of Nalini Ranjan Sarkar. নলিনী সরকারের কংগ্রেসের প্রতি কোন অনুগত্য ছিল কি না সন্দেহ। তার হাতে অর্থ ছিল প্রচুর এবং এ সময় বাংলা কংগ্রেসকে প্রভাবে রেখেছিলেন তিনি। শরৎবাবু ও সুভাষচন্দ্র কারাগারে। রাজত্ব ছিল ঐ Caucus এর হাতে। তখনকার বাংলার সংবাদপত্রগুলির অবনমনের কথা ভেবে লজ্জায় মাথা হেঁটে হয়। সেদিন সুরেশ মজুমদার ও মাখন সেনের পরিচালনায় আনন্দবাজার পত্রিকা যে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছে তার তুলনা নেই। এ সকল কারণেই সত্যিকার কংগ্রেস কর্মীদের "Congress Nationalist Party" গঠন করে কেন্দ্রীয় বিধান সভায় নির্বাচনে সরকারী কংগ্রেসের বিরোধিতা করতে হয়। এ নির্বাচনে সরকারী

কংগ্রেসের দারুণ পরাজয় সর্বজনবিদিত। সুভাষচন্দ্র মুক্তি পাওয়ার পর প্রাদেশিক কংগ্রেসে আবার সংগ্রামী কংগ্রেস কর্মীদের স্থান হয়। কংগ্রেস ন্যাশানালিষ্ট পার্টি প্রাদেশিক কংগ্রেসে সামিল হল। কিন্তু নলিনী সরকার ও আরো কিছু মানুষ দূরে সরে থাকেন।

১৯৩৮ সালে বিপ্লবীরা মুক্তি পাওয়ার পর শরৎবাবু, সুরেশ মজুমদার পরিচালিত সংগ্রামী কংগ্রেসীদের শক্তি বেড়ে যায়। সকলেই আশা করেছিলেন যে গোষ্ঠি নির্বিশেষে সকলেই সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করবেন। আর তাহলে বাংলায় যে সংগ্রামী ঐক্য গড়ে উঠবে তা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে কাঁপিয়ে দিতে সক্ষম। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা হল না। অনুশীলন দল এল। যুগান্তর দলের অধিকাংশ কর্মী তখন কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছে এবং একাংশ নিষ্ক্রিয়। পার্টির উপর দিকে কয়েকজন নেতা ছাড়া পুরানো দলের চিহ্নমাত্র ছিল না। পূর্ণ দাস ও সতীন সেন সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করেন। সত্যরঞ্জন বক্সী ও বেঙ্গল ভলান্টিয়র দল চিরদিনই সুভাষচন্দ্রের একান্ত সহযোগী। শ্রীসংঘও সুভাষচন্দ্রের সাথে ছিল। যুগান্তর দলের কয়েকজন নামজাদা নেতা কোন অজ্ঞাত কারণে নলিনী সরকারকে আঁকড়ে রইলেন। পণ্ডিত নেহরু বর্ণিত Caucus এর বাংলার শাখা নলিনী সরকারকে ঘিরে। এ সমর্থনে বলিয়ান হয়েই নলিনী সরকার যুদ্ধের সময়ও বড়লাটের Executive Council এর সভ্য হন। আবার এই ধারা বেয়েই তিনি স্বাধীন ভারতে পশ্চিম বাংলায় অর্থমন্ত্রীও হন। এ এক বিচিত্র ঘটনা। এই Caucus আশ্রয় করেই বল্লভভাই গোষ্ঠি বাংলায় প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। সম্মেলনের অব্যবহিত পূর্বে সুভাষচন্দ্র অসুস্থ হন। এমনি শারীরিক অসুস্থতা নিয়েই সুভাষচন্দ্র ত্রিপুরী রওনা হন।

এ সময় বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতন এল গান্ধীজীর সিদ্ধান্ত। তিনি কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ না দিয়ে রাজকোটে গেলেন সত্যাগ্রহ করার জন্য। ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে এ এক বিরাট আঘাত। গান্ধী এ পর্যন্ত কোন কংগ্রেস অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকেন নি। রাজকোটে দরবার—বিরাওয়ালার সাথে লড়াই করুন তিনি—তাতে কোন মানুষের আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু সে সংগ্রাম তো ত্রিপুরীর পরও হতে পারত। কংগ্রেসে যখন অনৈক্যের আগুন জ্বলছে—যখন গান্ধীজীর উপস্থিতি সবচেয়ে প্রয়োজন—তখন তিনি অনুপস্থিত। কেবল অনুপস্থিত নন, অনশনের সিদ্ধান্ত

নিয়েছেন তিনি। এ অনশন ত তিনি বল্লভভাই ও সুভাষচন্দ্রের তথা দক্ষিণ ও বামপন্থীর ভেতর ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্যও করতে পারতেন। তা না করে সারা ভারতের এত বড় বিপদের সময় ক্ষুদ্র রাজকোটে ক্ষুদ্রতর অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য গেলেন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপিতা। অতএব ত্রিপুরীতে কি হবে তা আর বুঝতে অসুবিধা হয়নি।

পন্থ প্রস্তাব

আমাদের যথাসাধ্য শক্তি সংগ্রহ করে বাংলা থেকে বোম্বাই মেলে যাই জব্বলপুরের নিকট ত্রিপুরীতে। শুরু হল লড়াই। এল পন্থ প্রস্তাব। এ প্রস্তাবে ফেডারেশনের বিরুদ্ধে লড়াই এর কথা—কার্যক্রমের কথা বা ঘনায়মান আন্তর্জতিক পরিস্থিতির কথা ছিল না। কথা শুধু কেমন করে ওয়ারকিং কমিটি রচিত হবে। গান্ধীজীর পরামর্শ অনুযায়ী এ কমিটি গঠিত হবে এই হল সার কথা। এর আগের কমিটিও তো গান্ধীজীর পরামর্শ অনুযায়ীই হয়েছে, তবে এ অবান্তর প্রশ্ন কেন? বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন শরৎচন্দ্র বসু, লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র প্রভৃতি। কংগ্রেসের মূল অধিবেশনে আসার পূর্বে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির কয়েকজন প্রথম সারির নেতা ঠিক করেন যে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি প্রস্তাবে neutral থাকবে। আমাদের মাথায় বাজ পড়ল। অনুশীলন দল তখনও সরকারীভাবে কংগ্রেসের আর সোস্যালিষ্ট পার্টিতে বিলীন হয়নি—কারণ কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি অনুশীলনকে বাছাই করে ব্যাপকভাবে নেতা ও কর্মীদের নেয়ার আপোষ সূত্র গ্রহণ করে। তার জন্যে অনুশীলন দল আগের মতনই কাজ করছিল আলাদা সংগঠন হিসেবে। আমরা কিছু লোক কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির সভ্য। এমনি বিচিত্র পরিস্থিতিতে কি করব আমরা? আমরা তো ভোট দানে বিরত থাকতে পারি না। আমাদের উপর সুভাষবাবু দারুণভাবে নির্ভরশীল। আমরা তাকে সমর্থন করতে প্রতিশ্রুত। তারপর জয়প্রকাশ, অচ্যুত প্রভৃতি সামগ্রিকভাবে আমাদের সভ্যদের সাথে আলাপ আলোচনা না করেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সে দিক দিয়ে অনুশীলন সভ্যদের পথ খুব পরিষ্কার। অতএব neutral থাকার প্রশ্ন ওঠে না—তীব্র প্রতিবাদ জানাতে হবে প্রস্তাবের। মূল অধিবেশনে আমরা কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির নির্দেশ মানব না—এ কথা জানিয়ে দেওয়া হয় জয়প্রকাশকে।

মূল অধিবেশন শুরু হয় গোধূলী লগ্নে। অধিবেশনের স্থানটি অতি মনোরম। একটি পাহাড়ের ঢালু প্রান্তদেশকে মঞ্চে রূপান্তরিত করা হয়— সম্মুখে দাঁড়িয়ে মাটির তৈয়ারী একটি দৈত্যের মতন মানুষের প্রতিকৃতি— পাহাড়ের সমান দীর্ঘ, পেশীবহুল, গ্রীক ভাস্কর্যের মতন।

কংগ্রেস সভাপতির অনুপস্থিতিতে ছোট্ট ভাষণটি পড়লেন শরৎ বোস। ছ'মাসের ভেতর বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবে (ঠিক ছ'মাসের মধ্যে ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর যুদ্ধ ঘোষণা করে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স) অতএব স্বাধীনতার শেষ সংগ্রামের ultimatum দেওয়া হোক। তার পরের প্রস্তাব National demand। প্রস্তাবক পণ্ডিত নেহরু—সমর্থক আচার্য নরেন্দ্র দেও। জওহরলাল প্রস্তাব করতে উঠলেন! শুরু হল প্রচণ্ড হৈ চৈ। পণ্ডিত নেহেরু বক্তৃতা করতে পারছেন না। পণ্ডিত নেহেরুর জীবনে এ বোধহয় প্রথম তিক্ত অভিজ্ঞতা। জহরলালও বলে যাচ্ছেন—বিক্ষোভও চলছে সমান তালে। বিক্ষোভ-কারীরা সুভাষ সমর্থক। বেশীর ভাগ মানুষ বাঙ্গালী। বাংলার বাইরের মানুষও ছিলেন—কিন্তু বাংলার সংখ্যাধিক্য অনস্বীকার্য। দীর্ঘকাল যাবৎ চলে এই বিক্ষোভ। তারপর নেহরু অসুস্থতা বোধ করায় প্রস্তাব উত্থাপন করেন জয়প্রকাশ নারায়ণ।

বেশী রাত্রে সম্মেলনের অধিবেশন স্থগিত থাকে। নেহরুর বিরুদ্ধে বিক্ষোভের প্রতিক্রিয়া হয় প্রচণ্ড। বাংলার বাইরের প্রতিনিধিদের বেশীর ভাগ এ ধরণের বিক্ষোভ মোটেই পছন্দ করেন নি। প্রধান কারণ পন্থ প্রস্তাব নেহরু আনেননি বা আনার আগে তার মতও নেয়া হয়নি। পন্থ উত্তর প্রদেশের হলেও যে প্যাটেল সমর্থক—তা অনেকে জানেন না। তাই পন্থের সাথে নেহেরু জড়িত হন।

পন্থ প্রস্তাবও পাশ হয়ে যায় পরের দিন। সম্মেলনে এই প্রথম এম. এন. রায়কে দেখলাম। তাঁর বক্তব্য ছিল তথ্যপূর্ণ, তাত্ত্বিক। দীর্ঘকায় সুপুরুষ। স্বতঃই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফৈজপুর কংগ্রেস সভাপতির অভিভাষণে নেহেরু তাঁকে সাদর আহ্বান জানিয়েছেন ভারতবর্ষের জাতীয় বিপ্লবকে সমৃদ্ধ করার জন্যে। ভারতে এসে তার পুরানো চিন্তাধারার বদল করেছেন তিনি। ১৯২১-২২ সালে যে ফর্মূলা মাফিক গান্ধীর আন্দোলনের বিচার করেছেন—সে মনোভাব ত্যাগ করতে পেরেছেন তিনি। এখানেই শ্রীরায়ের বৈশিষ্ট্য। দীর্ঘদিনের বদ্ধমূল শিক্ষা ও চিন্তাধারার বদল করা খুব সহজ নয়। বিশেষ

করে Committed কম্যুনিষ্টদের পক্ষে। ২৪ বছর পরে যুগান্তর নেতৃবৃন্দের কাছে তার বক্তব্য রাখেন। কিন্তু হরিদা (হরিকুমার চক্রবর্তী) ও জীবন চ্যাটার্জী ছাড়া কেউই সমর্থন করেননি তাঁকে। সেদিনের নরেন ভট্টাচার্য ও ১৯৩৭-৩৮ এর এম· এন· রায় এর কত না ব্যবধান! উঁচু পর্যায়ের intellectual নরেন ভট্টাচার্যের সাথে পা মিলিয়ে চলার ক্ষমতা ছিল না যুগান্তর নেতৃবৃন্দের।

ত্রিপুরী পেঁৗছে দেখা করতে যাই আচার্য নরেন্দ্র দেওর কাছে। যতদূর স্মরণ হয় আমরা তিনজন তাঁর সাথে দেখা করি নেতানিবাসে। সতীশ সরকার, ত্রিদিব চৌধুরী ও আমি। আচার্য নরেন্দ্র দেও Socialisl পত্রিকার সম্পাদকীয় বোর্ডের সভাপতি। আমরা "Socialist" প্রথম সংখ্যাটি নিয়ে যাই তার কাছে। তখন কেবলমাত্র একটি সংখ্যাই বের হয়েছে। ঐ সংখ্যায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে ছিল "Socialist" পত্রিকার মূল নীতির বিশ্লেষণ। আচার্য দেও চোখ বুলিয়ে একটি অনুচ্ছেদ সম্পর্কে সমর্থন জানাতে পারেন নি। সে অনুচ্ছেদটি ছিল কংগ্রেস নেতৃত্ব সম্পর্কে বিশ্লেষণ। তার সাথেই বের হলাম প্যাণ্ডেলের দিকে। যেতে যেতেই বুঝতে পারি তার প্রচণ্ড অথচ নীরব জনপ্রিয়তা।

সম্মেলনের শেষ দিন C. S. P. দলের অন্তর্ভুক্ত কংগ্রেস ডেলিগেটদের এক সম্মেলন হয়। আমরা বাংলার ডেলিগেটরা উপস্থিত ছিলাম সেখানে। সভায় সম্মেলনে পন্থ প্রস্তাব সম্পর্কে তার বিচারধারা রাখেন জয়প্রকাশ। কেন যে পন্থ প্রস্তাবে neutral মনোভাব গ্রহণ করা হয় তার পটভূমিকাও ব্যাখ্যা করেন। তার বক্তব্য ছিল যে পন্থ প্রস্তাব সম্মেলনের মূল প্রস্তাব নয়। প্রধান রাজনৈতিক প্রস্তাব হল National Demand Resolution। বৃথা পন্থ প্রস্তাব নিয়ে হৈ চৈ। রাজনৈতিক প্রস্তাব প্রগতি ধর্মী। সে প্রস্তাবের সমর্থক কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি এবং ঘটনাচক্রে প্রস্তাব উত্থাপন করেন কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি। সেদিক দিয়ে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির মর্যাদা বেড়েছে বই কমেনি। প্রকাশ্য অধিবেশনে জওহরলালের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান ঠিক হয়নি। সভায় খুব বেশী কিছু আলোচনা হতে পারেনি। তবে নেতাদের অগণতান্ত্রিক মনোভাব সম্পর্কে উষ্মা ছিল খুবই—আর পন্থ প্রস্তাব একবার বিরোধিতা করে—পরে neutral থাকা যুক্তিসঙ্গত হয়নি। আমরা যে দলের whip মানিনি, সে সম্পর্কে কিছুই আলোচনা হয়নি। সমস্ত আলোচনার পর মনে হল যে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব খুব জওহরলাল ভক্ত। বলা বাহুল্য

এদের উপর পণ্ডিত নেহরুর প্রভাব ছিল খুবই প্রচণ্ড। জয়প্রকাশ যে খুবই নেহরুভক্ত তা তার বক্তৃতায় চাপা দেওয়ার চেষ্টা সত্ত্বেও ফুটে ওঠে। ডাঃ লোহিয়া ছিলেন নেহরুর পূজারী। নিখিল ভারত কংগ্রেসের বিদেশমন্ত্রী ডাঃ লোহিয়া। আর বিদেশনীতির নিয়ামক ছিলেন পণ্ডিত নেহরু। সেদিক দিয়ে উভয়ের মতৈক্য ছিল খুবই বেশী। পরে লোহিয়া তীব্র নেহেরু বিরোধী হন।

ত্রিপুরীতে সুভাষচন্দ্র খুবই অসুস্থ ছিলেন। একটি বারের জন্যও প্রকাশ্য সম্মেলনে উপস্থিত হতে পারেন নি। অথচ তিনিই মুখ্য ব্যক্তি। অত্যন্ত ভারাক্রান্ত চিত্তে ত্রিপুরী ত্যাগ করেন সুভাষচন্দ্র। ত্রিপুরী থেকে ফিরে বিহারে জামাডোবাতে যান বিশ্রামের জন্য। তার সামনে জটিল সমস্যা। কেমন করে working Committee তৈরী করবেন। গান্ধীজীর মনোভাব তো বোঝা গেল তাঁর অনুপস্থিতিতে। সর্দার প্যাটেলদের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে পন্থ প্রস্তাবে। কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির মনোভাব অনিশ্চিত।

সাত ঃ ত্রিপুরীর পর

ত্রিপুরী সিদ্ধান্তের জন্য এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এর শেষ কোথায়? সভাপতিকে শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করতে হবে? এতো পদত্যাগ হবে না— অপমান করিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া। সংখ্যাধিক্য নির্বাচিত সভাপতিকে তার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে দেওয়া হবে না—এ কেমন গণতন্ত্র? গান্ধীজী অনশনরত, সভাপতি গুরুতর অসুস্থ। দেখা হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? সভাপতির হাত পা বাঁধা। গান্ধীজীর সাথে পরামর্শ ছাড়া কিছু করতে পারবেন না। গান্ধীজীর সাথে সুভাষের ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সম্পর্কে যদি মতভেদ হয়—তাহলে কি হবে? তাহলে তো সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগ করা ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই।

বিপদের দ্বিতীয় কারণ, কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির সাথে মিলন সম্পর্কে। অনুশীলন দলকে আলাদাভাবে না রেখে দেশের বামপন্থি ধারা কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টিতে মিলে যাওয়ার প্রয়াসে প্রচণ্ড ধাক্কা খেল ত্রিপুরীতে। রবিদা জিজ্ঞাসা করেন "এদের সাথে কি চলা যাবে? আমরা সুভাষবাবুর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সুভাষচন্দ্রকে তো ছাড়া যাবে না।" মনে বারংবার প্রশ্ন ওঠে—কঃ পন্থাঃ। মনে হল যেন রাজনৈতিক নাবালকতা থেকে মুক্তি পাচ্ছে না সোস্যালিষ্ট পার্টি নেতৃত্ব। বশংবদ বিরোধী পার্টির কোন কার্যকর ভূমিকা নেই। মনে হল এদের নীতি যেন ভেতর থেকে অনুরোধ করে কংগ্রেস নেতৃত্ব বদল করা। নেহরু প্রগতিশীল। প্রচ্ছন্ন সমাজবাদী। কিন্তু একটি বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত গৌরিশৃঙ্গের মতন অচল অটল—তা হল গান্ধী নেতৃত্ব। তিনি ১৯৩৪ সালে কিছুদিনের জন্য কলকাতায় আলিপুর জেলে ছিলেন। তাঁর সেলের পাশেই ছিল Inter Provincial Conspiracy কেসের বিচারাধীন বন্দীরা। অনুশীলন বন্দীদের সাথে স্বয়ং পণ্ডিতজীর আলোচনা হত। বিপ্লবীরা পণ্ডিত নেহরুকে অহিংস বৈপ্লবিক নেতৃত্ব দেখার জন্য তাদের আবদার জানায়। তাদের বক্তব্য, জওহরলাল ও সুভাষ একত্র হয়ে বিপ্লবীদের নেতৃত্ব দিন। পণ্ডিতজী এদের সকল কথা শুনে তার সুচিন্তিত উপসংহার জানান—"গান্ধীজী যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন গান্ধীজীকে কেউ নেতৃত্ব থেকে হঠাতে পারবে না—আর তিনিও তা চান না।"

জওহরলাল বিরোধ করেও গান্ধী নেতৃত্ব মেনে নেবেন। এখানেই ছিল সর্দার প্যাটেলের তুরুপের তাস। কংগ্রেস সংগঠন প্যাটেল বন্ধুদের মুঠোয়। অতএব এমনি এক জটিল শক্তি বিন্যাসের ভেতর কাজ করার দায়িত্ব কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির। কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির ভেতর মার্কসবাদী নরেন্দ্র দেও, জয়প্রকাশ নারায়ণ গান্ধীবাদী নবকৃষ্ণ চৌধুরী ও ডাঃ লোহিয়া, অচ্যুত পট্টবর্ধন ও অশোক মেহাতার মতন Fabian, মাসানীর মতন মার্কসবাদবিরোধী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় ও সম্পূর্ণানন্দের মতন নেহেরুপন্থী কংগ্রেসী। এ ছাড়া এক বিরাট সংখ্যক ছিলেন ইউরোপীয় Social Democracy-র ভক্ত। এই দলের পক্ষে একমত হয়ে খোলা তলোয়ারের মতন কাজ করা শক্ত ছিল, এরা সকলেই যোগ্য ও ত্যাগী কর্মী। এদের কারো কারো পাণ্ডিত্য সর্বজনবিদিত। কিন্তু সকলে মিলে একটি Crystal রচিত হল না। হল ভিন্ন ভিন্ন রঙের একগাছি মালা। অল্প চাপেই এই মালা ছিঁড়ে যেতে পারে। বাস্তব ক্ষেত্রে হলও তাই। ধীরে ধীরে দল থেকে চলে গেলেন সম্পূর্ণানন্দ, শ্রীপ্রকাশ, নবকৃষ্ণ চৌধুরী। তারপর মাসানী ও কমলা দেবী প্রভৃতি।

প্রাদেশিক নেতৃত্বে প্রবেশ

বাংলায় ফিরে এসে প্রথম কাজ হল আমাদের মহকুমা রাজনৈতিক সম্মেলন। সম্মেলনের স্থান আমার বাল্যের খেলাঘর জুলুহারের নিকটে মৈশানী গ্রামে। সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক আমার সতীর্থ বন্ধু প্রিয়লাল সরকার এবং চেয়ারম্যান আমি। সম্মেলনের সভাপতি আশাফুদ্দিন চৌধুরী। গুরুতর দায়িত্ব আমার কাঁধে। সম্মেলনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা এবং চৌধুরী সাহেবকে নিরাপদে নিয়ে যাওয়া এবং নিরাপদে পৌছে দেওয়া। ছোট্ট মৈশানী গ্রামটির চারিদিকে মুসলমানদের আধিক্য। চৌধুরী সাহেব ছাড়া প্রায় সকল মোসলেম নেতা কংগ্রেসের বাইরে। তখন লীগের গতিপথে জোয়ার দেখা দিয়েছে। ১০ দিন পরিশ্রম করার পর সম্মেলন সার্থক হয়। চৌধুরী সাহেবকে মৈশানীতে অভ্যর্থনা করার সময় বিরাট বিক্ষোভ হয়। লীগ সমর্থকরা কালো পতাকা নিয়ে পথে পথে বিক্ষোভ দেখায়। কিন্তু আমাদের আয়োজনও খুব ভালো ছিল—তাই সম্মানের সাথে ফিরে যান চৌধুরী সাহেব।

সম্মেলন শেষ করেই ফিরে আসি কলকাতায়। কলকাতা তথা সারা ভারতের রাজনীতিতে ভীষণ ঘনঘটা। বাংলায় নতুন নির্বাচিত প্রাদেশিক কমিটি তখনও গঠিত হয়নি। নতুন নির্বাচিত ডেলিগেটদের সভায় সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচন করে কমিটি গঠন করার সকল দায়িত্ব ন্যস্ত হয় সুভাষচন্দ্রের উপর। সুভাষচন্দ্রের পক্ষে সকল গোষ্ঠির সাথে আলাপ আলোচনা করে কমিটি গঠন করার অবসরও কম। তবু তিনি কাজ চালাবার মতন কার্যকরী কমিটির ১৮টি নাম ঘোষণা করেন। এরা সকলেই পুরোপুরি সুভাষ সমর্থক। কমিটিতে শরৎ বোস, সুরেশ মজুমদার, সত্য বক্সী, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, প্রতুল গাঙ্গুলি, সত্যপ্রিয় ব্যানার্জী, রবি সেন, হরেন ঘোষ, প্রভৃতি এবং আমার নামও ঘোষণা করা হয়। আমি বয়সে অপেক্ষাকৃত অনেক ছোট। প্রথম তালিকায় আমার নাম স্বভাবতঃই অনেকের বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

চৌধুরী সাহেব সম্পাদক। পুরানো Office বেয়ারাররা কেউ নেই। আমাকে যেতে বলা হল প্রাদেশিক দপ্তরে। রোজই দপ্তরে যেতাম সম্পাদককে সাহায্য করার জন্যে। সঙ্গে থাকত আমার সহকর্মী সুধাংশু বসু। সুধাংশু-বাবু ছাত্র আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় মানুষ।

প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দের দুর্গে আমার প্রবেশ নতুন। এতদিন কংগ্রেস সংগঠনের বাইরে বাইরে ছিলাম। ওখানে এসে যাদের সাহচর্যে আসি তাদের মধ্যে নাম করতে হয় শ্রদ্ধেয় রাজেন দেব, পঞ্চানন বসু, বিজয়েন্দ্র নাথ পালিত। এরা সকলেই পুরোপুরি কংগ্রেসের মানুষ। আমরা বিপ্লবী দলের মানুষ—বিপ্লবী ঐতিহ্য। স্বতঃই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। বি· পি· সি· সি·-র অফিস ছাড়া আর একটি যাওয়ার স্থান ছিল Advance Office। সত্যবাবু সম্পাদক। তার কাছে গেলে ভেতরকার খবর জানা যেত। আর বলা বাহুল্য, সুভাষবাবুর কোন কোন নির্দেশ সত্যবাবুর মাধ্যমে আসত। ব্যস্ততা সত্ত্বেও সত্যবাবুর সাথে আলোচনা করার অসুবিধা হত না। তার একটি অদ্ভুত ক্ষমতা লক্ষ্য করেছি আমি। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখা ও আমাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা একই সাথে করতেন। সব রকমের আলোচনা হত। গান্ধীজী কি বলেছেন, ওয়ার্কিং কমিটি কাদের নিয়ে হবে—সকল রকম জল্পনা কল্পনা!

A. I. C. C.-র বৈঠকের কাজের দায়িত্ব কে কে নেবেন সে সম্পর্কে

দীর্ঘ আলোচনা হয়। প্রাদেশিক সমিতি আহ্বায়ক। সকল দায়িত্ব প্রাদেশিক সমিতির। কিন্তু প্রাদেশিক সমিতির সকলে আমাদের পক্ষে নয়। বাংলা কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা কিরণশঙ্কর রায় ও তার বন্ধুরা কিছু উদাসীন। খাদি গ্রুপ বিরুদ্ধে। যুগান্তর গোষ্ঠীও দক্ষিণপন্থী শিবিরে। অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ চিরকালই সুভাষ সমর্থক। বিপিনদা (গাঙ্গুলি) বিরুদ্ধে যাননি। পূর্ণদাও যুগান্তরের সাথে একমত ছিলেন না। সরকারী যুগান্তর গোষ্ঠি তখন মূলতঃ ময়মনসিংহ, বরিশাল ও খুলনার কর্মীদের মধ্যে সীমিত। সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, পাবনা, রংপুর ও উত্তরবংগের বিভিন্ন জিলার যুগান্তর কর্মীরা সুভাষ সমর্থক। সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ, মনোরঞ্জন গুপ্ত অরুণ গুহ, ভূপেন দত্ত প্রভৃতির মতন এক সময়ের সুভাষ সমর্থকদের দক্ষিনপন্থী শিবিরে যোগ দেওয়া অত্যন্ত দুঃখের ও পরিতাপের। ডাঃ বিধান রায়ও নলিনী সরকারের ঐ দিকে থাকার কারণ বোঝা যায়। কিন্তু প্রাক্তন বিপ্লবীদের নলিনী সরকারের Caucus-এ থাকার কারণ বোঝা দুষ্কর।

বেশীর ভাগ প্রাক্তন বিপ্লবীরা মূলত সুভাষ সমর্থক। সুভাষ সমর্থকদের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন সত্যরঞ্জন বক্সী। মানুষটি সাদাসিধে, দেখতে ছোট্ট কৃশদেহ। বরিশাল জিলায় বাড়ী। বরিশালবাসীর বৈশিষ্ট্যে ভরপুর সত্যবাবু। আপন কাজে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা অসাধারণ। প্রখ্যাত সাংবাদিক। Forward ও Liberty কাগজের সম্পাদক ছিলেন। ভাবপ্রবণতা ও আবেগ-পূর্ণ লেখায় নৈপুণ্য অসাধারণ। বরিশালবাসীদের জেদ ও গোঁ তার ভেতর ছিল পুরোমাত্রায়। নিরহংকার। সর্বদাই পেছনের সারিতে বসার আগ্রহ অথচ পেছনের সারির মানুষ নন। সুভাষচন্দ্রের সম্পূর্ণ আস্থাভাজন ব্যক্তি। সুভাষচন্দ্রের উপর তাঁর প্রভাব সর্বজনবিদিত। স্বাধীন ভারতে বাঙালী এই মানুষটিকে তার যথাযোগ্য সম্মান দেয়নি—তার জন্য স্বতঃই লজ্জা বোধ হয়।

এ সময় আর একটি মানুষের অবদানের কথা উল্লেখযোগ্য। তিনি রবি সেন। রবীন্দ্রমোহন ঢাকার অধিবাসী। দীর্ঘকায়। প্রাণখোলা। কোন কিছু রেখে ঢেকে বলার মানুষ নন। অভিজ্ঞ রাজনীতিকের চরিত্র নন। সহজভাবে খুব অপ্রিয় কথাও বলতে পরাঙ্মুখ নন। বাইরের রূপ খুবই কঠোর। কিন্তু ভেতরে একটি সরল প্রাণ। ভাল ছবি আঁকতে পারতেন। স্নেহ বৎসল। বিশেষ করে আপনজনের জন্য যে কোন ঝুঁকি নিতে পারতেন।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সুভাষচন্দ্রের এক ধরণের গুণগত পরিবর্তন হয়। সুভাষচন্দ্র গোপন কাজ সম্পর্কে রবিবাবুর সাথে পরামর্শ করতেন। রবিবাবু ঐ সময় সুভাষবাবুকেই তাঁর নেতা বলে মানতেন—যেমন মানতেন এক সময় পুলিন দাসকে।

গণতন্ত্রের সমাধি

ত্রিপুরীতে যে অন্যায় প্রস্তাব নেয়া হয়েছে, তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় স্বাভাবিক ভাবে। সুভাষচন্দ্র এমনিই Working Committee গঠন সম্পর্কে গান্ধীজীর সঙ্গে পরামর্শ করতেন। এই ছিল এতদিনকার ধারা। অহেতুক একটি প্রস্তাব চাপিয়ে দেওয়ার একমাত্র অর্থ নব নির্বাচিত সভাপতিকে অপমান করা।

অসুস্থ সভাপতি কলকাতায় ফিরে এলেন না। গেলেন তিনি জামা ডোবায় তাঁর বড় ভাই-এর কাছে বিশ্রামের জন্য। একটু সুস্থ হয়ে তিনি গান্ধীকে পত্র লেখেন। তিনি জানান যে গান্ধীর সাথে Working Committee গঠন করার ব্যাপারে তিনি তাঁর পরামর্শ এমনিই নিতেন। জাতীয় জীবনে গান্ধীর গুরুত্ব সুভাষচন্দ্র কারো চেয়ে কম জানেন না। তিনি কমিটি গঠন সম্পর্কে গান্ধীর পরামর্শ চান। গান্ধীজী জানান যে কলকাতায় উপস্থিত হয়েই এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবেন তিনি।

কিন্তু অন্যদিকে অর্থাৎ High Command লড়াই জারী রাখে। এলাহাবাদে A. I. C. C. দপ্তর থেকে জানান হয় যে অফিস সম্পাদকরা সকল চিঠি জমা করে রাখছে। কোন কিছুর জবাব তারা দেবে না। সভাপতিকেই সব কিছু করতে হবে। সুচেতা কৃপালিনী তখন অন্যতম দপ্তর সম্পাদক ছিলেন। কিছুদিন পরে এলাহাবাদ অফিস থেকে বড় বড় ৫।৬টি বাক্স বোঝাই চিঠিপত্র সুভাষচন্দ্রের রোগ শয্যার পাশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নির্বাচিত সভাপতির সাথে সহযোগিতার কি অপূর্ব নিদর্শন!

A. I. C. C. ডাকা হয়েছে কলিকাতায়। ওয়েলিংটন (বর্তমান সুবোধ মল্লিক) স্কোয়ারে অধিবেশনের স্থান। গান্ধী এলেন ৩।৪ দিন আগে। রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু স্বতই কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। গান্ধীজী থাকেন সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠানে। অন্যান্য নেতৃবৃন্দও একে একে এলেন। জওহরলাল ছিলেন ডাঃ বিধান রায়ের অতিথি। আর সকলে বিড়লা পার্কে।

কিন্তু এলেন না High Command এর মুখ্য ব্যক্তি সর্দার প্যাটেল।

গান্ধীর সাথে দীর্ঘ আলোচনা হয় সুভাষচন্দ্রের। প্রায় সকল আলোচনায় জওহরলালজী ছিলেন সুভাষচন্দ্রের সাথে। দু' একদিন বৈঠকে সত্যবাবুও ছিলেন। এ সকল বৈঠকে পণ্ডিত নেহরুই সুভাষচন্দ্রের পক্ষের Spokesman। নেহেরু প্রতি বৈঠকেই কংগ্রেসের দুরবস্থার জন্য গান্ধীজীকে তীব্র ভাষায় ভৎসনা করেন। কারণ নেহরুও High Command-এর গোষ্ঠিচাপের শিকার। তিনিও কয়েকবার সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়াতে চেয়েছেন। কিন্তু গান্ধীজী তাঁর পক্ষে। তাই তিনি ক্ষতবিক্ষত হলেও টিঁকে ছিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের পেছনে ঐ ধরণের কেউ ছিল না। পণ্ডিত নেহরুও সুভাষচন্দ্রের বক্তব্যের খুব বিরোধিতা করেন নি গান্ধীজী। তিনি ও পণ্ডিত নেহরু কলকাতায় একজন সাধারণ সম্পাদক থাকুক—তাতে রাজী ছিলেন এবং সত্যরঞ্জন বক্সী সে পদের অধিকারী হবেন—তাও তারা জানতেন। কিন্তু আলোচনার পর গান্ধী সকলকে নিরাশ করেন। তিনি নিজে কমিটি রচনা করতে অস্বীকার করেন। তিনি সুভাষবাবুকে বলেন যে রাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্যাটেল প্রভৃতির সাথে যখন একত্রে কাজ করতে হবে, তখন তাদের সাথে কথা বলাই ভাল। পন্থ প্রস্তাব গান্ধী মানলেন না। সুভাষচন্দ্র ওদের সাথে আলোচনা শুরু করেন। রাজেন্দ্রবাবু Spokesmam। সাথে আজাদ। মৌলানা চতুর মানুষ। চুপচাপ ছিলেন। রাজেন্দ্রবাবু একটি তালিকা দিয়ে জানান যে ঐ তালিকা পুরোপুরি মেনে নিতে হবে। এর কোন রদবদল করা চলবে না। জওহরলালও আর এগোতে পারেন নি, কেবল সুভাষবাবুকে অনুরোধ করেন কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে। সুভাষচন্দ্রের পক্ষে মর্যাদা রক্ষা করে কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি পদত্যাগ করার কথা জানালেন। রাজেন্দ্রবাবু এটাই চেয়েছিলেন।

তারপর কথা ওঠে, নতুন সভাপতি নির্বাচন করার পদ্ধতি কি হবে? সংবিধান অনুযায়ী নতুবা ডেলিগেট দিয়ে নির্বাচিত হবে। তার উত্তরে রাজেন্দ্রবাবুরা জানান "A.I.C. C তেই নির্বাচন হবে। তিনি আরো বলেন "It is our decision"। অদ্ভুত জবাব। "Our" মানে কি? সভাপতি ও A. I. C. C.র অজ্ঞাতসারে কোথাও গোপন সিদ্ধান্ত আগেই নেয়া হয়। সুভাষচন্দ্রের সাথে এখানেই লড়াই। তার অভিযোগ হল যে—সভাপতির অগোচরে কোনো গোপন গোষ্ঠি আপোষ আলোচনা চালাচ্ছে ফেডারেশন

গ্রহণ করার জন্তে। রাজেন্দ্রবাবু তার উক্তির ভেতর দিয়ে সে গোপন কথাটি ফাঁস করে দেন। গোপন কথাটি আর গোপন রইল না।

বিকালে A. I. C. C.র বৈঠক শুরু হয় নির্দ্ধারিত সময়। শুভ্র খাদি পরিহিত সভাপতি দৃঢ় পদক্ষেপে মঞ্চে দাঁড়িয়ে জানান "আভি কারোয়াই শুরু হোগী"। সভাপতি গম্ভীর কিন্তু প্রফুল্ল। এর মধ্যে আমরা শুনতে পেলাম যে তিনি পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা সভাপতির কাছাকাছি মঞ্চে দাঁড়িয়ে। সুভাষচন্দ্র দৃপ্ত কণ্ঠে ইংরাজীতে বক্তব্য রেখে পেশ করেন তাঁর পদত্যাগপত্র। ছোট্ট বক্তব্য। তার শেষ পংক্তিটি আজও অনুরণিত হচ্ছে আমার মধ্যে—"I want unity of action not Unity of inaction."

সভাপতি সরোজিনী নাইডুকে সভার কাজ চালাতে অনুরোধ জানান। কারণ সবচেয়ে প্রাচীন সভাপতিই নির্বাচিত সভাপতির কাজ চালাবেন। সেদিক দিয়ে এ দায়িত্ব ছিল মৌলানার। কিন্তু মৌলানা সাহেব চতুর মানুষ—এক সময় কলকাতায় ১৯ নং বালিগঞ্জ সারকুলার রোডে থাকতেন। তিনি এ দায়িত্ব এড়িয়ে গেলেন।

তার পরের নাটক কয়েক মিনিটের মধ্যেই সমাপ্তি। সভাপতি নির্বাচনের প্রশ্ন এল। A. I. C. C. সভাপতি নির্বাচন করবে—না সকল ডেলিগেটরা। এ নিয়ে শুরু হয় বাদানুবাদ। সর্দার প্যাটেলদের পক্ষে সাংবিধানিক প্রশ্নের জবাব দিলেন ভুলাভাই দেশাই। সভার উপর টেক্কা দিলেন সেদিনকার সভানেত্রী। এতদিন জানতাম যে সরোজিনী ভাবপ্রবণ কবি—রাজনীতি তার সহজাত ধর্ম নয়। কবি রাজনীতিক। আর কোন গোষ্ঠিভুক্ত হতে পারেন তিনি সে ধরণের কথা কখনো শুনিনি। কিন্তু শ্রীমতী নাইডু সব লজ্জার মাথা খেয়ে, শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে উচ্চস্বরে বলেন—"I will be unconstitutional to day."। তাঁর রুলিং—সভাপতি নির্বাচন তখনই হবে। Agenda তে থাক বা না থাক। নির্বাচনের জন্য রাজেন্দ্রবাবুর নাম প্রস্তাব করা হল। কলকাতায় আসার আগে সব কিছুই ঠিক করে আনা হয়েছে। অনুপস্থিত বল্লভভাই-ই সব নির্দ্ধারিত করেছেন। আমরা কয়েকজন বন্ধুরা দেবেন দেকে দিয়ে কৃপালিনীর নাম প্রস্তাব করি। কিন্তু কৃপালিনী তার স্বভাবসুলভ ব্যাঙ্গোক্তি করে বলেন যে "Son of Bengal" যখন পদত্যাগ করেছেন তখন Son-in-law দাঁড়াতে পারে না। অতএব তিনি দ্বন্দ্ব থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন।

High Command এর সভ্যরা সম্মেলন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিক্ষোভের শিকার জওহরলালও হন। কেবল বাদশা খানের বিরুদ্ধে কোন বিক্ষোভ হয়নি। সৎ মানুষকে বাছাই করতে জনতার কোন অসুবিধা হয়নি। পণ্ডিত নেহরু বিক্ষোভের ভেতর দিয়েই পায়ে হেঁটে ডাঃ বিধান রায়ের বাড়ীতে যান।

শেষ হল এক ঐতিহাসিক অধ্যায়। এ ঘটনার কাল পর্দা সরিয়ে কোন দিন সত্যকে আবিষ্কার করার চেষ্টা হবে কিনা জানি না। সুভাষচন্দ্রের দিকের কথা আমরা জানি। কিন্তু ওই দিকের? সব কিছুই গোপন। কোন ঐতিহাসিকের এ গোপনতার মুখোশ খোলার সাধ্য নেই। যারা জানতেন তারা মুখ খোলেন নি। সবকিছু বোধ হয় গান্ধীজীও জানতেন না। সুভাষচন্দ্রের বিতাড়ন সমাপ্ত প্রবাহের মধ্যে একটা ঘটনা মাত্র ভারত পেরিয়ে বৃটিশ মন্ত্রীসভা পর্যন্ত এই চক্রান্তের প্রসার।

পদত্যাগের পর

সভাপতির পদত্যাগের পর আমরা কোমর বেঁধে লাগি সংগঠন শক্তিশালী করার জন্যে। বংগীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি আমাদের হাতে। তার মাধ্যমে কাজ শুরু হয় খুব ক্ষিপ্রগতিতে। তখনও সুভাষচন্দ্র আমাদের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। কিন্তু A. I. C. C.-র পর খুব ভাবান্তর লক্ষ্য করি আমাদের বিরোধী গোষ্ঠির মধ্যে খাদি গ্রুপ, কিরনবাবুর গোষ্ঠি ও যুগান্তর গোষ্ঠির সুভাষ বিরোধী অংশ। এরা প্রাদেশিক কমিটির সভায় অনুপস্থিত থাকতে আরম্ভ করেন। কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সাব কমিটিতে —Election Tribunal, Election Dispute Commitee—Dispute Commitee-তে ওদের অনুপস্থিতি দেখে মনে হয়েছে, নূতন কোন বিপদ আসছে।

প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ গেল—দক্ষিণ পন্থী বিপক্ষ পার্টি দ্বারা। সর্দার প্যাটেলরা চেয়েছিলেন একটি অজুহাত। সে অজুহাত সাজিয়ে দিয়ে ছিল কিছু সংখ্যক কর্মীরা। A. I. C. C-র হিসেব পরীক্ষা করার জন্যে Bombay এর Butliboy Companyকে হিসেব পরীক্ষা করার জন্য নিয়োগ করা হয়।

দিনের পর দিন আমরা হিসেব দেখাই Butliboy কোম্পানীকে প্রদেশ

কংগ্রেসের মূল হিসেব কোন ত্রুটি ছিল না। একটি Sub Commitee-র হিসেব রাখা ঠিক হয় নি। কিছু ভুল ভ্রান্তি ছিল। আমার মনে হয় ভারতবর্ষে এমন কোন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি নাই যার হিসেব রাখার অল্পবিস্তর ভুল ভ্রান্তি হয় না। তখনকার দিনের কংগ্রেস সংগঠন। কর্মীদের খাওয়ার খরচ জোগাড় করা সম্ভব ছিল না। জিলা পর্যায়ে মুষ্টি ভিক্ষার মাধ্যমে কর্মীদের খাওয়ার খরচ জোগানো হত। যথাসম্ভব আয় ব্যয়ের হিসেব রাখা হত। তখন সঠিকভাবে Voucher রাখা সম্ভব ছিল না। আর ঐ Voucher এর ত্রুটির জন্যই প্রদেশ কংগ্রেস অভিযুক্ত হয়।

এদিকে সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগের ২ মাস পরে Forward Block দল গঠিত হয়। Forward Block স্বরাজ পার্টি'র মতনই কংগ্রেসের ভেতরই আর একটি বামপন্থী প্রতিষ্ঠান—কোন বিকল্প সংগঠন নয়। সুভাষচন্দ্র আমাদের কর্মীদের সভায় নতুন গোষ্ঠী করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন এবং বিশদভাবে বুঝিয়ে বলেন যে কোন কংগ্রেস বিরোধী পার্টি রচনা করছেন না—করেছেন একটি Bloc মাত্র।

স্থাপিত হল ইংরাজী মুখপাত্র "Forward Bloc"। সম্পাদক স্বয়ং সুভাষচন্দ্র। সকল দায়িত্ব সত্যবাবুর উপর। গড়ে ওঠে সারা ভারত Forward Bloc।

সারা ভারতে বিদ্যুৎগতিতে পরিভ্রমণ শুরু করেন সুভাষচন্দ্র। যেখানে যেতেন—সেখানেই জনসমুদ্র। সকলেই বিস্ময়ের সাথে দেখত ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজ বিদ্রোহীকে। প্রতি সভায় তিনি High Command ও ইংরেজের মধ্যে আপোষের মুখোশ খুলে দেওয়ার আহ্বান জানান। ওয়ার্কিং কমিটি ভীত হয়ে পড়ে। মহাত্মা গান্ধী চরম ব্যবস্থার জন্য সুপারিশ করেন। গান্ধী কমিটি সভ্যদের বলেন—যদি তারা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারে তবে তাদের সরে দাঁড়ানো (abdicafe) উচিত। তিন বছরের জন্য সুভাষকে কংগ্রেস থেকে বহিস্কার করার প্রস্তাব—স্বয়ং গান্ধীর।

কিন্তু এ শাস্তি অবজ্ঞা করেছে ভারতের জনমানুষ। তারা হাজারে হাজারে সুভাষচন্দ্রের সভায় যোগদান করতে থাকে। কোন কংগ্রেসের নেতার জনসভায় এমন বিরাট সমাবেশ হত না। এ চরম শাস্তি সুভাষচন্দ্রকে সহস্রগুন উৎসাহিত করে। একদিকে কংগ্রেস নেতৃত্ব—আর একদিকে একা সুভাষচন্দ্র। মাঝখানে ভারতের লক্ষ কোটি জনতা।

প্রাদেশিক কমিটি প্রস্তাব করে দণ্ডপ্রাপ্ত সুভাষচন্দ্রকেই সভাপতির পদে বহল থাকতে বলে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র প্রদেশের কাজ থেকে মুক্তি চান। তাঁর স্থানে আমরা নির্বাচিত করি শ্রীরাজেন দেবকে। প্রবীন্ কংগ্রেস কর্মী। উত্তর কলিকাতার এক বনেদী পরিবারে জন্ম। চিরকুমার। উঁচু পর্যায়ের ভদ্রতার শ্রেষ্ঠ প্রতীক।

এরপর গান্ধী এলেন বাংলায়। গেলেন শান্তিনিকেতনে গুরুদেব রবীন্দ্র-নাথকে তাঁর প্রণাম জানাবার জন্য। ওখান থেকে ফিরে গেলেন ঢাকা জেলার মালিকান্দা, ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের গ্রাম। গান্ধী শিয়ালদহ ষ্টেশন থেকে ট্রেনে উঠলেন। চারিদিকে কড়া পাহারা। গান্ধীপন্থীরাই এর ব্যবস্থা করে। শান্তিনিকেতনের পথে বিক্ষোভ হয়। কিছু অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটে। আমি শিয়ালদহে গেলাম—আমার ছোট ভাই গিরীন্দ্রনাথকে গান্ধীজীকে দেখাবার জন্য। গান্ধীর কামরা পর্যন্ত চলে যাই। পাশের কামরায় অন্যান্যদের সাথে বসে মাখন সেন। মাখনদা জিগ্যেস করলেন—"কি মারধোর করবি নাকি? আমি বললাম "গান্ধীজীকে মারব : বলেন কি।" হঠাৎ দেখি সুভাষচন্দ্রের একান্ত সচিব হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। হাতে শিলমোহর করা সুভাষচন্দ্রের একটি পত্র। এই শীল করা পত্র নিয়ে চারিদিকে খুব জল্পনা-কল্পনা। কেউ কেউ বলেন রবীন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় মীমাংসার সূত্র খুঁজে পাওয়া গেছে। সুভাষচন্দ্র তাই পত্র দিয়েছেন গান্ধীজীকে। পরে সুভাষচন্দ্রের সাথে দেখা হয় তাঁর বাড়ীর বৈঠকে। এসভায় আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঐ পত্রটি সম্পর্কে। সুভাষচন্দ্র জানান যে ঐ পত্রটি স্রেফ সৌজন্যমূলক। গান্ধীজী কলকাতায় ২৷৩ দিন ছিলেন। সুভাষচন্দ্র ও তখন কলকাতায়। দুজনের কোন দেখা সাক্ষাত হয় নি। তার জন্যে গান্ধী অনুযোগ করে সুভাষকে একটি পত্র দেন, এই প্রথম সুভাষ কলিকাতায় উপস্থিত থাকা সত্বেও গান্ধীর সাথে দেখা করেন নি! এমনটি আশা করেননি গান্ধীজী। সুভাষচন্দ্র তাঁকে প্রণাম জানিয়ে ঐ পত্রের উত্তর দেন।

এর পর আঘাত এল প্রচণ্ড। প্রাদেশিক কমিটি বাতিল করে দেওয়া হয়। এক ধরণের হিটলারি আচরণ। ৩২টি জিলায় শত শত নির্বাচিত সদস্য দ্বারা রচিত কমিটি একটি হুকুমনামায় বাতিল হাইকম্যাণ্ডের নির্দেশ না মেনে প্রদেশ কমিটি চালিয়ে যেতে থাকি। বিভিন্ন জিলায় ঘুরে ঘুরে জিলা শাখা সাথে রাখার চেষ্টা করা হয়। সাংঘাতিক কঠিন কাজ। সারা ভারতের

ধারা থেকে আলাদা হয়ে তথাকথিত বে-আইনী প্রাদেশিক কমিটির সাথে থাকার মত দুঃসাহস খুব অল্প কর্মীরই ছিল। কতকগুলি কমিটি আমাদের সাথে প্রস্তাব গ্রহণ করেই রয়ে গেল। ঢাকা, উত্তর কলকাতা, পাবনা দক্ষিণ কলকাতা, হাওড়া, নদীয়া প্রভৃতি।

বামপন্থী ঐক্য

কংগ্রেসের মতন ফরওয়ার্ড ব্লক তো সকল দলের গণপ্রতিষ্ঠান নয়। অতএব যাদের যাদের নিজস্ব দল রয়েছে, তারা এলেন না এর ভেতর। C. S. P., C. P. I., Royist, কিষান সভা এরা বাইরে থেকে যায়। ফলে Forward Bloc কংগ্রেসের বিকল্প হয়ে দাঁড়াতে পারে নি। তার জন্যে সারা ভারতের ক্ষেত্রে একটি বিকল্প বামপন্থী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। গড়ে ওঠে Left consolidation committee এতে সকলেই এলেন, C. S. P., C. P. I, Royist, Kishan Saba ও Forward Bloc, কে নিয়ে কমিটি গঠিত হয়। সুভাষচন্দ্র তার সভাপতি। কিষান সভার ২ জন প্রতিনিধি স্বামী সহজানন্দ ও অধ্যাপক রংগা, আর সকলের তিন জন করে প্রতিনিধি। সুভাষচন্দ্র আলাদা, মোট ১৫ জনের কমিটি।

বামপন্থী ঐক্য প্রতিষ্ঠান রচিত হল—কিন্তু বামপন্থী ঐক্য হল না। কারণ, দৃষ্টিভঙ্গির গভীর পার্থক্য। সুভাষচন্দ্রের কাছে এটি স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম। C. S. P -রও। কিন্তু অন্যান্য দলগুলির অন্য মত। আন্দোলনের রূপ কি, দিশা কি অন্তরের সত্তা কি—এ নিয়ে খুব কচকচি। সুভাষের বক্তব্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সেপ্টেম্বর নাগাদ শুরু হবে। এই যুদ্ধের সুযোগে চরম আঘাত হানতে হবে বৃটেনের উপর। "England's difficulty is our opportunity"—এ নীতি অনুসরণ করে শেষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি। কিন্তু C. P. I. ও Royist-দের মার্কসীয় কেতাবী দৃষ্টিভঙ্গী। যুদ্ধ হলে হিটলার হবে এক পক্ষ আর অন্য পক্ষে থাকবে Collective security জোটের সভ্যবৃন্দ—বৃটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া। এ যুদ্ধ হবে ফ্যাসিবাদ ও গণতন্ত্রের মধ্যে (যদিও রাশিয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়)। এ অবস্থায় ও বৃটিশ সাম্রাজ্য উচ্ছেদ করার চূড়ান্ত সংগ্রাম কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষে অসম্ভব। কারণ বৃটিশ ও রাশিয়া একই শক্তি জোটের শরীক। রাশিয়ায় মিত্ররাষ্ট্র বৃটেনের গায়ে আঘাত হানার পরিণতি হবে রাশিয়াকে দুর্বল করা। কম্যুনিষ্ট পার্টি কমিনটার্ণের

সত্য। অতএব কম্যুনিষ্টরা নানারকম যুক্তিজাল সৃষ্টি করে আগুন সৃষ্টি না করে করল ধোঁয়া। M. N. Roy তখন খুবই দ্বিধাগ্রস্থ। ইংরাজের সঙ্গে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেননি—কিন্তু ফ্যাসিজম্ তো বিশ্বের চিরশত্রু। তার বিরুদ্ধে লড়াই তো জারী রয়েছে। ফ্যাসিজম্‌কে কিছুতেই বাড়তে দেওয়া যায় না। অতএব সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রূপ নিয়ে দিশেহারা ভাব। C. P. I.-র মতন C. S. P.র আন্তর্জাতিক moorings ছিল না। তারা বিশ্বাস করতেন যে বৃটিশের বিরুদ্ধে চরম লড়াই করা প্রয়োজন; কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্বকে বাদ নিয়ে নয়; সংগ্রাম হলে ওদের সংগ্রামী অংশ চরম লড়াই লড়বে; অতএব কংগ্রেসের ভেতর ঐ শক্তি জোটকে শক্তিশালী করা। কাজেই এদের ভেতর ছিল পেছন টান। ফল সুভাষের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও L. C. C. র পক্ষে বিকল্প সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান রচনার প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

আপোষমূলক যুদ্ধ প্রস্তাব

যুদ্ধ যখন শুরু হল তখন কংগ্রেস সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত, হতবাক। বামপন্থীরা দিশাহারা। সুভাষের অনুমান সত্য প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও L. C. C. খুব সংগ্রামী কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে নি। C. S. P.-তে কিছুটা চাঞ্চল্য দেখা যায়। জয়প্রকাশ এসে সুভাষের সাথে দেখা করেন। যুদ্ধের কার্যক্রম সম্বন্ধে সময়ের খানিকটা আলোচনা হয়। যুদ্ধ যখন আরম্ভ হয়েছে তখন সাথে সাথেই আসবে Defence of Indian Rules। যুদ্ধকালীন অবস্থায় গণ সত্যাগ্রহের মতন গণ আন্দোলন করা সম্ভব নয়। জয়প্রকাশের সাথে সহিংস আন্দোলন, ভারতীয় সৈন্যদের ভেতর বিদ্রোহ, বৈদেশিক সাহায্য প্রভৃতির বিষয় আলোচনা হয়। ঐ সভায় রবীন্দ্রমোহন সেনও উপস্থিত ছিলেন। J. P. সুভাষচন্দ্রের সাথে একমত হন। তিনি বিভিন্ন রাজ্যে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর ভেতর বিদ্রহের কথাও তোলেন। জে. পি C. S. P.-র লাইন পুনর্বিবেচনা করার কথাও বলেন।

অন্যদিকে C. P. I স্তব্ধ। তারা কখনও স্বপ্নেও ভাবেনি যে যে collective security pact ভেঙে যেতে পারে। তার চেয়েও আশ্চর্যের কথা যে সোভিয়েট রাশিয়ার চরম শত্রু হিটলারের সাথে কোন চুক্তি হতে পারে তা ছিল C. P. I.-র স্বপ্নেরও অতীত। রিবেনট্রব-মলোটভ চুক্তি সৃষ্টি করে এক

নতুন পরিস্থিতির। বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি এ সমঝোতার বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করে। কিন্তু ষ্ট্যালিনের সিদ্ধান্ত নড়চড় করবে কার সাধ্য।

C. P. I.-এর বক্তব্য, local partial struggle করতে হবে। এ ধরণের স্থানীয় ও আংশিক সংগ্রাম ছাড়া জাতীয় সংগ্রাম সম্ভব নয়। কিন্তু সুভাষ তার মতে জিব্রালটারের পাহাড়ের মত অটল। তাঁর বক্তব্য, এখনই জাতীয় সংগ্রামের ডাক দিতে হবে। slogan হবে "All power to the people"। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর স্থানীয় সংগ্রাম করার কোন মানেই হয় না। বৃটিশ সরকার যে কোন প্রকার সংগ্রামের প্রচণ্ড বাধা দেবে। সে অবস্থায় একবার স্থানীয় তথা আংশিক সংগ্রাম করে পরে আর জাতীয় ভিত্তিতে ক্ষমতা দখলের লড়াই করা যাবে না। একটিই মাত্র সংগ্রাম হবে। সরাসরি ক্ষমতা দখলের লড়াই। C. P. I. রাজী হল না। শেষে তারা L. C. C. থেকে বাইরে চলে যায় C. S. P. ঘর সামলাচ্ছে। বাকী রইল কৃষক সভা ও Forward Bloc এবং বাংলার বাতিল কমিটি।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসে। কিছুটা দেরিতে। কারণ তখন পণ্ডিত নেহরু ভারতবর্ষে অনুপস্থিত। তিনি তখন চুংকিঙে। কমিটির বৈঠক বসে ওয়ার্দাগঞ্জে। সুভাষ সে বৈঠকে নিমন্ত্রিত সভ্য। কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্রবাবুর বিনা অনুমতিতেই সুভাষের আমন্ত্রণ। ক্ষুব্ধ রাজেন্দ্রবাবু সভায় আসতে অস্বীকার করেন। কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত মানুষকে Working Committeeর বৈঠকে আহ্বান করা কি আইনসংগত? কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে আহ্বায়ককে নিয়ে। আহ্বান করা হয় স্বয়ং গান্ধীর নির্দেশে। রাজেন্দ্রবাবুর কাছে সমস্যা হল—যে গান্ধী সুভাষকে চরম শাস্তি দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেন—সেই গান্ধী তাকে Working Committeeর সভ্যের মর্যাদা দিয়ে কেমন করে আহ্বান করেন? এখানেই অন্ধ গান্ধীভক্তদের অসুবিধা। ওরা হুকুম তামিল করতে অভ্যস্ত, অন্ধ আনুগত্য ওদের ধর্ম।

দীর্ঘ আলোচনা হয় যুদ্ধের ব্যাপারে। কী নীতি গ্রহণ করা হবে—ভারতবর্ষের পক্ষে কোন নীতি কল্যাণকর হবে? বৃটিশ ভারতবর্ষকে যুদ্ধরত দেশ বলে ঘোষণা করল—তা কার নির্দেশে—সে কোন ভারতবর্ষ? সে ভারতবর্ষের অবিসংবাদী নেতা কি কংগ্রেস? কংগ্রেসের সাথে আলোচনা হল না। হল না কেন্দ্রীয় বিধান পরিষদের সাথে—হল না বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রীদের এবং বিধান মণ্ডলীর সাথে। এ হল বৃটিশ সাম্রাজ্যশাহীর প্রকৃত

রূপ। Working Committeeর সভ্যরা বক্তব্য রাখেন। বেশীক্ষণ ধরে বক্তব্য রাখেন পণ্ডিত নেহেরু। পণ্ডিতজীর অসুবিধা হাজারো রকমের। তাঁর পূর্বের অনেক Commitment আছে। তিনি anti-facist, anti-nazi। তিনি আবার anti-imperialist। বৃটিশ আবার ঝুনো imperialist। তাহলে কি করা? নেহরু সব কথা উপস্থাপিত করেন, নাৎসী নীতির চরম বিরোধিতা করা দরকার—পোল্যাণ্ডকে বিনা কারণে আক্রমনের নিন্দা করেন। কিন্তু অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন ভারতবর্ষের ৪০ কোটী মানুষের মতের কোন মূল্য না দিয়ে ভারতবর্ষের তরফ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে? এর চেয়ে অপমান আর কি হতে পারে? এ অপমানের সমুচিত জবাব দেওয়া দরকার। মুস্কিল হল সে জবাব কেমন করে দেওয়া যায়! এখানে দার্শনিক জহরলাল দিশেহারা।

সুভাষচন্দ্র-ও তার বক্তব্য রাখেন। তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চান। ইংরেজ সাম্রাজ্যশাহীকে সরিয়ে দেওয়া তার একমাত্র কাজ। ইংরেজ যুদ্ধরত এক পক্ষ। এই যুদ্ধে রত অবস্থায় ইংরেজকে আঘাত হানতে হবে। ইংরেজ সাম্রাজ্যশাহীর দুর্বলগ্রন্থী ভারতবর্ষ। এই দুর্বলগ্রন্থীতে আঘাত হানতে হবে। সুভাষ এই যুদ্ধে বৃটিশের পরাজয় চান। বৃটিশ পরাজিত হলেই ভারত স্বাধীন হবে। অতএব anti-war এবং antitimperialist লড়াই ঘোষণা করা আশু কর্তব্য।

বক্তব্য রাখেন জয়প্রকাশ। জে. পি. বলেন এ লড়াই—দুটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিজোটের লড়াই। এর ভেতর কে ভাল কে মন্দ তা ভাবার কোন দরকার নেই। আর পিলসুড্স্কির পোল্যাণ্ড গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয়—আধা ফ্যাসিষ্ট। অতএব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হয়েছে—গণতন্ত্র বিপন্ন—এ সকল বিশ্লেষণ ঠিক নয়। ভারতবর্ষকে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে বৃটিশ। তার মতের কোন পরোয়া করেনি বৃটিশ। এ যেন বৃটিশের খাস তালুক। এ এক অসহনীয় এবং অপমানজনক অবস্থা. কংগ্রেস ইংরেজের যুদ্ধ প্রচেষ্টার সহায়ক কখনই হবে না। যুদ্ধের সময়ই আন্দোলন করা উচিত। সুভাষ ও জয়প্রকাশ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বিরোধী। গান্ধীও সকল যুদ্ধ বিরোধী।

গান্ধী কিছুটা ভৎ'সনার সুরে তাঁর বক্তব্য রাখেন। তিনি মনে করেন যে Working Committe-র খসড়া প্রস্তাবের লক্ষ্য দর কষাকষি (bargaining)। তিনি bargining এর ঘোরতর বিরোধী। কিন্তু ব্যক্তিগত এবং নীতিগত-

ভাবে তিনি যুদ্ধের বিরোধী। যুদ্ধ হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্লেষণের দিক দিয়ে তিনি সুভাষ এবং জয়প্রকাশের মতের কাছাকাছি। তিনি পোল্যাণ্ড আক্রমণকে গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ বলে স্বীকার করেন না। Working Ccmmitte কি করবে—তা তাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। একথা বলে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। তারপর পাশ হল সরকারী আপোষ প্রস্তাব।

প্রস্তাবের খসড়া করেন পণ্ডিতজী। তাতে ইংরেজকে war aim ঘোষণা করতে বলা হয়। এ যুদ্ধ যদি Freedom এবং Democracy র জন্য হয়—তাও পরিষ্কার করে বলা হোক। যুদ্ধাদর্শ ঘোষণা করার পরই কংগ্রেস তার নীতি নির্দ্ধারণ করবে।

নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন সুভাষচন্দ্র। ফিরে এসে আমাদের তুপুর রাত্রের সভায় সবকিছু রিপোর্ট করেন এবং ভবিষ্যৎ। কর্তব্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা করেন। এর পর বেড়িয়ে পড়েন সারা ভারতে প্রচারের কাজে। কয়েকবার সঙ্গে ছিলেন মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী। একবার ছিলেন আনন্দবাজার সম্পাদক সত্যেন মজুমদার। সত্যেনবাবু ছিলেন ঘোরতর সুভাষ বিরোধী। কিন্তু আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড পুরোপুরি সুভাষ সমর্থক।

সুরেশবাবু খাঁটি ধনিক বা মালিক কোনদিনই ছিলেন না। কাউকেই সরিয়ে দিতে চাইতেন না তিনি। তিনি সত্যেন মজুমদারকে এক বিচিত্র প্রস্তাব করেন—"সত্যেন, আনন্দবাজারের সম্পাদক হিসাবে তোমার নাম থাক্। তোমায় অফিসেও আসতে হবে না। বাড়ীতে বসে তুমি মাসের বেতন পাবে। সম্পাদকীয় ব্যাপারে তুমি হস্তক্ষেপ করবে না।" শেষ পর্যন্ত সত্যেন মজুমদার সুভাষচন্দ্রের সাথে বাংলার বাইরে ট্যুরে যান এবং স্বচক্ষে দেখেন—সুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তার প্রসার ও গভীরতা। ফিরে এসে সত্যেনবাবু কয়েকটি তথ্যপূর্ণ স্বাক্ষরিত প্রবন্ধও লেখেন আনন্দবাজার স্তম্ভে। সুরেশবাবু এইভাবে একটি মীমাংসার সূত্র খোঁজেন। কিন্তু সত্যেনবাবু এরপর আর বেশীদিন আনন্দবাজারে থাকেননি।

'৩৯ সালের শেষের দিকে ভারতরক্ষা আইনের বিধি নিষেধ খুব কড়াকড়িভাবে চালু হয়নি। তখনও সভা সমিতি করা বে-আইনী হয়নি।

ভারত সরকার কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনা শুরু করে। গান্ধীজীকেও আহ্বান জানান বড়লাট। গান্ধীর

মন তখনও কিছুই স্থির করতে পারেনি বলে আমার ধারণা। ট্রেনে যাচ্ছেন গান্ধী। সাথে তার প্রিয় একান্ত সচিব—মহাদেব। গান্ধীর ঘুমের কোনদিন অসুবিধা হয়েছে বলে জানা নেই। কিন্তু সেদিন ট্রেনে সত্যই নিদ্রা ভেঙেছে। মাঝরাতে উঠেছেন গান্ধী। মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন—মহাদেব, লুকায়ে যায় কথাটির মানে কি? তুমি কি গীতাঞ্জলি এনেছ সাথে? গুরুদেবের একটি গানে লুকায়ে যায়—এই কথাটি আছে। মহাদেব গীতাঞ্জলি আনেননি বলে জানান। মহাদেব ভালো বাংলা জানতেন—আর গীতাঞ্জলির ঐ গানটিও জানতেন। "জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো; সকল মাধুরী লুকায়ে যায়, গীতসুধারসে এসো।" গভীর রাতে ট্রেনের কামরায় রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত প্রার্থনা সঙ্গীত গুণ গুণ করে গেয়ে শোনান মহাদেব ভাই। মহাদেব ভাই এর মতন একান্ত সচিব পাওয়া দুর্লভ। মহাদেব ভাই কেবল একান্ত সচিব নন—গান্ধীর সকল চিন্তাধারা ও মানসিকতারও শরিক। মহাদেব যেমন নিখুঁতভাবে গান্ধীজীকে বুঝতেন এমন কোন কংগ্রেস নেতা বুঝতেন না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কোন ভালো একান্ত সচিব ছিল না। দেশবন্ধু গান্ধীজীর কাছে মহাদেবকে ধার চেয়েছিলেন। মহাত্মা বলেছিলেন তাঁর অমত নেই। মহাদেব রাজী হলেই হয়। মহাদেব রাজী হয়নি গান্ধীকে ছেড়ে যেতে। আগা খাঁ প্রসাদে মহাদেবের অকালমৃত্যু অত্যন্ত মর্মান্তিক। মহাদেবের মৃত্যুতে গান্ধীজীর জীবনী রচনার শ্রেষ্ঠ মানুষটির অভাব ঘটে।

বৃটিশ প্রতিনিধির সাথে আলোচনায় কোন নতুন আলোকপাত হয়নি। আর কি-ই বা হবে। বৃটিশ ভাইসরয় তো যুদ্ধরত কালে আপোষে সাম্রাজ্য ছেড়ে দেবে না—দিতে পারে না। ফিরে এলেন গান্ধী রিক্ত হাতে—কিন্তু সিক্ত চোখে নয়। ওয়ার্কিং কমিটিকে জানালেন সকল তথ্য।

যুদ্ধের ব্যাপারে গান্ধীজীর প্রতিক্রিয়া সুখকর নয়। ইংলণ্ডে তখন প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ হচ্ছে। ভেঙে পড়ছে শিল্প সম্পদ, কভেন্ট্রি, বার্মিংহাম প্রভৃতি ধুলিসাৎ, House of Parliament এবং West Minister Abeyর উপর বোমা বর্ষণের কথা শুনে তিনি লিখলেন—"I became disconsolate।" পরাধীন ভারত এ মানসিকতা পছন্দ করে না। ভারতবর্ষের মানসিকতা ঠিক বিপরীত। ইংরেজের ধ্বংস ও পরাজয়ের খবরে তারা উল্লসিত। তিনি লিখলেন—"I will not embarrass the Govt. during the

pendency of war." । এ ধরনের উক্তিতে স্তম্ভিত হয় ভারতবর্ষ। এ কি কথা ভারতের স্বাধীনতার সেনাপতির মুখে!

সেদিন সুভাষচন্দ্রের সাথে দেখা। আমি কিছুটা গান্ধীভক্ত। খানিকটা অন্ধবিশ্বাসের মণ্ডন। সুভাষচন্দ্র বললেন—"দেখলেন গান্ধীজীর উক্তি?"

সুভাষচন্দ্র বাংলার জিলায় জিলায় ঘোরার Programme নিলেন। ডিসেম্বরের শেষে তাঁর বরিশালে Programme। বরিশাল বন্ধুদের অনুরোধে আমি সুভাষচন্দ্রকে রাজী করাই। বরিশাল ছিল দুর্বল গ্রন্থী। যুগান্তর দল আগে থেকেই বিরুদ্ধে ছিল, কিন্তু পক্ষে ছিলেন সতীন সেন। ত্রিপুরীর পরে সতীনবাবুও বিরুদ্ধে গেলেন।

বরিশাল মিটিং

বরিশাল এক্সপ্রেসে রওনা হই। সন্ধ্যায় খুলনাতে পেঁছোই। খুলনা থেকে ষ্টীমার। খুলনা ষ্টেশনে এলেন—বন্ধুবর কিশোরী চ্যাটার্জী। কিশোরী বাবু সুভাষচন্দ্রের প্রথম সারির সমর্থক। সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিক সহকর্মীদের সাধারণত 'তুমি' বলতেন না। ছোটদেরও আপনি বলতেন। এর ব্যতিক্রম ছিলেন দু'জন। যদিও তারা বয়স্ক। কিন্তু তাদের 'তুমি' সম্বোধন করতেন সুভাষ। দুজন হলেন—খুলনার কিশোরী চাটার্জী এবং বহরমপুরের ছত্রপতি রায়।

বরিশাল নিয়ে যাচ্ছি। আমার কাঁধে গুরু দায়িত্ব। চারিদিক থেকে সুভাষকে অবনমিত করার চেষ্টা হচ্ছে। বরিশালে কি হবে ভেবে রাতে ঘুম হল না। শীতের রাত। শেষ রাতে ৪টা নাগাদ হুলারহাট ষ্টেশনে পৌঁছে মার্জারের মতন গোপন পদক্ষেপে একবার ফার্ষ্ট ক্লাশে যাই। উঁকি মেরে দেখি কি যেন লিখছেন। খুব সকালে পেঁছাই ঝালর কাঠি। ঐ শীতের ভোরেও বিরাট জনতা ষ্টেশনে উপস্থিত। ১০/১৫ মিনিট থামে ষ্টীমার। তারপর পাড়ি দিল নলছিটির দিকে। নলছিটি পেঁছাতে রোদ উঠল। ষ্টেশনে হাজার হাজার মানুষ সুভাষ দাঁড়ালেন এসে ডেকের উপর। জনতার একটি অংশ উঠে এল ফার্ষ্ট ক্লাশ ডেকে। এদের পুরোভাগে দেখি আমার পুরাতন সহকর্মী দিবাকর মুখার্জী। দিবাকর জংগী কর্মী। এসেই সুভাষচন্দ্রের সাথে আলাপ জমিয়ে দিল। ষ্টীমার বারংবার বিদায়ের বাঁশী বাজাচ্ছে। কিন্তু দর্শকরা নীচে নামছে না। তারা বলে ষ্টীমার আটকে দেব। খানিকক্ষন

পরে ষ্টীমার ছেড়ে দিল এবং সাথে চলল জনতার এক অংশ। তাদের সবার টিকেট ছিল বলে মনে হয় না। বরিশালে সাড়ে সাতটা নাগাদ পৌছালাম। রাজনৈতিক সম্বর্দ্ধনা বরিশালে। ছাপমারা কংগ্রেস কর্মীরা কেউ আসেনি। কিন্তু যুবকদের সংখ্যা অগুনতি। পুরোভাগে বরিশালের বর্ষীয়ান নেতা দেবেন ঘোষ, দেবকুমার ঘোষ প্রভৃতি তরুণ কর্মীরা। বিরাট শোভাযাত্রা শহর পরিভ্রমন করে পৌছালো কালিবাড়ী রোডে রোহিনী রায়ের বাড়ীতে। ওখানেই তিনি অতিথি।

রোহিনীবাবুর বাড়ীতে কিছুক্ষণ পরে এলেন সতীন সেন, সুরেশ গুপ্ত ও নগেন্দ্র বিজয় ভট্টাচার্য্য। এরা সকলেই প্রবীন নেতা। স্রেফ সৌজন্যমূলক সাক্ষাত করে। বিকেলে বাণীপীঠ ময়দানে বড় জনসভা সভায় দীর্ঘ বক্তৃতা করেন সুভাষ। একটি মানুষও সভা ছেড়ে ওঠেনি। পরের দিন সুভাষচন্দ্রকে ষ্টীমারে তুলে দিই। ব্যবস্থা হয় যে পরের দিন কিশোরী চাটার্জী খুলনাতে ওঁর দায়িত্ব নেবেন। অবসান হল—১৯৩৯ সাল।

১৯৪০

১৯৩৯-৪০ সাল। এ দুটি বছর ছিল সৃষ্টি সম্ভাবনায় ভরপুর। সমাজের থেকে নবজাতক ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঠিক আগের অবস্থা। ঘটনার বোঝার মত হৃদয় ছিল যাদের যারা কালের যাত্রার ধ্বনি শুনতে পান তারা মন দিয়ে এ গুঞ্জন অনুভব করেন। শুনতে পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর অলোকসাম্রাজ্য প্রতিভা দিয়ে—পেয়েছেন গান্ধী তাঁর অসাধারণ মানবপ্রীতি ও দরদী মন দিয়ে—পেয়েছেন সুভাষ তাঁর নিষ্কলুষ ভারতপ্রীতির মাধ্যমে। তিনটি মানুষের সৃষ্টিকর্মে ভরপুর এ দশক। রবীন্দ্রনাথের এ সময়কার কাব্যগাথা, আগষ্ট বিপ্লব ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর ভারতপ্রবেশ এ সকলই ঘটেছে—পরের পাঁচ বছরের মধ্যে। তিনটি মানুষের রাস্তা আলাদা, ভাষা আলাদা আলাদা এঁদের সৃষ্টিকর্ম। কিন্তু সকলের উৎসস্থান একই গোমুখ থেকে।

গান্ধী যাই বলুন না কেন বা ভাবুন না কেন, কংগ্রেস তার দর কষাকষির রাস্তায় এগোতে থাকে। প্রথম পদক্ষেপে আটটি রাজ্যের মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ ব্যাপারে গান্ধীর পরামর্শ কংগ্রেস পেয়েছে। গান্ধী হিংসাত্মক কাজে অসহযোগিতার নীতি অনুযায়ী এ কার্যক্রম গ্রহণ করেন—আর কংগ্রেস করে চাপ সৃষ্টি। এই দুটি মনোভাবই চলছে পাশাপাশি।

একটি যখন প্রবল আকার ধারণ করে, তখন অন্যটি পেছিয়ে যায়। ১৯৪২ সালের আগষ্ট বিপ্লব পর্যন্ত এ দুটি ধারা চলছে পাশাপাশি।

গান্ধীর কাছে যুদ্ধ হিংসাত্মক। তাঁর কাছে কোন যুদ্ধই সমর্থন যোগ্য নয় কারণ রক্তপাত ও হত্যা। ন্যায়যুদ্ধও সমর্থনযোগ্য নয়—কারণ, হিংসা। তার মানে এই নয় যে গান্ধী ন্যায়যুদ্ধের বিরোধী। ন্যায়যুদ্ধ করা সমাচীন—কিন্তু অহিংস পন্থায়। হিংসায় কোন মঙ্গল হয় না। হিংসাত্মক রাস্তায় কল্যাণকর লক্ষ্যে পৌঁছানো অসম্ভব। কর্মনীতির স্থান লক্ষ্যের অনেক উপরে। তিনি কেবলমাত্র সম্মুখের লক্ষ্যবস্তুটি দেখতে পান—তার বাইরে কিছুই দেখতে পান না। কতকটা পাহাড়ে ওঠার মতন। সম্মুখের উঁচু স্থানটিতে পৌঁছতে হবে। সেখানে পোঁছে আর একটি নতুন উঁচুস্থান খুলে যাবে। আবার সেটি দখল করতে হবে। এভাবেই জয়যাত্রা। গান্ধীর মতে one step is enough। তার কাছে end does not justify the means। এই হচ্ছে গান্ধীর নীতিধর্ম (ethics)। এই হচ্ছে তাঁর কর্ম কৌশল। অসাধারণ বিশ্বাস তাঁর সত্য ও অহিংসার উপর। তার মনোবৃত্তি আমরা আয়ত্ব করতে পারিনি। তার জন্যে তাঁর বক্তব্য মাঝে মাঝে পাগলের প্রলাপের মত মনে হত। Statesman কাগজ তাঁকে crank বলে গালি দিত। তার পরিচালিত ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের খবর দেওয়া হত "crank's corner"-এ।

পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সত্য উপলব্ধি করেন গান্ধী। তাই পরীক্ষামূলক কাজ ভুল প্রমাণিত হলে শিশুর মতন স্বীকার করেন তিনি—Himalayan Blunder। সিমলায় ওয়াভেল কন্‌ফারেন্সের সময় গান্ধীজীকে ঘিরে ধরে জনতা। বিরক্ত হন তিনি। রেগে একজন সাংবাদিকের ক্যামেরাটি ছিনিয়ে নেন। আমরা তখন ঢাকা জেলে। বন্ধুবর সুরেশ দাস একটি পত্র লেখেন গান্ধীকে। তার বয়ান খুব ছোট্ট : তুমি আমাদের প্রিয় নেতা—তোমার উপর আমাদের বিশ্বাস অন্তহীন। তুমি যদি সাধারণ মানুষের মতন ক্রুদ্ধ হও, তাহলে আমরা দাঁড়াই কোথায়! সাথে সাথে আপন হাতে হিজিবিজি অক্ষরে পোষ্টকার্ডে জবাব দেন। তার বয়ান হল—Dear Surish, I acted as an ass. Please depend. M. K. Gandhi। কী অসাধারণ স্বীকারোক্তি। মন কতখানি উঁচু পর্যায়ে উঠলে এ ধরণের উক্তি বের হয়। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব গান্ধীর নীতিতে পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন না। এমনকি সর্দার প্যাটেল ও রাজাজীও নয়। পণ্ডিত নেহেরুর প্রচণ্ড বিশ্বাস গান্ধীজীর

উপর। গান্ধীর সাথে নীতি নিয়ে সবচেয়ে বিতর্ক করছেন পণ্ডিত নেহেরু; কিন্তু চূড়ান্ত নির্দেশ মেনে নিয়েছেন সর্বদা। গান্ধীর মতবাদের পরিবর্তন ঘটায়নি তাঁর অন্ধ সমর্থকরা—কিন্তু প্রচণ্ডভাবে পরিবর্তন ঘটিয়েছেন পণ্ডিত নেহেরু, সুভাষ বোস, জয়প্রকাশ নারায়ণ।

রামগড় সম্মেলন

মন্ত্রীর গদি ত্যাগ করায় বৃটিশ কোনরূপ শঙ্কিত হয়নি। তারা নিজের রাস্তায় চলে। সর্বত্রই শাসনকর্তা গভর্নর ও তার কার্যকরী কমিটি। ভাইসরয় প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দেওয়ায় কোন ক্ষতিই হয়নি। কংগ্রেস নেতৃত্বকে এ অপমান হজম করতে হয়।

এদিকে সুভাষচন্দ্র একের পর এক সফর করে চলেছেন। '৪০ মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে কংগ্রেসের অধিবেশন হবে রামগড়ে। এবার মৌলানা আজাদ সভাপতি। সুভাষচন্দ্র ঠিক করেন যে কংগ্রেস সম্মেলনের ঠিক আগেই ঐ রামগড়েই একটি আপোষবিরোধী সম্মেলন করবেন। একটি গণসম্মেলন। এখানে Forward Bloc এবং সকল বামপন্থী দল ও গণসংগঠনের যোগদানের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু Left Consolidation Committeeর অপর তিনটি অংশ C. S. P., C. P. I এবং Royistরা এলো না। এলেন কেবল স্বামী সহজানন্দ। প্রস্তুতিপর্বে সুভাষচন্দ্র স্বয়ং খুবই পরিশ্রম করেছেন আপোষ-বিরোধী সম্মেলনের সফলতার জন্য। বাংলাদেশ থেকে কিছু কর্মী গেলেন। রমেশ আচার্য ছিলেন তাদের ভারপ্রাপ্ত নেতা।

আমরা বাতিল B. P. C. Cর অফিস নিয়ে যাই রামগড়ে। সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা হয় রামগড় ষ্টেশন থেকে। বিকালে জনসমাবেশও হয় বিরাট। সুভাষচন্দ্র তাঁর বক্তব্য রাখেন আর একবার। তখনও ডানকার্কের বিপর্যয়—নরওয়ের পতন হয়নি। কিন্তু সুভাষচন্দ্র জোরের সাথে বলেন যে ইংরেজ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। এখনও সময় রয়েছে লড়াই করার। সকল বামপন্থী শক্তিকে আপোষের ষড়যন্ত্র জাল ছিঁড়ে ফেলে দিতে আহ্বান জানান।

আপোষ বিরোধী সম্মেলনের মূল প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর প্রচণ্ড ঝড় ও বৃষ্টি শুরু হয়। ঐ দিনই কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন। কিন্তু সম্মেলন হতে পারে নি। বন্যায় ভেসে গেল প্রকাশ্য অধিবেশন।

রাজনীতির নতুন অধ্যায়

সব দিক দিয়ে রামগড় একটি বিশিষ্ট অববাহিকার মতন। এ সময় রাজনৈতিক আন্দোলন দুটি অলিখিত ভাগ হয়ে যায়। একদিকে সরকারী কংগ্রেস, অন্যদিকে বামপন্থীরা। কিন্তু কংগ্রেসের ভেতরকার সকল প্রগতিশীল ও সংগ্রামী শক্তি কংগ্রেস ছেড়ে আসেনি। এমনকি সুভাষ সমর্থকরাও সবাই কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসেনি। বাংলার বাইরে ফরওয়ার্ড ব্লকও কংগ্রেসের ভেতরে কাজ করেছে। সুভাষচন্দ্র দেশের মানুষকে আশু সংগ্রামের জন্য আহ্বান করেছেন, কিন্তু কংগ্রেস ছাড়ার নির্দেশ দেননি। হয়তো তা সম্ভব ছিল না। কংগ্রেসের ভেতর বহু মানুষ ছিলেন যারা দেশের স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। সুভাষচন্দ্রের বামপন্থী নেতৃত্ব বাইরে থেকে সংগ্রামের ডাক দেওয়ায় ভেতর থেকে কংগ্রেসের উচ্চতম কর্তৃপক্ষের উপর বিরাট চাপ সৃষ্টি হয়। ফলে কংগ্রেসের সংগ্রাম বিমুখতা ও ভুলাভাই দেশাই প্রভৃতিদের আপোষ চেষ্টা বন্ধ হয়ে যায়। কংগ্রেসও কার্যকরীভাবে কিছু করার দিকে মন দেয়।

বিপ্লবীদের পক্ষেও রামগড় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আপোষবিরোধী সম্মেলন উপলক্ষ্যে অনুশীলন দলের কর্মীরা একত্র হয়ে বিপ্লবী সমাজবাদী দলের প্রতিষ্ঠা করে ১৯শে মার্চ। ১৯৩০ সাল থেকে দলের ভেতর খুব চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। দেশের ভেতরে ও বাইরে আলোচনা চলে। দুটি প্রশ্ন; আদর্শ এবং সংগঠন, দলের পরিধি।

বাংলায় যুগান্তর অনুশীলন ও অন্যান্য সব দলই জাতীয়তাবাদী দল। সেদিন জাতীয়তাবাদী হওয়াই যুগধর্ম। ইংরেজ সরকারের আশু উচ্ছেদই হল বড় কথা। কিন্তু জিজ্ঞাসু মনের কাছে প্রশ্ন উঠেছে, স্বাধীন ভারতবর্ষের রূপরেখা কি হবে? সামাজিক বিন্যাস হবে কি ধরণের—খুবই যুক্তিযুক্ত আর একটি প্রশ্ন, বর্তমানে যা দলের পরিধি—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের কার্যকরী হাতিয়ার কিনা। অর্থাৎ অনুশীলন সমিতি এককভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারবে কি না। যদি না পারে তাহলে কি করা? পার্টি উদ্দেশ্য সিদ্ধির সফল হাতিয়ার না হলে তাকে উদ্দেশ্য হাসিল করার মতন করে ঢেলে সাজাতে হবে—নতুবা পার্টিকে অন্য সর্বভারতীয় পার্টির সাথে বিলীন

করে দিতে হবে। সংগঠনের প্রসার করার জন্যে কি আবার যুগান্তর ও অন্যান্য দলের সাথে ঐক্য প্রচেষ্টা হবে? আর সেই ঐক্য কি আদর্শভিত্তিক হবে? যদি আদর্শভিত্তিক হয় তাহলে সকল গোষ্ঠির আদর্শ কি এক? অনুশীলনের সভ্য হিসাবে আমি জানি, সমাজবাদই দলের লক্ষ্য হওয়া উচিত এটাই সকলের মত। বয়ঃজ্যেষ্ঠ নেতারা মোটামুটিভাবে তা মেনে নিয়েছেন। প্রশ্ন হল, সমাজবাদের ভিত্তিতে অন্যান্য দলের সাথে ঐক্য সম্ভব কি না। অন্যান্য দলের ভেতরকার খবর খুব বেশী না জানলেও বন্দীনিবাসে একত্র থাকার সূত্রে পড়াশুনার ধরণধারণ, Study Circle থেকে কিছুটা বোঝা যেত। মনে হয়েছে বিপ্লবী সমাজবাদ—যা মার্কসবাদ থেকে অভিন্ন সব দল গ্রহণ করবে না। এর অনেক কারণ। ১৯৩০ সালে বক্সা বন্দীনিবাসে ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন গুপ্ত, সুরেন ঘোষ, প্রতুল গাঙ্গুলী, অরুণ গুহ, রবি সেন, ভূপতি মজুমদার, অতীন রায়, ভূপেন দত্ত প্রভৃতি বর্ষীয়ান নেতৃবৃন্দ ছিলেন। কিন্তু অনুশীলনের বাইরে সমাজবাদ সম্পর্কে তেমন কোন আগ্রহ দেখিনি।

আমার ধারণা হয়েছিল, বাংলার বিপ্লবীরা আলাদা থেকে কার্যকরী-ভাবে তেমন কিছু করতে পারবে না। বিশেষত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন করার যে গুরুদায়িত্ব, সারা ভারতের ক্ষেত্রে সে দায়িত্ব বহন করার ক্ষমতা বাংলার বিপ্লবীদের নেই। বাংলার বিপ্লবীরা আদর্শ চরিত্রের মানুষ। তাদের সাহস, আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠা তুলনাহীন। কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন করার ব্যাপার একটু আলাদা। গান্ধী, তিলক, সুভাষচন্দ্র ও দেশবন্ধুর মতন মানুষ হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। সারা বাংলা তথা ভারতের নেতৃত্ব নেওয়ার মতন মানুষ বিপ্লবীদের ভেতর ছিল না।

আমার জিজ্ঞাসু মনে প্রশ্ন ছিল, অনুশীলন দল যদি পুরোপুরি মার্কসবাদ গ্রহণ করত তাহলেও সারা ভারতের সমাজবাদী আন্দোলনের mainstream হতে পারবে কি না সন্দেহ অতএব অনুশীলন দলকে কোন সর্বভারতীয় দলের সাথে যুক্ত হতে হবে। কিন্তু গোষ্ঠি মন সহসা যায় না। শুধু নেতৃবৃন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—সাধারণ কর্মীদের মধ্যেও এর প্রভাব প্রচণ্ড। অনুশীলন দলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির কর্মীদের আগ্রহ C. S. P.-র সাথে বিলীন হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এবং কাজও হয়। কিন্তু ত্রিপুরীর পর থেকে শত চেষ্টা করেও C. S. P.-র সাথে থাকা

সম্ভব হল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার জন্যে আমাদের দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আমরা সুভাষচন্দ্রের অনুসৃত কার্যক্রম নেয়ার পক্ষে ছিলাম। আমরা C. S. P.কে সুভাষচন্দ্রের দিকে টেনে আনতে ব্যর্থ হই। C. S. P.-র আভ্যন্তরীন অসুবিধা ছিল অনেক। তারা দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে সকলে একমত ছিলেন না। নেতৃত্বের ভেতরই এ ব্যবধান। মাসানি, অশোক মেহতা, পট্টবর্দ্ধন ও ডঃ লোহিয়া মোটামুটিভাবে এক মতের। জয়প্রকাশ ও আচার্য নরেন্দ্র দেও ছিলেন ভিন্ন মতের। কিন্তু সুভাষবাবুর ব্যাপারে তারা বিরোধ করতে চায়নি। আমাদের ব্যর্থতার জন্য আমরা সুভাষচন্দ্রের কাছে খানিকটা অপ্রস্তুত হই। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর J. Pর মতও সুভাষচন্দ্রের কাছাকাছি আসে। সরকারী কংগ্রেস কার্যকরীভাবে আর কিছু করবে না এমনি বিশ্বাস জন্মেছিল তার সমস্ত সংগ্রামের প্রস্তুতির ব্যাপারে J.P আমাদের সাথে একমত হন। J. P. কয়েকবার আসেন বাংলা দেশে। সুভাষচন্দ্রের সাথেও দেখা করেন কয়েকবার। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ কোন কাজ হয়নি অতএব আমরা প্রাক্তন অনুশীলনের কর্মীরা সম্পর্ক ত্যাগ করি C. S. Pর সাথে। U. P. ও বিহারের সাথীরাও C. S. P. ছেড়ে দিলেন। উত্তর প্রদেশে আমরা যোগেশ চ্যাটার্জীর উপর নির্ভর করতাম খুবই। যোগেশববাবু উত্তর প্রদেশের জনপ্রিয় নেতা। যোগেশবাবু রাজী হওয়ার পর অনুশীলন কর্মীরা রামগড় সম্মেলনে মিলিত হয়ে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠা করে ১৯শে মার্চ। পার্টির সম্পাদক হন যোগেশ চ্যাটার্জী।

বিপ্লবী সমাজবাদী দলের জন্ম হল। নতুন দল প্রতিষ্ঠা হওয়ায় একটি উদ্দেশ্য সফল হল। তা হল ভূতপূর্ব অনুশীলন সরকারীভাবে মার্কসবাদী সমাজতন্ত্র নীতি হিসাবে গ্রহণ করে। এটি একটি বড় পদক্ষেপ। বিপ্লবীদলের ভেতর নানারকম shade থাকে। অনুশীলনেরও ছিল। এতে একদিকে যেমন সর্বক্ষণের ব্রতী কর্মী ছিল—অন্যদিকে চতুর ব্যবসায়ী কর্মীও ছিল। তাদের কাছে রাজনীতির চেয়ে ব্যবসাই অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ।

আদর্শের দিক দিয়ে জয় হলেও আমার মন ভরল না। আমার এ দৃঢ় ধারণা হল যে অনুশীলনের অবলুপ্ত হল ঠিকই, কিন্তু যে সংগঠন তৈরী হল তাতো খুবই ছোট। ভারতবর্ষের সমস্যা বিবিধ ও বিচিত্র। এর ভিন্ন সংস্কৃতি। ভিন্ন ভাষা, প্রদেশিকতা, সামাজিক জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, হরিজন, আদিবাসী প্রভৃতি দুরুহ এবং বিশাল সমস্যা। এ ছোট গোষ্টি যতই

আদর্শবাদী ও ব্রতী (dedicated) হোক না কেন ছোট সংগঠন দিয়ে তার সমাধান করতে পারবে কিনা সন্দেহ। রাজনীতিতে নির্ভুল নীতি আবিষ্কার করা এক, আর তা কার্যায়িত করা ভিন্ন কথা কি বলা হল—এর যেমন একটা দিক—কিন্তু কে বলল তার অন্য দিক Dimension রাজনীতিতে বড় কথা। ব্যক্তিও বড় কথা।

সুভাষচন্দ্র ফিরে এলেন রামগড় থেকে দ্বিগুন উৎসাহ নিয়ে। আপোষ-বিরোধী সম্মেলনে সফলতা সকলের মনে এক নতুন প্রেরণা আনে। রামগড়ের মঞ্চ থেকে তিনি জাতীয় সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন। National struggle হবে। তার মুখ্য slogan হল—All power to the people। Slogan তো ঠিক হল। কিন্তু গণ আন্দোলনের রূপ ঠিক করা খুব কঠিন ব্যাপার। এর জন্যে অনন্য সাধারণ শক্তি থাকা দরকার। তা সবার থাকে না। ৩৮।২ এলগিন রোডের ঘন ঘন সভা হতে থাকে। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারা যায় নি।

ঠিক হল প্রাদেশিক সম্মেলন ডাকা হোক। এর মাধ্যমে জনসমর্থন ও জনমতের আভাষ পাওয়া যাবে। সম্মেলন ডাকা হল ঢাকায়। রবিদা দায়িত্ব নিলেন। R. S. P. দলের উপর খুবই নির্ভরশীল সকলে। সভাপতি নির্বচিত হলেন অধ্যাপক জ্যোতীষ ঘোষ। সম্মেলনের জন্য খুব তোড়জোড় হল। বাংলাদেশে যুগান্তর দল প্রভাবিত Ad hoc-এ B. P. C. C.র কোন প্রভাব ছিল না। সাধারণ মানুষ বলত ঢক্ ঢক্। এ কমিটির নেতৃত্বে প্রফুল্ল সেন, প্রফুল্ল ঘোষ পরিচালিত খাদি গ্রুপ ছিল না। এমন কি কিরণশঙ্কর রায়ের নিজস্ব দলও খুব কম ছিল। সভাপতি ও সম্পাদক দুজনই যুগান্তর দলের।

ঢাকা মেইলে সুভাষচন্দ্র তারপাশা ষ্টেশনে এসে ষ্টীমারে ওঠেন। আমাদের কাছ থেকে সব খবর নেন। তিনি কিছুদিন আগে পূর্ব বাংলা সফরে বের হন। ষ্টীমারে একটি প্রচার পুস্তিকা দেখানো হয় তাকে—আর দেখানো হয় একটি কার্টুন। কার্টুনটির বক্তব্য বিষয় হল, কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র যোশী চরকা কাটছেন আর রামধুন গাইছেন। এ কার্টুনটি স্নেহাস্পদ বন্ধু ও সহকর্মী ত্রিদিব চৌধুরীর পরিকল্পনা। সুভাষচন্দ্র হেসে কুটিকুটি।

ঢাকায় খুব সমারোহ করে সম্মেলন হয়। সুভাষচন্দ্র টাঙ্গাইল বিধানসভার সদস্য চারু রায়ের ৭নং র‍্যাংকিন ষ্ট্রীটের বাড়িতে ছিলেন। সম্মেলনে কতকগুলি

প্রস্তাবের মধ্যে হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ করার একটি প্রস্তাব পেশ হয়। বিরাট প্রকাশ্য জনসভায় সুভাষচন্দ্র জাতীয় সংগ্রামের কথা ঘোষণা করেন। তিনি কণ্ঠস্বর উঁচু করে একসময় ইংরাজীতে বলেন—I want the defeat of Britain today--this night—this hour. প্রাদেশিক কমিটির দপ্তর নিয়ে ফিরে আসি আমরা। ফেরার সময় দেখলাম গোয়েন্দা পুলিশ সারে সারে যাচ্ছে আমাদের সাথে। ব্যাপকভাবে পুলিশের অনুগমন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ, B. V. Group-এর নেতৃত্বস্থানীয় সবাইকে এর পূর্বে গ্রেপ্তার করেছে সরকার। হেমদা—সত্যরঞ্জন বক্সীর অভাব আমরা তীব্রভাবে বোধ করেছি সম্মেলনের সময়। কারণ সরকারী কংগ্রেস থেকে একত্র হয়ে আমরা বেরিয়ে এসেছি—কিন্তু বিদ্রোহী কংগ্রেসের প্রথম সম্মেলনে তাদের অনুপস্থিতি খুবই বেদনাদায়ক।

ওই সময় কর্পোরেশনের নির্বাচন নিয়ে খুব দর কষাকষি শুরু হয়। এলগিন রোডের বাড়ীর রুদ্ধ কক্ষে সকল দলের সাথে আলোচনা চলে। কোন আদর্শ বা নীতির প্রশ্ন ছিল না। নিছক কর্তৃত্ব করা। এলো হিন্দু সভা—এলো মোসলীম লিগ। সুভাষচন্দ্র আমাদের গোপন বৈঠকে আলাপ আলোচনার কিছু আভাষ দিতেন। শেষ পর্যন্ত তিনি মোসলীম লীগের সাথেই সমঝোতা করেন। আবদুর রহমান সিদ্দিকি ও ইসপাহানির সাথে চূড়ান্ত চুক্তি সই হয়। এ নিয়ে কলকাতায় বিরাট আন্দোলন শুরু হয়। এদের প্রধান বক্তব্য যে লীগ সাম্প্রদায়িক পার্টি—সুভাষচন্দ্রের পক্ষে তাদের সঙ্গে চুক্তি করা ঠিক হয়নি। সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য যে হিন্দু সভা ও মোসলীম লীগ উভয়ই সাম্প্রদায়িক। এদের ভেতর একটিকে বাছাই করতে হবে কর্পোরেশন চালাবার জন্য। তখন লীগ পাকিস্থান প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। এখানে মুসলমানদের সাথে সহযোগিতায় হয়তো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল সুভাষচন্দ্রের। দেশবন্ধু বেঙ্গল প্যাক্ট প্রতিষ্ঠা করে হিন্দু মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তা রূপায়িত করা সম্ভব হয়নি। ১৯৪০ সালে ১৯২৪ সাল নয়। সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর নীতি রূপায়িত করতে চাইলেন। তিনি জাতীয় কংগ্রেসের মোসলীম ঐক্য নীতির উপর অসন্তুষ্ট। তিনি কয়েকবার জিন্নার সাথে দেখাও করেন। জিন্না সুভাষচন্দ্রকে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্বের উপর আস্থা ছিল না তার। তার অভিযোগ ছিল যে কংগ্রেস নেতৃত্ব সত্য সত্যই মোসলমানদের

সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করতে চায় না। ১৯৩৭ সালে উত্তরপ্রদেশ মন্ত্রী-সভায় আলিকুজ্জামান প্রভৃতিকে যুক্ত না করার জন্যে পণ্ডিত নেহরুর উপর ওদের অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়।

রামগড়ের পর কাজের চাপ খুব বেড়ে যায়। সরকারী কংগ্রেসের বিরোধী আমরা। বেশী লোক আর অর্থ সাহায্য করেনা। বি·পি·সি·সি· চালানো খুব দুষ্কর হয়ে পড়ে। প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীটের অফিসের দু'শ টাকা ভাড়া জোগানো কষ্ট ছিল—অফিস খরচ ও কর্মীদের বেতন জোগাতে হিমসিম খেতে হত। B.P.C.Cর নিজস্ব কোন আয় ছিল না। সকল দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের উপর। অফিসের তরফ থেকে তারকদা ও আমি যেতাম এলগিন রোডে। কোনদিন রিক্ত হাতে ফিরে আসিনি। সুভাষ-চন্দ্রের আর্থিক টানাটানি চাপা থাকত না। এমনি পরিস্থিতিতে সুরেশ মজুমদার ৫ নং ভবানী দত্ত লেনে তার নিজের বাড়ীতে আমাদের অফিস স্থানান্তরিত করার প্রস্তাব দেন। আমরা দু'শ টাকার দায় থেকে বাঁচলাম। কিন্তু তা ছাড়াও খরচ ছিল। সুভাষচন্দ্রের জন্য জনসভা এবং সংগঠন করা। আমাদের জনসভায় dias দিত মহম্মদ ইয়াসিন আর mike দিত G. S. Emporium। সব সময় এদের টাকা দেওয়া সম্ভব হত না।

বিকেলের দিকে অফিসে কিছুটা ভীড় হত। কমিটির সাধারণ সম্পাদক তখন জেলে। চৌধুরী সাহেব ও মহারাজ তখন চট্টগ্রামে এক জনসভায় বক্তৃতা দেবার জন্য গ্রেপ্তার হন। তার স্থানে তারক বন্দোপাধ্যায় সম্পাদক নির্বাচিত হন। যুগ্ম সম্পাদক ছিল ৫ জন। তার মধ্যে পাঁচু ভাদুড়ি ও গোপাল হালদার আর আসতেন না। আসতেন তিনজন কালী বাগচী, কেষ্ট চ্যাটার্জী ও আমি। হরেনদা মোটা চুরুটটি মুখে দিয়ে প্রায় রোজই আসতেন। কেষ্টবাবু তার সাথেই আসা যাওয়া করতেন। তারকদা অনেক সময় তার জিলার কাজে আটকা পড়তেন। রাজেনদা তার ঠনঠনিয়ার বাড়ী থেকে পায়ে হেঁটেই আসতেন। বিধান সভার সভ্যরাও আসতেন কেউ কেউ।

তখনকার সমর্থনের তিনটি ধারা। M. L. A রা যেতেন শরৎবাবুর বাড়ী উডবার্ন পার্কে। কর্পোরেশনের কাউন্সিলররা যেতেন এলগিত রোডে সুভাষচন্দ্রের কাছে। আর অগণিত সুভাষ সমর্থক কর্মীরা আসতেন বি· পি· সি· সি· অফিসে। প্রথম শ্রেণীর ভেতর দু' একজন হয়তো বা অফিসে আসতেন, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা আমাদের মানতেন না। তাদের

পলিটিক্স্ ছিল অন্য ধরণের। বি. পি. সি. সি. বাতিল হলেও কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টি বাতিল হয়নি তখনো। শরৎবাবুই নেতা। তখনকার কংগ্রেস পার্টিতে 'অনেক দিকপাল সদস্য ছিলেন। তুলসী গোস্বামী, রায় হরেন চৌধুরী, সন্তোষ বোস, সত্যপ্রিয় ব্যানার্জী প্রভৃতি। কংগ্রেস পার্টির বাইরে বিরোধী পক্ষে সবচেয়ে Stalwart ছিলেন ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, সরকারী পক্ষে ফজলুল হক্, সহিদ সারওয়ার্দী, সিদ্দিক প্রভৃতি।

তখনকার বিধানসভা জমজমাট। একদিকে স্বয়ং হক সাহেব ও সারওয়ার্দি, অন্যদিকে শরৎবাবু, তুলসীবাবু ও ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ। ফজলুল হকের মত পরিশীলিত সুবক্তা কম দেখেছি। একটি দিনের কথা মনে পড়ে। যুদ্ধ প্রস্তাব (war resolution) নিয়ে আলোচনা। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ভারতের উপর জোর করে চাপিয়ে দেবার সমর্থনে বলা খুব শক্ত। কিন্তু হক্ সাহেব বাগ্মীর কায়দায় কাকটিকে ময়ূর সাজালেন। সাজালেন ঠিকই কিন্তু নকল সাজান ময়ূরের পুচ্ছ শরৎবাবু একটির পর একটি খুলে ফেলেন। তুলসীবাবু ও সারওয়ার্দির মতন ইংরেজীতে সুবক্তা খুবই বিরল। হক্ সাহেব ও শরৎবাবু প্রধানত পার্লামেণ্টারিয়ান। ডাঃ মুখার্জীর বয়স তখন মাত্র ৩৭।

নয়ঃ নতুন দলের প্রস্তাব

কতকগুলি জরুরী ঘটনার চাপ আমাদের উপর ছিল। ইয়োরোপের যুদ্ধে হিটলারের দ্রুত অগ্রগতি ও ডানকার্কে ইংরেজের শোচনীয় পরাজয় ভারতবর্ষে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রশ্নটি বিরাট আকারে দেখা দিল, Theory and Strategyর দিক দিয়ে আশু নীতি নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ প্রচেষ্টার উপর চরম আঘাত হানা Transform the Imperialist war into civil war—এই তো R. S. P.র নীতি। কিন্তু R. S. P. তার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে কী করতে পারে! রুশ-জার্মান নন-এগ্রেশান প্যাক্ট্ সই হওয়ার পর কম্যুনিষ্ট পার্টি মরিয়া হয়ে ক্ষমতা দখলের প্রোগ্রাম কার্যান্বিত করল না। তারা তখনও Popular front, anti-fascism থেকে সরে আসতে পারেনি অথবা চায়নি। বিশ্বের অনেক কম্যুনিষ্ট পার্টি ১৯৩৯ সালে মলোটভের হিটলার জার্মানির সাথে চুক্তিতে স্তম্ভিত ও বিব্রত। R. S. P. কর্মীরা C. P. I. এর সাথে আলাপ আলোচনা চালায়। National Struggle এর আহ্বান জানাতে অস্বীকার করে। তাদের বক্তব্য যে তখনও Local Partial struggleএর অধ্যায় চলছে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময় R. S. P.র নীতি ছিল আশু জাতীয় সংগ্রাম শুরু করা। বিরোধ হল National vs local struggle এর। সুভাষচন্দ্রের সাথে এখানেই বিরোধ। এই issueর উপর সুভাষচন্দ্রের সাথে C. P. I. এর কার্যকরী সম্পর্ক ছিন্ন হয়।

আমরা দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত করি যদি সুভাষচন্দ্র সশস্ত্র বিপ্লবের দল গড়তে রাজী হন—তাহলে তাঁর নেতৃত্বে নতুন দল গঠন করব। রবিদা, প্রতুলদা ও রমেশদা সুভাষচন্দ্রের সাথে কথা বলেন। অনুশীলন দল তথা R. S. P. সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে নতুন বিপ্লবী দল গঠন করতে চায়। আমাদের প্রস্তাব নিঃসর্ত। পুরানো অনুশীলন দল লুপ্ত করে নিঃসর্তে তাঁর নেতৃত্বে দল গঠন করতে রাজী শুনে খুব অভিভূত হন সুভাষচন্দ্র। তিনি দু'দিন সময় নেন। এর ভেতর তিনি আরো কয়েকটি গোষ্ঠির সাথে কথা বলেন।

দুদিন পরে আবার সুভাষচন্দ্র R. S. P.-র নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করেন। সেদিনের সভায় ত্রিদিব চৌধুরী ও আমি ছিলাম। Forward Bloc-এর ভূমিকা সম্বন্ধেও আলোচনা হল। তিনি Forward Bloc

সম্বন্ধে কিছুটা নিরাশ ছিলেন। Forward Bloc তার মনোমত হয়ে গড়ে ওঠেনি। তিনি গোপন দল গড়তে রাজী হন। সাথে সাথে তার পরিকল্পনার কিছুটা আভাষ দেন। Forward Bloc বাইরে প্রকাশ্য পার্টি থাকবে—আর পেছনে থাকবে গোপন বিপ্লবী দল। তার জন্যে কাদের কাদের ডাকা হবে—তার আভাষ দেন। শ্রীসত্যরঞ্জন বক্সী তখন জেলে, তাঁর অনুপস্থিতিতে অসুবিধার কথা বলেন। B. V.-এ দলে থাকবে—তা সুনিশ্চিত। যারা বাইরে ছিলেন তাদের খবর দেওয়া হবে। ফণী মজুমদারের কথা ওঠে। ওঠে দেবেন দেকে নেওয়ার কথা। দেবেন দে তখন C. P. I. এর সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে দিয়েছে। হেমন্তবাবু ও অমরদার (বসু) সাথে আলোচনা করাবেন। নীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের কথাও ওঠে।

সংবিধান ও নীতিকর্তব্য সম্পর্কে একটি খসড়া তৈয়ারী করার জন্য ত্রিদিব ও আমার উপর ভার ছিল। আমরা ২।৩ দিন পরে খসড়া দুটি তাঁর হাতে দিয়ে আসি। তিনি দেখার জন্যে রেখে দেন। কয়েকদিন পরে এ সম্পর্কে আলোচনা হয় তাঁর সাথে। তিনি আমাদের পরিকল্পিত সংবিধানের পক্ষে ছিলেন না। আমরা সভাপতি, সম্পাদক, সহ সম্পাদক নিয়ে একটি কার্যকরী কমিটির সুপারিশ করি। সুভাষচন্দ্রের সংগ্রামী পার্টির পরিকল্পনা সেদিন প্রথম শুনতে পাই। উত্তরকালে তিনি তা রূপায়িত করেন ভারতবর্ষের বাইরে গিয়ে। তাঁর বক্তব্য হল পার্টির প্রধান হবে Leader তারপর Deputy Leader, এই অর্ডার মাফিক হবে পার্টি। নীতি বক্তব্য সম্পর্কে তার মতামত, সোস্যালিজম আদর্শ হবে। কিন্তু আমরা যেভাবে রচনা করছি তার আদল বদল করার পক্ষপতী তিনি। বিশেষ করে Dictatorship of the proletariat সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা হয়। আমাদের interpretation শোনেন। কিন্তু তিনি ঐ কথাটি না রাখার জন্যে উপদেশ দেন। তিনি জানান, নাগপুরে Forward Bloc-এর জাতীয় সম্মেলন হবে, সেখানে Forward Bloc-এর লক্ষ্য হিসেবে socialism গ্রহণ করা হবে। সারা ভারতে ফরওয়ার্ড ব্লকে নানান মতবাদের মানুষ রয়েছে। কোন jargon ব্যবহার না করে socialism গ্রহণ করেন তিনি। আদর্শ ও বাস্তববুদ্ধির অদ্ভুত সংমিশ্রণ ছিলেন সুভাষচন্দ্র। সেদিন তাঁর বাস্তবধর্মীর বক্তব্য শুনে তৃপ্ত হইনি। মনে নানান ভাবনা উঁকি দিয়েছে। আমরা শেষ পর্যন্ত তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিই।

ত্রিপুরী ও রামগড়ের ব্যবধান দুস্তর। ত্রিপুরীর সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়নি, কিন্তু রামগড়ের সময় হয়েছে। তারপরে তো তড়িৎ গতিতে হিটলারের Panzer corps-এর সামনে মিত্রশক্তি পর্যুদস্ত। সুভাষচন্দ্র ঠিক করে নিয়েছিলেন যে এই সুসময়। এর পূর্ণ সুযোগ নিতে হবে। যদি এ সুযোগ হারান, তাহলে তাঁর জীবনে আর হয়তো ভারত স্বাধীন হবে না। এক একটি দিন যাচ্ছিল আর তাঁর সঙ্কল্প সুদৃঢ় হচ্ছিল। তাঁর সাথে আলোচনা থেকে এই আভাষ পেতাম। মনের ভেতর অস্থিরতা ও অসহিষ্ণুতার আলোড়ন প্রতিটি কথায়।

একটি ছোট্ট ঘটনা উল্লেখ করার মতো। এসময় Sir Strafford Cripps ভারতবর্ষে আসেন। মহাত্মাজী ও পণ্ডিত নেহরুর সাথে দেখা করে কলকাতা আসেন। কলকাতায় J. C. Gupta-র অতিথি ছিলেন তিনি। Cripps বৃটিশ শ্রমিক দলের প্রথম সারির নেতা। তখনও নরওয়ের পতন ঘটেনি। তিনি সুভাষচন্দ্রের সাথে দেখা করতে চান। কিন্তু সুভাষচন্দ্র এড়িয়ে যান। বন্ধুরা তার সাথে দেখা করার জন্য পরামর্শ দেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র হিমালয়ের মতন অটল। তিনি বন্ধুদের বলেন যে ইংরেজদের সাথে দেখা করার ইচ্ছে তার নেই—সে ইংরেজ যদি Lord Parmoor-এর ছেলে হন তাহলেও না। Cripps যাবার সময় একটি পত্র দেন সুভাষকে। তাঁকে তিনি জানান যে তিনজন মানুষের সাথে দেখা করার জন্যে ভারতে এসেছিলেন তিনি। দুজনের সাথে দেখা হয়েছে, কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তির সাথে দেখা না করেই ফিরে যাচ্ছেন তিনি। সুভাষচন্দ্রের ধারণা ছিল যে Cripps কোন আপোষ প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন—সে প্রস্তাবের বিরোধী দল শ্রমিক পার্টির। শ্রমিক দলের প্রস্তাব হয়তো টোরী পার্টির প্রস্তাবের চেয়ে খানিকটা উদার ভাবাপন্ন—কিন্তু সাম্রাজ্যিক স্বার্থহীন নয়। ইংরেজমাত্রই সাম্রাজ্যবাদী।

Forward Bloc সম্মেলনের জন্য প্রস্তুতিপর্ব চলে দ্রুত গতিতে। একে সার্থক করার জন্যে তিনি একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনজনের একটি বিশ্বস্ত দল সারা ভারত ঘুরবে। তারা প্রতি প্রদেশে ও কেন্দ্রে সুভাষ সমর্থকদের বিশেষ করে ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মীদের নাগপুর সম্মেলনে সমবেত হওয়ার জন্যে আবেদন জানাবে। তার জন্য সুভাষচন্দ্র প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র দিয়েছিলেন। একজন কর্মী বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব

হয়ে সীমান্ত প্রদেশ পর্যন্ত যাবেন। আর একজন মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাই প্রদেশে। তৃতীয় জন দক্ষিণ ভারতের দিকে। এ জন্য ২ জন কর্মী আমাদের কাছে চান। এ দুজন উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সুভাষচন্দ্রের বার্তা নিয়ে যাবেন। উত্তর ভারতে পাঠানো হল বর্তমান সংসদ সদস্য ত্রিদিব চৌধুরীকে আর দক্ষিণ ভারতের জন্য তরুণ কর্মী নীহার রঞ্জন রায়কে। মধ্য প্রদেশের ব্যবস্থা বোধহয় মুকুন্দ সরকার করেছিলেন।

সমারোহ করে নাগপুরে সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্মেলন হল। রুইকারের উপরই ছিল সকল দায়িত্ব। রুইকার প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা। তিনি সুভাষ সমর্থকদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর মানুষ—জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের মতাবলম্বী ছিলেন।

দশ ঃ গান্ধীর নতুন চিন্তা

রামগড় সম্মেলনের পর সরকারী কংগ্রেস কতকটা নীরব ছিল। মহাত্মা গান্ধী তখন আবার ধীরে ধীরে কংগ্রেসের হাল ধরা শুরু করেন। মহাত্মার সচল মন। যুদ্ধ প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর বৃটিশ সরকার নীতিবক্তব্য ঘোষণা করা ছাড়া আর কিছুই করেনি। ফ্রান্সের পতনের পরও Marshal Petain এর নেতৃত্বে Vichy সরকার গঠিত হওয়ার পর—হিটলারের পরের লক্ষ্য ইংলণ্ডে অবতরণ করা। Battle of Britainএ হিটলার জয়লাভ করলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমাধি রচিত হবে।

এমনি আন্তর্জাতিক সংকট মুহূর্তে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক আহ্বান করা হয়। স্থান ওয়ার্দাগঞ্জ। গান্ধীর পরামর্শের জন্যই এই ব্যবস্থা। অপ্রত্যাশিত ভাবে সুভাষচন্দ্র এ সভায় উপস্থিত হওয়ার আহ্বান পেলেন। ওয়ার্দা গেলেন সুভাষচন্দ্র। সেখান থেকে সেবাগ্রাম। সেখানে সাদর অভ্যর্থনা করেন মহাত্মাজী। সজাগ দৃষ্টি গান্ধীর সকল ব্যাপারে। সুভাষ চা পছন্দ করেন—অতএব সুভাষের জন্যে চা-এর ব্যবস্থা।

তারপর আসতে শুরু করেন ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যরা। সরকারী ভাবে (formal) সভা ওয়ার্দাগঞ্জে। কিন্তু সভার আগে ওয়ার্কিং কমিটির প্রমুখ সদস্যরা—যেমন নেহরু, প্যাটেল, মৌলানা আজাদ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাজাজী, গোবিন্দবল্লভ পন্থ প্রভৃতি আসেন গান্ধীর কাছে। গান্ধী সভায় উপস্থিত থাকবেন না। তার আগে তাঁর মনের গতির ইঙ্গিত পাওয়া দরকার। পায়ের ধূলো নিয়ে সুভাষ জিজ্ঞাসা করেন—হঠাৎ তার তলব কেন? গান্ধীর স্বভাবসুলভ রসবোধ, খিল খিল করে হেসে বলেন "You are now the darling of the crowd"।

গাম্ভীর্য্যের সাথে আলোচনা শুরু হয়। কিছুটা reporting হল। কেউ কেউ প্রসঙ্গত কিছু বক্তব্য রাখেন। সুভাষচন্দ্র সম্পূর্ণ নীরব। কারণ, তিনি তো বিতাড়িত সদস্য। শোনার জন্যেই গিয়েছেন। তারপর বক্তব্য রাখেন গান্ধীজী। গভীর নীরবতার ভেতর গান্ধী হঠাৎ এক বিস্ময়কর প্রস্তাব রাখেন। দেশের ও যুদ্ধের অবস্থা বিশ্লেষণ করার পর তিনি বলেন যে কংগ্রেস নেতৃত্ব তখনকার পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে—তারা নতুন কোন পথ নির্দেশ

করতে পারছেন না—অথচ সুসময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—এমনি পরিস্থিতিতে তাঁর পরামর্শ হল সুভাষচন্দ্রকে নেতৃত্ব দেওয়া। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে যুদ্ধকালীন আন্দোলন পরিচালিত হোক। এই অপ্রত্যাশিত কথায় সকলেই হতবাক—মৌন ও নিশ্চল। আজাদ সভাপতি। তিনি সহকর্মীদের অবস্থা অনুমান করে বলেন—ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে এ বিষয়ে তাঁরা আলোচনা করবেন। সভা বসল জমুনালাল বাজাজের বাড়ীতে। অনেক আলোচনা হল—কিন্তু নেতৃত্ব বদল সম্পর্কে, বা সুভাষচন্দ্রের সহযোগিতা কামনা করা সম্পর্কে কোন আলোচনাই হল না। সুভাষচন্দ্র আর গান্ধীর কাছে ফিরে গেলেন না। সভা শেষে নাগপুরে চলে আসেন—তারপর কলকাতায়।

আমাদের গভীর রাতের সভায় এ খবরটি রাখেন সুভাষচন্দ্র। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি গান্ধীর কাছে কংগ্রেস নেতৃত্ব নিতে রাজী হয়েছিলেন কি না। সুভাষবাবু রাজী ছিলেন। তাঁর তো নেতৃত্ব নিয়ে ঝগড়া নয়—নীতি নিয়ে। তার নীতি গ্রহণ করলেই তিনি খুশী।

স্বতঃই প্রশ্ন ওঠে যে গান্ধী এ কথা বললেন কেন? তাঁর মত মানুষ কিছু না ভেবে কি প্রস্তাব রেখেছিলেন? আর রেখেছিলেন যদি তাহলে তা রূপায়িত করলেন না কেন? বন্ধুদের মধ্যে আলোচনাও হয়েছে এ সম্পর্কে। কিন্তু ঠিক সত্যটি আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। কেউ কেউ বলেন যে গান্ধী serious ছিলেন না।

এগার ঃ সংগ্রামের পরিকল্পনা

কি ভাবে কখন কোথায় জাতীয় সংগ্রাম শুরু করা যায়—এ সমস্যা ছিল বিরাট। রামগড়ে তো প্রস্তাব নেওয়া হল—কিন্তু কেমন করে তা কার্যকরী করা যাবে? সুভাষচন্দ্র খুব চিন্তিত ছিলেন।

কিছুদিন চঞ্চল অবস্থার পর একদিন বিকেলে এলগিন রোডের বাড়ীতে ডাকা হল আমাদের। সেখানে সুভাষচন্দ্র জানালেন যে তিনি ভারতরক্ষা আইন ভেঙে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে জনসভা করবেন। কথাটি শুনে বিস্মিত হইনি। বোঝা গেল যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। হয়তো interim decision। কিন্তু সিদ্ধান্ত তো। তিনি নিজেকেই প্রথম সমর্পণ করলেন আইন ভাঙ্গার যজ্ঞে। কতকটা যেন মরীয়া হয়ে। তিনি জানেন যে তার গ্রেপ্তারের পর কী হবে। মোটামুটি হিসেবও বোধ হয় করেছেন তিনি। এই নতুন পদক্ষেপের দুটি দিক।

যুদ্ধকালীন অবস্থায় ভারতরক্ষা আইন ভাঙ্গার ঝুঁকি প্রচণ্ড। দেশকে এই বিরাট ঝুঁকির ভেতর টেনে নেওয়ার দায়িত্ব সম্বন্ধে স্বতঃই অবহিত সুভাষচন্দ্র। তিনি আমাদের কাছে জানালেন যে পরের দিন তিনি ভারত রক্ষা আইন ভাঙ্গবেন। এর বেশী কিছু আলোচনা করলেন না। এই পদক্ষেপের পেছনের যুক্তি ভেবে নেবে তার সহকর্মীরা। তিনি তার সিদ্ধান্তে অটল। প্রাদেশিক কমিটি এ সভা ডাকবে না। প্রাদেশিক কমিটিকে জড়াতে চাননি এ ব্যাপারে। সভার বিজ্ঞপ্তির খসড়া তার টেবিলের উপর রয়েছে। এর রচয়িতা তিনি নিজে। বিজ্ঞপ্তি খুবই সংক্ষিপ্ত।

"আগামী কাল শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বিকেল ৫টায় আমি বক্তৃতা করিব"—সুভাষচন্দ্র বসু। আমাদের ভেতর বয়ঃজ্যেষ্ঠরা কেউ কেউ আপত্তি তুললেন ভয় পেয়ে নয় যুক্তির দিক দিয়ে। সুভাষবাবুই প্রথম গ্রেপ্তার বরণ করবেন—না অন্য কেউ। কেবল কর্মকৌশলের প্রশ্ন তোলেন শরৎবাবু। তিনি বললেন—"এ কী ঠিক করেছ সুভাষ—এ সম্পর্কে আমাদের জানাও নি।" সুভাষবাবু হেসে জবাব দিলেন—"আইনজীবির সাথে পরামর্শ করে আইন ভাঙব না।" শরৎবাবু নীরব হলেন। বুঝলেন—এ সিদ্ধান্ত আর নড়ানো যাবে না—হয়তো উচিতও নয়। তিনি একথা সর্বদাই বলতেন যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুভাষ তার নেতা। তিনি বড় ভাই মাত্র।

আইন ভেঙে জনসভা

ভারতরক্ষা আইন ভেঙে জনসভা কোন সংবাদপত্র ছাপাবে কি এ বিজ্ঞপ্তি? আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ছাড়া কোন কাগজ এ বিজ্ঞপ্তি ছাপতে সাহস করবে না। কিছুক্ষণের মধ্যে এলেন সুরেশ মজুমদার। গম্ভীর হয়ে শুনলেন সকল কথা। কাল বিলম্ব না করেই রাজী হলেন। বললেন—আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডে এ বিজ্ঞপ্তি ছাপা হবে—যখননেমেছি—তখন আর ফিরব না।" শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে গেল এই মানুষটির প্রতি। সুরেশবাবু সংবাদ-পত্রের মালিক নন, বিপ্লবের সাথী সুরেশচন্দ্র দুর্দিনের বন্ধু। এই অধ্যায়ে বাতিল বি. পি. সি সির ব্যাপার নিয়ে ও আরো অনেক ব্যাপারে আমরা নিবিড়ভাবে জড়িত ছিলাম সুরেশবাবুর সাথে। দেখেছি তার তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক বুদ্ধি, আপন ভোলা ত্যাগী মন। সব চেয়ে বড় কথা—তাঁর বিরাট হৃদয়।

সুরেশবাবু যাওয়ার সময় হাসতে হাসতে বললেন—"ভাল পাবলিসিটি দেব।" পরের দিন সকালে কাগজ খুলে দেখি যে বিরাট box করে দুটি কাগজই জনসমাবেশের প্রচার করেছে।

শংকা আমাদের খুব বেশী। ভারতরক্ষা আইন ভেঙে সাহস করে সভায় কত মানুষ আসবে—এই চিন্তা। সভার আগে যে গ্রেপ্তার হবে না—তা অনুমান করেছি আমরা। চিন্তা জনসমাবেশ সম্পর্কে। সভা শুরু হওয়ার অনেক আগেই পার্ক প্রায় ভরে গেল। তখনো সুভাষচন্দ্র আসেননি, একটু দেরী করেই এলেন। তখন পার্ক কানায় কানায় ভরা। এই অপ্রত্যাশিত জনসমাবেশ জনবিক্ষোভের একটি বড় ইশারা। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ বিরোধী বক্তৃতা দিলেন সুভাষচন্দ্র। নির্বিঘ্নে শেষ হল জনসভা। তার পরের অধ্যায় রাত্রে এলগিন রোডের বাড়ীতে আমাদের বৈঠক। সভা সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ হল। ঠিক হল পরের সভা মহম্মদআলী পার্কে।

মহম্মদআলী পার্কের সমাবেশও ভাল হয়। জনতার বেশী অংশ অবাঙালী। তাই সুভাষচন্দ্র হিন্দীতে বক্তৃতা দেন। উত্তরকালে এই বক্তৃতার জন্য সুভাষচন্দ্রকে রাজদ্রোহের দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। সরকারী reporterরা উর্দু ঘেঁষা বক্তৃতার ঠিক তাৎপর্য বুঝে report করতে পারেনি। বাংলায় বলবেন সেই ভেবে বাংলা reporterই গিয়েছিলেন সভায়। কিন্তু তাদের উর্দু জ্ঞানের উপর নির্ভর করেই অভিযোগ আনা হল।

রামগড় সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যেমন একদিকে প্রচেষ্টা চলে দ্বিতীয় সংগ্রাম শুরু করার—তেমনি সেই পরিকল্পনানুযায়ী এগিয়েছেন আরো একটি দিকে। সুভাষচন্দ্রের মন ছিল বহুমুখী। যুদ্ধের সুযোগ হারাতে চাননি তিনি। তার প্রথম ও প্রধান পরিকল্পনা ছিল—গান্ধীকে, দিয়ে গণসংগ্রাম শুরু করা।

কিন্তু ১৯৪০ সালের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। এই কয় বছরে জনতা শক্তির আস্বাদ পেয়েছে। ৮টি রাজ্যে কংগ্রেস সরকার গঠন এক ঐতিহাসিক ঘটনা। সাধারণ মানুষ বুঝতে পেরেছে যে এ পাওনা আপোষহীন সংগ্রামের জন্য। তাদের বদ্ধমূল ধারণা যে লড়াই করলে ইংরেজ সরকারকে হঠানো যাবে। তারপর মহাযুদ্ধ আমাদের ঘাড়ে চাপবে। যা চাইনি দেশের উপর যা জোর করে চাপানো হয়েছে—তার বিরুদ্ধে মানুষের মনে উন্মত্ত বিক্ষোভ।

সুভাষ ও গান্ধী উভয়েই জনচিত্তের এ খবর রাখতেন। সুভাষ ভেবেছেন যে এবারের আন্দোলনের তীব্রতার সম্মুখে বৃটিশের অনিবার্য পরাজয়। সে জন্যেই গান্ধীর উপর বারংবার চাপ সৃষ্টি করেছেন সুভাষ। তিনি জানতেন যে গান্ধী ছাড়া সাধারণ মানুষকে জাগিয়ে তুলে সংগ্রামের রাস্তায় চরম আত্মবলিদানের জন্য আর কেউ নিতে পারেন না। আন্দোলন শুরু হলে তাকে চরম পরিণতির দিকে নেওয়া শক্ত হবে না। সচল জনতায় হিংসা অহিংসার বালাই নেই। অহিংস থাকার জন্য চেষ্টা করবে তারা, কিন্তু প্রয়োজন হলে হিংসাত্মক কাজেও পশ্চাৎপদ নয়। জাগ্রত জনতা নিরস্ত্র হলেও—অস্ত্রকে ভয় করে না। দৃষ্টান্ত পেশওয়ার। ৩০ সালে জাগ্রত জনতা প্রাণ দিয়েছে armoured car দখল করেছে—আর পক্ষে নিয়ে এসেছে গাড়োয়ালী রেজিমেন্টের একটি সশস্ত্র কোম্পানি। তারা নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালাতে অস্বীকার ক'রে আন্দোলনের সহায়তা করেছে। এমনি করে সুসংগঠিত সৈন্যবাহিনী ভাঙে।

সুভাষচন্দ্র আন্দোলনের এ দিকটি খুব ভালোভাবে জানতেন। তার জন্য আগে থেকেই শক্র ব্যূহতেও সংগঠন করার চেষ্টা। সুভাষচন্দ্র কলকাতায় অবস্থিত এবং ভারতবর্ষের বাইরে যাওয়ার পথে সকল দেশীয় সৈন্যবাহিনীর সাথে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করেছেন। অনেক সামরিক অফিসাররা ঐ সময় সুভাষের সাথে দেখা করেন। এ সকল সাক্ষাৎকার অতীব গোপনে হত। এ ব্যাপারে বিপুল সহায়তা করেছেন দেশদর্পনের সম্পাদক বন্ধু

নিরঞ্জন সিংহ তালিব। তালিব দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেসের সভ্য, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটিরও সভ্য ছিলেন এবং সে সুবাদে বাতিল বি· পি· সি· সির সভ্য। এই সময় সকল শিখ অফিসারদের এনেছেন তালিব সুভাষ সকাশে। বাংলায় কার্যরত ২/৩ জন অফিসারের সাথে যোগাযোগ করে দেন রবীন্দ্রমোহন সেনের। যে সকল রেজিমেণ্ট দেশের বাইরে গেছে তারা কথা না দিলেও মন দিয়ে শুনেছে সুভাষের সকল পরামর্শ।

গান্ধী সুভাষ ব্যবধান

সুভাষচন্দ্র ৩০ দশকের কিছুটা সময় কাটিয়েছেন ইয়োরোপে এ সময় তিনি কেবল স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করেননি—নিবিড়ভাবে যোগাযোগ করেন ইয়োরোপের সকল দলের সাথে। এই সকল আলাপ আলোচনার ফলে কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। যে সকল তথ্যের উপর নির্ভর করে বলেছিলেন যে সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্বযুদ্ধের শুরু। আমার মনে হয় ভারতবর্ষের কোন প্রথম সারির নেতাই এত খবর রাখতেন না। তাদের বেশীর ভাগের খবর মিলত কৃষ্ণমেননের কাছ থেকে। কৃষ্ণমেনন রাজনীতিতে চিহ্নিত মানুষ। বৃটিশ শ্রমিক দলের সাথে বন্ধুত্ব। আমাদের নেতৃবৃন্দ তার মাধ্যমে জানতে চাইতেন ইংরেজের মনের কথা, শ্রমিক ও রক্ষণশীলদের ভারত-নীতি। ইয়োরোপের—বিশেষ করে জার্মানীর খবর তারা রাখতেন না। এক ধরণের বিচিত্র উদারনৈতিক (Lib-Lab) মতবাদের বন্দী ছিলেন এরা। ফ্যাসী বিরোধী হলেও যে ফ্যাসিষ্টদের দুর্গের খবর নেয়া দরকার—সেই প্রতীতী ছিল না এ সকল নেতৃবৃন্দের। অবশ্য গান্ধী এই শ্রেণীতে পড়েন না। সুভাষচন্দ্র হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে ৩০ দশকে ইয়োরোপের কেন্দ্রবিন্দু বৃটেন নয়—জার্মানী। অতএব জার্মানী কি করবে তা জানা প্রয়োজন। কারণ যুদ্ধ হলে এবারেও ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করবে জার্মানী। সকলের আগে জানা দরকার জার্মানীর মানসিকতা। জার্মান বিজয়ী হলে এবং ইংরেজ পর্যুদস্ত হলেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হবে। অতএব ইংরেজের পরাজয়ই কাম্য।

এই শক্তিজোটের কাউকে সমর্থন করার প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। জার্মানী ফ্যাসিষ্ট—তেমনি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী। ইংরেজ তো ভারতবর্ষের বুকের উপর দাঁড়িয়ে উন্মাদ নৃত্য করছে। কেউ আমাদের বন্ধু নয়—ইংরেজ

তো নিশ্চয়ই নয়। অতএব বাছাই করার প্রশ্ন কোথায়? সুভাষচন্দ্র নাৎসীতন্ত্রের চরম বিরোধী। যদি নাৎসী আগ্রাসী নীতি ভারতবর্ষকে অভিভূত করতে চায়, ভারত সর্বশক্তি দিয়ে তার প্রতিরোধ করবে। কিন্তু বৃটেন বিপন্ন হলে গনতন্ত্র বিপন্ন হবে—একথা মনে করাও মস্ত ভুল। বৃটেনের গণতন্ত্র ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেয়নি। জার্মানী যুদ্ধে জিতলে সারা বিশ্ব নাৎসীতন্ত্র গ্রহণ করতে বাধ্য হবে এ একধরনের প্রলাপোক্তি। রুশ-জার্মান নন এ্যাগ্রেসন প্যাক্ট থাকার জন্তে সোভিয়েত রাশিয়া নাৎসী বিরোধিতার প্রধান দুর্গ। আট কোটী মানুষের দেশ জার্মানী বিশ্ব বিজয় করবে তা military logistics এ স্বীকৃত নয়। ইংরেজের পরাজয়ে ভারতবর্ষে নাৎসীতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে না—তা সুভাষচন্দ্র জানতেন।

সুভাষচন্দ্র এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখতে চেয়েছেন সব বিষয়টি। স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত মানুষ প্রচার চালায় যে সুভাষচন্দ্র Rome Berten Tokyo axie-এর সমর্থক। এই কুৎসা কেবল ইংরেজ পরিচালিত Statesman-ই চালায়নি, চালিয়েছে Associated Chamber of Commerce & Industry, প্রগতিশীল কংগ্রেসী ও বর্ণচোরা বামপন্থী ও কমুনিষ্ট পার্টি। এরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক।

সুভাষচন্দ্র মনে করতেন যে অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ছাড়া ভারতের অহিংস গণ আন্দোলন সার্থক হওয়ার সম্ভাবনা কম। ইংরেজের আন্তর্জাতিক বিপর্যয়ের পটভূমিকায় ভারতবর্ষের গণ আন্দোলনকে যুক্ত করতে হবে। এইখানে গান্ধীর সাথে তার বিরোধ নয়—ব্যবধান। জাপান যুদ্ধে জয়ী হবে এই ছিল গান্ধীর দৃঢ় ধারণা। জয়ী হলেও জাপান ভারত আক্রমণ করে তা তিনি চাননি। জাপান আক্রমণ করলে তাঁর জীবন দিয়ে প্রতিরোধ করতেন গান্ধী। জাপান বা জাপানী আক্রমণ সম্পর্কে গান্ধীজীর ধারণা পরিচ্ছন্ন ছিল না। তবে অন্তহীন আত্মবিশ্বাসের অধিকারী তিনি। ভেবেছিলেন যে জাপানের সাথে সন্ধি করা সম্ভব। তা করা সম্ভব হবে তখনই যদি বৃটেন ভারত ত্যাগ করে। যুদ্ধের প্রয়োজনে ইংরেজ, সিঙ্গাপুর, মালয় ও ব্রহ্মদেশ ছেড়ে এসেছে। যুদ্ধের গতি জাপানের অনুকূলে গেলে বৃটিশ শক্তি ভারত থেকে পালাবে—ভদ্রভাষায় rearguard action চালাবে। ইংরেজের পরাজয় সুনিশ্চিত। অতএব গান্ধীর বক্তব্য, ইংরেজ তুমি ভারত ছাড়। তুমি তো পরাজয়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে। তুমি

ছেড়ে গেলে জাপান ভারত আক্রমণ করবে না বলে তাঁর বিশ্বাস। আর যদি আক্রমণ করে তবে ইংরেজ মুক্ত ভারতবর্ষ লড়াই করবে জাপানের সঙ্গে।

গান্ধীজী যুদ্ধের শুরুতে বৃটেনকে বিব্রত করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—কিন্তু ১৯৪২ সালে দু'বছর আগের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখেননি। এই হচ্ছে Gandhian inconsistency। গান্ধী inconsist নন একথা কখনও বলেননি। Inconsistency একটি যান্ত্রিক শব্দ মাত্র। যখন denial policy অনুসৃত হওয়ার জন্য সমুদ্র উপকূলের মানুষ একদিনের নোটিশে ঘরছাড়া হল, অধিবাসীদের বিশেষ করে জেলেদের নৌকা ডুবিয়ে দিতে হল—তখুনি গান্ধী আন্দাজ করেন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ভয়ঙ্কর ও বীভৎস রূপ। এর পরে Scorched earth policy চালু করবে ইংরেজ আপন সাম্রাজ্যিক স্বার্থে। ভারতবর্ষ তার ফলে শ্মশানে পরিণত হবে। দেশের শস্যাগোলা পুড়িয়ে দেওয়া হবে—সকল সেতু ধ্বংস করা হবে, বড় বড় কারখানা ধ্বংস হবে। লক্ষ কোটি ভারতবাসী হয় বোমার আঘাতে, নয় অনাহারে মৃত্যু বরণ করবে। কল্পনানেত্রে দেখা এই নিদারুণ ছবি তাকে আন্দোলন করতে পরামর্শ দেয়। এই তার inner voice। কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি তাকে সমর্থন না করলেও তিনি একাই লড়াই করার জন্যে প্রস্তুত।

কোনদিনই গান্ধীর বিরুদ্ধে কোন বিরূপ মনোভাব ছিল না সুভাষচন্দ্রের। ভারতবর্ষের বাইরে যাওয়ার পর তার কার্যাবলী—তার প্রমাণ। ১৯৪৩ সালে নেতাজীর দেহান্তর হয়েছে বলে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে একটি খবর পাওয়া যায়। এই সাংঘাতিক দুঃসংবাদের পর যুদ্ধরত সময় ভারতরক্ষা আইনের তলোয়ার যখন ঝুলে রয়েছে তখন কেবল দুটি মানুষ সমবেদনা জানাবার হিম্মত দেখিয়েছিলেন। তার একজন গান্ধী। কোন প্রগতিশীল নেতাই কোন মত প্রকাশ করতে সাহস করেননি। এ তো গেল মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর। কিন্তু এ সংবাদ যখন মিথ্যা বলে জানা গেল, গান্ধীর সেদিনকার অভিনন্দন বাণী সাহস ও আন্তরিকতার পরিচয়। I thank the mother and the nation that the son is alive।"

ভারতবর্ষের এই দুটি শ্রেষ্ঠ নেতা সম্পর্কে অনেক ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে—ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে তা কেটে যাবে বলেই আমার বিশ্বাস। উত্তর কালে ভারতবর্ষের সঠিক পক্ষপাতহীন ইতিহাস লেখা হলে সুভাষচন্দ্রের আসন গান্ধীজীর সমপর্যায় না হলেও কাটাকাটি থাকবে বলে আমার ধারনা।

বারো ঃ হলওয়েল মনুমেণ্ট আন্দোলন

ভারতরক্ষা আইন ভেঙে সভা করায় সাড়া এল খুব। সরকার অস্বাভাবিক নীরবতা অবলম্বন করে—যেন ভ্রূক্ষেপ না করার ভাব। সাড়া আছে কিন্তু সংঘর্ষ নেই। সংঘর্ষ না থাকলে আন্দোলন হয় না। ইংরেজ সংঘর্ষে নামতে চাইল না।

সুভাষচন্দ্র খুবই চিন্তিত। কিভাবে সংঘর্ষ শুরু করা যায়। দীর্ঘ আলোচনা হয় নিজেদের মধ্যে। ঠিক হল ঢাকা সম্মেলনের প্রস্তাবানুযায়ী হলওয়েল মনুমেণ্ট তুলে দেওয়ার জন্য সত্যাগ্রহ শুরু করা হবে। তখন বাংলাদেশে লীগ সরকার। হলওয়েল মনুমেণ্ট ইংরেজের সাজানো জিনিস। সম্পূর্ণ মিথ্যা বলেই ঐতিহাসিক অক্ষয় মৈত্র প্রমাণ করেছেন সকল তথ্য দিয়ে। এই মিথ্যা কলংক জাতির অসম্মানের চিহ্ন। নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য ইংরেজের এই অপচেষ্টা। হলওয়েল মনুমেণ্ট তুলে দেওয়ার আন্দোলনের বিরোধিতা করা ফজলুল হক-নাজিমুদ্দিন সরকারের পক্ষে অসম্ভব। আন্দোলনের বিরোধিতা করে তারা মোসলেম সম্প্রদায়ের কাছে অপ্রিয় হতে চায় না।

দ্বিতীয়তঃ, এই আন্দোলনে জিতলে দ্বিতীয় অধ্যায়ের রাস্তা খুলে যাবে। এটি জাতীয় সংগ্রামের rehearsal মাত্র। বাংলাদেশে এ আন্দোলন মোসলেম জনতার উপর বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করবে। মোসলেম জনতা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের শরিক নয়। লীগের প্রভাবে তারা কতকটা সাম্প্রদায়িক পথের পথিক। এ পথ থেকে তাদের টেনে আনার প্রশ্নও বড় কথা। বাংলা সরকার খানিকটা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। সরকারের ভেতর দুটি দল। কৃষক প্রজা সাম্প্রদায়িক নয়—কৃষক সমাজের প্রতিনিধি। লীগ পুরোপুরি সাম্প্রদায়িক। দুটি গোষ্ঠীর ভেতর এ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য প্রচুর।

ঠিক এমনি পরিস্থিতিতে ৩রা জুলাই সকালে ভারতরক্ষা আইনে সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে। ঐদিন আরো ৩০। ৪০ জনের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হয়। যারা গ্রেপ্তার হন তাদের ভেতর হেমন্তবাবু, রবি সেন, হরেন ঘোষ প্রভৃতি অনেকেই ছিলেন। আমার নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা

ছিল কিন্তু আমাকে সেদিন গ্রেপ্তার করতে পারেনি। সেদিন R. S. P. কর্মীদের বাসস্থান ১৩৩ নং আপার সারকুলার রোডের বাড়ীও তল্লাসী হয়।

এই গ্রেপ্তারের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না আমরা। আমাদের মনে হয়েছিল যে এ ব্যাপারটি অত্যন্ত জটিল ও বাংলাসরকারের সম্মুখে বিরাট challenge। এই ব্যাপারে গ্রেপ্তার হবে না—এই ছিল ধারণা। মন্ত্রীসভার ভেতর মতভেদের কথা আমরা জানতাম। কিন্তু গভর্নর তথা ভারত সরকার চেয়েছে গ্রেপ্তার। গ্রেপ্তার হল। ফজলুল হকের আপত্তির মূল্য কতটুকু?

হঠাৎ আঘাত সামলে প্রতিদিনই হাতুড়ি নিয়ে যেতে থাকে সত্যাগ্রহীরা। লোক আমরা পাঠাই। কিন্তু এতবড় জনবহুল জায়গায় গ্রেপ্তার হওয়া সত্ত্বেও জনমানস স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে খুব সাড়া দেয়নি। নতুন ভলাণ্টিয়াররা খুব বেশী আসেনি। আমাদের বেশীর ভাগ কর্মী আসত অমরদার সিমলা ব্যায়াম সমিতি থেকে এবং উলুবেড়িয়া থেকে। উলুবেড়িয়ার সমস্ত দায়িত্ব ছিল নানু ঘোষের উপর। নানু ঘোষ হরেনদার যোগ্য সহকর্মী। আমরা মফঃস্বল থেকেও কিছু কর্মী আনাই। কয়েকদিন চলার পর দেখলাম যে কোন গতিবেগ সৃষ্টি হল না। আমরা আন্দোলনের সমর্থনে সভা করার সিদ্ধান্ত নিই। বেকার হোষ্টেলে আমাদের একটি ইউনিট ছিল। আবদুল রউফ ও টাঙ্গাইলের সাজাহান চৌধুরী আমাদের সক্রিয় কর্মী। আমি আমার সহকর্মী নীহার রায় ও হরেন রায়কে নিয়ে বেকার হোষ্টেলে পর পর কর্মীদের সাথে মিলিত হই। আমরা বলি যে ইসলামিয়া কলেজে এই আন্দোলনের সমর্থনে সভা চাই। মোসলেম কর্মীরা রাজী হয়। তারা একটি হ্যাণ্ডবিল দেয়াল পত্র প্রচারের মাধ্যমে কলেজে সভা করে। নাজিমুদ্দিনের পুলিশ লাঠি চালায় ছাত্রদের উপর। কয়েকজন ছাত্র আহত হয়। রক্তপাত হয় অল্পবিস্তর। পরের দিন মোসলেম ছাত্রদের রক্তপাতের খবর কাগজে বের হয়। ইসলামিয়া কলেজে হয় ষ্ট্রাইক ও বিক্ষোভ। সেদিন এ্যাসেম্বিলিতে মুখ্যমন্ত্রী হক সাহেব ঘোষণা করলেন যে—হলওয়েল মনুমেণ্ট তুলে দেওয়া হবে। গভর্নর ও সেক্রেটারীরা বাধা দিতে সাহস করেনি। কিল চুরি করা ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল না। আমরা জয়ী হলাম।

উপনির্বাচন

এই আন্দোলন ছাড়া আর একটি বিরাট দায়িত্ব ছিল, পূর্ব ময়মনসিংহে বিধানসভার উপনির্বাচন। বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এ কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করে এ নির্বাচনে। এর মূল কারণ—নলিনী সরকার। নলিনী সরকার কংগ্রেসে সরকারীভাবে নেই. অথচ ময়মনসিংহ জিলা কংগ্রেসের উপর নলিনী সরকারের প্রভাব ছিল খুব। কংগ্রেস পরাজিত হয়। বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী কাউন্সিলে নির্বাচন প্রার্থী হয়ে সুভাষচন্দ্রের কাছে আসেন। সুভাষচন্দ্র তাকে প্রার্থী করতে রাজী হন। এর ফলে বীরেনবাবু কাউন্সিলে আমাদের সমর্থক হন এবং তার পদত্যাগের ফলে Assembly-তে ঐ আসনটি খালি হয়। ঐ আসন বাতিল বি· পি. সি· সির প্রার্থী হন জ্ঞান মজুমদার। জ্ঞানবাবু অনুশীলন দলের প্রাচীন নেতা।

একদিকে সত্যাগ্রহ—অন্যদিকে নির্বাচন। সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ কারা প্রাচীরের আড়ালে। আমরা খুব বিপদে পড়ি। এবার প্রতিদ্বন্দ্বী পুরাণো কংগ্রেস প্রার্থী। কিন্তু এবার পার্থক্য প্রচণ্ড। লড়াই এড হক কংগ্রেস ও বাতিল কংগ্রেসের মধ্যে। এড হক কংগ্রেস প্রার্থী কেবল কংগ্রেসের সমর্থনপুষ্ট নয়—নলিনী সরকারের সমর্থন ধন্য। অর্থের প্রাচুর্য। জ্ঞানবাবু জনপ্রিয় নেতা। এই তার মূল সম্বল। আমি আত্মগোপন করে আছি। একদিন সুরেশ মজুমদারের সাথে দীর্ঘ আলোচনা হল। আমি সুরেশবাবুকে বলি যে আনন্দবাজার কাগজে জ্ঞানবাবুর পক্ষে সুভাষবাবুর একটি আপীল ছাপাতে হবে। আমি ছয় লাইনে একটি খসড়া করে দেই। সুভাষচন্দ্র জেলে চলে যাচ্ছেন। নির্বাচনের সময় উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা নেই। তাঁর অবর্তমানে নির্বাচন ক্ষেত্রের সকল লোক যেন জ্ঞানবাবুকে ভোট দেয়—এই তাঁর নিবেদন। আনন্দবাজার নির্বাচনের দিন পর্যন্ত box করে এই আপীলটি ছাপাতে থাকে। দারুণ প্রভাব হয় এই প্রচারের। যেখানেই আমাদের কর্মীরা গিয়েছে, সেখানেই ভোটাররা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বলেছেন যে তারা সুভাষবাবুর আপীলে সাড়া দেবেন। বন্দী সুভাষচন্দ্র মুক্ত সুভাষচন্দ্রের চেয়ে হাজার গুণ শক্তিশালী। নির্বাচনে জ্ঞানবাবু বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন।

হলওয়েল মনুমেণ্ট তুলে নেওয়ার পর স্বতঃই আশা করেছি বন্দীমুক্তির। কিছুদিন পরে মুক্তি পেল বন্দীরা। কিন্তু সুভাষচন্দ্র পেলেন না। তার

বিরুদ্ধে মামলা হবে। একটি হল মহম্মদ আলী পার্কের বক্তৃতা—আর একটি "Forward Bloc"-এর তাঁর স্বাক্ষর লেখা প্রবন্ধ—Day of Reckoning"। বুঝলাম তাকে আটকে রাখার এ একটি অজুহাত।

এ সময় আমার অসুবিধার সীমা ছিল না। হলওয়েল সম্পর্কিত সকলে মুক্ত। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে warrant রয়েই গেল। এ নিয়ে বিধানসভায় প্রতুলদা প্রশ্ন তোলেন। কিন্তু সরকারের নীতি হল যে আমি ধরা দেব—তারপর আমাকে ছাড়া হবে। স্বভাবতঃই সন্দেহ হল আমার। ধরা দিতে অস্বীকার করি। নাজিমুদ্দিন প্রতুল গাঙ্গুলীকে বলেন যে আমি যেন তাঁর সাথে একবার দেখা করি। তারপরই আমার মুক্তি হবে। এ প্রস্তাব আমি অগ্রাহ্য করি। তিনি তাঁর প্রশাসনিক অসুবিধার কথা তোলেন। তার মানে গভর্ণর ও স্বরাষ্ট্র দপ্তর রাজী নয়। এ নিয়ে প্রতুলবাবু ও পরে জ্ঞানবাবু চেষ্টা করার পর আমার বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট তুলে নেওয়া হল।

গ্রেপ্তার

সুভাষচন্দ্র কারাগারে। আমরা সকলে বাইরে। আমরা যারা বাইরে—তাদের পক্ষে একটা বড় সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া খুবই শক্ত। অন্যান্য বামপন্থী দল নীরব। Soviet-German Non-aggresion pact সত্বেও C. P. I. কোন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নীতি গ্রহণ করতে চায়নি। C. S. P. আপন শক্তিতে কোন আন্দোলন করতে অসমর্থ। কংগ্রেসের উপর বিশেষ করে গান্ধীর উপর চাপ সৃষ্টি করা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই করতে পারেনি। C. S.P. সাধারণ ভাবে নেহেরু ভক্ত। তাঁর উপর নির্ভরশীল। এ সময় নেহেরু কোন Direct Action এর কথা ভাবেন নি। অতএব গান্ধীর উপর তিনি চাপ দিতে চান নি। তখন High Command রাজাজীর বিধান অনুযায়ী চলছেন। গান্ধী কংগ্রেস নেতৃত্বের রাজাজী পরিকল্পিত National Govt.-এর slogan-এর সম্পূর্ণ বিরোধী। জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা মানে ইংরেজের যুদ্ধ প্রচেষ্টার সহায়তা। গান্ধী anti-war। যুদ্ধ বিরোধীতার জন্য C. S. P গান্ধীর দিকে ঝুঁকে পড়ে।

সর্বত্র এক পীড়াদায়ক পরিস্থিতি। সুভাষচন্দ্র বন্দী, গান্ধী নীরব। কংগ্রেস নেতৃত্ব সরকারের সাথে সহযোগিতায় আগ্রহী। এমনি অসহনীয় অবস্থায় আমরা নিজেদের ভেতর আলোচনা করি। R. S. P.-র একান্ত বন্ধুদের ভেতর তাত্বিক আলোচনা হত প্রায়ই। পার্টির ideologue ত্রিদিব চৌধুরী

যুদ্ধের উপর নীতি বক্তব্য রচনা করেন। পরে সরকারী ভাবে এই war thesis গৃহীত হয়। The imperialist war has opened up the perspective of world revolution এই ছিল war thesis এর মূল বক্তব্য। ভারতবর্ষে সমাজবাদীদের আশু কর্তব্য হল জাতীয় বিপ্লব শুরু করা। এই নীতি অনুযায়ী সুভাষচন্দ্রকে নেতৃত্বে বরণ করেছে পার্টি। লেনিনবাদী নীতি অনুযায়ী সাম্রাজ্যবাদী দেশে ও তাদের অধিকৃত উপনিবেশে যুদ্ধ প্রচেষ্টা বিফল করে গৃহযুদ্ধ (civil war) শুরু করা। সমাজবাদীদের প্রধান কর্তব্য হল আপন আপন দেশের পুঁজিবাদী সরকারকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা।লেনিনবাদী অভিধানে এর নাম Revolutionary Defeatation। কিন্তু ভারতবর্ষের C. P. I. যেন মনস্থির করতে পারেনি। বৃটেনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ জাতীয় সংগ্রামের আহ্বান জানতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল C. P. I.। এখানে Forward Bloc, R. S. P., C. S. P.র সাথে C. P. I.-এর পার্থক্য। ভারতবর্ষে জাতীয় বিপ্লব সম্পর্কে C. P. I. কোনদিনই সঠিক নীতি গ্রহণ করতে পারেনি। যখন সুসময় এল তখনও না।

১৫ই সেপ্টেম্বর সারা বাংলায় প্রায় ২০০ জন R. S. P. নেতা ও কর্মী গ্রেপ্তার হন। রবি সেনকে গ্রেপ্তার করে আগের দিন ১৪ই, আর আমাকে ২ দিন আগে ১৩ই সেপ্টেম্বর। সেদিন সকালে দেবব্রত রায় আমাকে নিয়ে যায় কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে যতীন দাসের মৃত্যুতিথি উদ্‌যাপনের জন্যে। দেবব্রত দক্ষিণ কলিকাতার ভারপ্রাপ্ত কর্মী। রোজকার মতন বি· পি· সি· সি· অফিস যাই। অফিসের সকল কাজকর্ম সেরে পরিশ্রান্ত বোধ করি। ৭-৩০ মিনিট নাগাদ কলেজ ষ্ট্রীটের বসন্ত কেবিনে চা খাওয়ার জন্য আমাদের অফিস থেকে বেরিয়ে ছোট গলি ধরে হ্যারিসন রোড়ে পড়া। হঠাৎ পেছনে ঘোড়ার খুরের মতন কতকগুলি পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। দেখি সামনে থেকে ভদ্রবেশী কয়েকজন লোক পথ আগলে দাঁড়ান। ওরা বিনয়ের সাথে সঙ্গে যেতে বলে। জিজ্ঞাসা করি গ্রেপ্তার করছেন কি? ওরা বলে "হ্যাঁ"। ওরায়েন্ট কোথায়? ওরা বলে যে ভারতরক্ষা আইনে ওয়ারেণ্টটা দরকার হয় না। ভাবলাম, ২০ দিন আগে আমার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা তুলে নেওয়া হল। আবার কিসের জন্য গ্রেপ্তার?

রাত্রে লালবাজারে কাটাই। ১২টা নাগাদ পুলিশ আমাকে নিতে আসে। নীচে গিয়ে দেখি ভ্যান প্রস্তুত। ভ্যানে প্রবেশ করে দেখি রবীন্দ্রমোহন সেন

বসে। শুনলাম সকালে রাস্তায় গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। আশ্চর্য হলাম—কেন গ্রেপ্তার করা হল কেবল আমাদের ২ জনকে? নিয়ে যাওয়া হল প্রেসিডেনসি জেলে।

ভারাক্রান্ত চিত্তে কারাগারে প্রবেশ করি। মনটা পরাজিত সৈনিকের মতন। যুদ্ধ পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে যাচ্ছে—এ সময় গ্রেপ্তার হলাম। আমরা দুজনেই রাস্তায় গ্রেপ্তার হয়েছি। আমাদের গ্রেপ্তারের কথা কেউ জানে না। মনে হল রাস্তায় গ্রেপ্তার করার মধ্যে এক নিগূঢ় policy আছে। আমাদের গ্রেপ্তারের খবর বাইরে কেমন করে জানাই এই ছিল দুশ্চিন্তা।

বুদ্ধি আঁটলাম। জেল কর্তৃপক্ষকে আমার বাক্স বিছানা পৌঁছে দেওয়ার জন্যে আমার ভাই গিরীন্দ্রনাথকে খবর দিতে বলি। ভাবলাম প্রথমে আমার ভাই তো খবর পাক। তাহলে অনেকেই খবর পেয়ে যাবে। ১৩৩ নং আপার সারকুলার রোডে পার্টি কর্মীদের বাসস্থান। আমার ভাইও ওখানেই থাকে। কাছেই নীহার রায় ও হরেন রায়ের বাসা। এরা দু'জনেই কলকাতার সক্রিয় কর্মী। ফোনে কথা বলার সময় জেল কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা ঠিকমত বোঝাতে পারছিল না, আমি আমার হাতে রিসিভারটা দিতে বলি। ভদ্রলোক অপ্রত্যাশিতভাবে সেটা আমার হাতে দিয়ে ফেলে। আমি তখন ভাইকে সব কিছু খুলে বলি। রবিদার বাক্স বিছানাও পাঠাতে বলি। আর বলি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ও Assembly office-এ ত্রিদিব চৌধুরীকে ও আনন্দবাজারে আমার বন্ধু সুধীন দাসগুপ্তকে খবর দিতে। হঠাৎ জেল কর্তৃপক্ষের খেয়াল হল যে বে-আইনীভাবে আমাকে টেলিফোন দেওয়ায় ঘোরতর অন্যায় হয়েছে। আমার কাছ থেকে তখনই রিসিভারটি নিয়ে নেয়। কিন্তু ততক্ষণে আমার প্রয়োজনীয় কথা বলা হয়ে গেছে।

সুভাষচন্দ্রও ঐ জেলে। ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে। অপ্রত্যাশিতভাবে তিনিও অফিসে এসেছেন সেই সময়। শরৎবাবুর সাথে তার সাক্ষাৎ। Lawyer's interview। উকিলের সাথে দেখা করার সময় গোয়েন্দা পুলিশ থাকে না, এই-ই নিয়ম। শরৎবাবুও জানলেন আমাদের গ্রেপ্তারের কথা। আমাদের দেখতে পেয়ে সুভাষচন্দ্র স্বতঃই আশ্চর্য হলেন। বলেন, ব্যাপারটা ভালো লাগছে না। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি। ভাবটি এইরকম, যেন আর কিছুই করা সম্ভব নয়। দেখলাম সুভাষচন্দ্র গোঁফ রাখতে শুরু করেছেন।

অসম্ভ্রমে এর কারণ জিজ্ঞাসা করি। বলেন, "গোঁফ তো কোন ক্ষতি করছে না।"

ওয়ার্ডে চলে গেলাম আমরা দু'জন। দেখি সেখানে তিনজন কম্যুনিষ্ট বন্দী আছেন। বঙ্কিম মুখার্জী, আবদুল হালিম ও ধরণী গোস্বামী। শুরু হল দীর্ঘ বন্দীজীবন।

পরদিন ১৫ই সেপ্টেম্বর কাগজে দেখি বড বড় করে আমাদের গ্রেপ্তারের খবর দিয়েছে। সেদিন সকাল ১০টায় একের পর এক R. S. P. নেতা ও কর্মী গ্রেপ্তার হয়ে এলেন। প্রথমে এলেন প্রতুল গাঙ্গুলী। সেদিন সারা বাংলায় সুসংগঠিতভাবে প্রায় ২০০জন নেতা ও কর্মী গ্রেপ্তার হন। আমাদের গ্রেপ্তারের পর কলকাতায় নীহার রায়, হরেন রায়, সুবোধ লাহিড়ী প্রভৃতি কর্মীরা আত্মগোপন করার সুযোগ পায়। আলিপুর জেলেও অনেকে এলেন। তারমধ্যে সদ্য নির্বাচিত বিধানসভার সদস্য জ্ঞান মজুমদার ও ত্রিদিব চৌধুরী অন্যতম। কয়েকমাস আগে সত্যরঞ্জন বক্সী, হেমচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ Bengal Volunteer-এর প্রায় ২০ জন নেতা ও কর্মী গ্রেপ্তার হন—এবার R. S. P.র পালা।

জেলে দুর্গাপূজা ও গান্ধীর দূত

কয়েকদিন পরে সুভাষচন্দ্র এলেন আমাদের ওয়ার্ডে। দুর্গাপূজা হবে জেলে। তার অনুমতি পাওয়া গেছে। কোথায় দুর্গাপূজা হবে তার স্থান নির্বাচন করতে হবে। ঠিক হল আমাদের ওয়ার্ডেই হবে।

প্রতিমা এল। Traditional পৌরাণিক প্রতিমা। একত্র সংসার। আজকালকার মত মা-কন্যা-পুত্র আলাদা আলাদা নয়। ষষ্ঠীর দিন থেকেই সুভাষচন্দ্র আসতে থাকেন আমাদের নিবাসে। আমাদের সাথেই দিনের বেলা আহার করেন। সেই কয়েদী থালাতেই খেতেন। খাওয়ার সময় খুব হৈ চৈ রসিকতা হত। এতে সুভাষচন্দ্রও যোগ দিতেন। এই কয়দিন আমরা খাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা করি।

সুভাষচন্দ্র রোজই স্নান করে গরদের ধুতি পরে ও তসরের চাদর গায়ে পূজার সময় মন্দিরে বসে থাকতেন। চণ্ডীপাঠ করতেন রোজই। বাইরে থেকে পুরোহিত আসতেন। পূজা শেষে সুভাষচন্দ্র ঐ পুরোহিতের পায়ের

ধূলা নিতেন। তা দেখে আমার যেন কেমন লাগত। কোথাকার কোন অপরিচিত সাধারণ এক পুরোহিত, তার পায়ের ধূলো নিচ্ছেন অসাধারণ এক কর্মতপস্বী। একদিন শেষ পর্যন্ত আমি মুখ ফুটে বলেই ফেলি—"আপনি কেন ঐ ভদ্রলোকের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছেন ?" তিনি হেসে উত্তর দেন—"দোষ কি তাতে ?"

অষ্টমী পূজার দিন অফিস থেকে একটি স্লিপ এল যে বেলা ২টার সময় মহাদেব দেশাই দেখা করতে আসবেন সুভাষচন্দ্রের সাথে। আমি এর ভেতর ছোট্ট একটি আলোর রশ্মি দেখতে পাই।

মহাদেব দেশাই-এর আসার খবর পেয়ে আমি সুভাষচন্দ্রের কাছে যাই। কতকটা সংগোপনে। তখন ওখানে আমার বয়ঃজ্যেষ্ঠ নেতার উপস্থিত। দীর্ঘদিন বিপ্লবী আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকার জন্যে এক ধরনের বিশেষ মানসিকতা ছিল তাদের। তাদের ডিঙিয়ে কোন কাজ করা পছন্দ করতেন না তারা। সুভাষচন্দ্রকে জানাই যে মহাদেব দেশাই-এর সাথে দেখা করতে যাবার আগে তিনি যেন আমাকে ডেকে পাঠান।

প্রতিমার পাশে একান্তে বসে আলোচনা হয়। আমি তাঁর কাছে একটি রাজনৈতিক report পেশ করি। তাঁর গ্রেপ্তারের পর আমাদের শক্তি ঘাটতির দিকে গিয়েছে—একথা জানাই তাকে। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অবস্থা ভালো নয়। Ad hoc এর উপর কারোরই আস্থা নেই। কিন্তু Ad-hoc ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাথে যুক্ত এবং স্বীকৃত। এ দিকটা ধীরে ধীরে মানুষের মনে আসছে। তাঁর আস্থাবান কর্মীরা দু' দফায় গ্রেপ্তার হওয়ার জন্যে বাংলাদেশে সমর্থনের দুর্গে যে বিরাট আঘাত এসেছে—তা অনস্বীকার্য। অত্যন্ত সম্ভ্রমের সাথে বলি যে যদি তিনি কিছু মনে না করেন তাহলে আমার একটি ছোট্ট অনুরোধ জানাব। তিনি আমাকে আমার বক্তব্য রাখতে বলেন। আমি বলি "কিছুদিন যাবৎ গান্ধীর লেখা ও বিবৃতি পড়ে ধারণার বদল হয়েছে আমার। আমরা তো কার্যকরী কিছুই করতে পারলাম না। গান্ধী আন্দোলন করবে বলে আমার বিশ্বাস। গান্ধী তো কয়েকমাস আগে আপনাকে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। তাঁর অনুচররা রাজী হয়নি। আমার অনুরোধ আপনি গান্ধীর সাথে আপোষ করুন।" এই কথা বলার সাথে সাথে সুভাষচন্দ্রের চেহারার পরিবর্তন লক্ষ্য করি। একটু থেমে তিনি বলেন—"নরেনবাবু, দেখুন আমার জনসভায়

প্রচুর জনসমাবেশ হত। মাদ্রাজে আমি Mammoth Meeting-এ ভাষণ দিয়েছি—শোভাযাত্রায় মানুষের সমাবেশ হয় প্রচুর—আমার ভালো জনসমর্থন আছে। দেশ সংগ্রাম চায়—তাও আমি বুঝি। এ সব কিছু সত্য, But for this old man there is none who can put the masses in motion।" এই কথাগুলি বলতে বলতে তাঁর দু' চোখ জলে ভরে যায়। আমি মাথা নীচু করে ফেলি।

আমি বলি, মহাদেব দেশাই গান্ধীর একান্ত ভক্ত। মহাদেব কোন আপোষের কথা বললে আপনি তা reject করবেন না—এই আমার অনুরোধ। দু'টোর সময় মহাদেব দেশাই জেলে পৌঁছান। তারপর সুভাষচন্দ্র গেলেন অফিসে। আমি তো আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছি আলোচনার বিষয়বস্তু জানার জন্য। এত সব গোলমালের পর মহাদেব যখন এসেছেন—তখন উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই রাজনৈতিক। হয়তো এই দেখা সাক্ষাতের ভেতর দিয়ে রাজনীতির মোড় ঘুরে যেতে পারে।

ফিরে এলেন সুভাষ। গান্ধী মহাদেবকে বাংলাদেশে পাঠিয়েছেন একজন বন্দীর মুক্তির জন্য। মহাদেব সংশ্লিষ্ট সরকারী মহলের সঙ্গে কথা বলেন—এবং কিছুদিনের মধ্যে সেই বন্দীর মুক্তি হয়। সুভাষ কেমন আছেন মহাদেবকে তা স্বচক্ষে দেখে আসতে বলেন গান্ধী। সংবাদপত্রে সুভাষের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে গান্ধী তাঁর একান্ত সচিবকে পাঠিয়েছেন সুভাষের স্বাস্থ্যের খবর জানার জন্য। সুভাষচন্দ্র গান্ধীর সাথে compromise করতে রাজী ছিলেন। এর কিছুদিন পরে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন গান্ধীজী। তখন সুভাষচন্দ্র অসুস্থতার জন্য গৃহবন্দী। সুভাষচন্দ্র individual Satyagraha করার জন্য গান্ধীজীর আশির্বাদ চেয়েছিলেন—কিন্তু পাননি। ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষ কারাবরণ করে।

জেলে রাজবন্দীদের রাখার ব্যবস্থা এইবার খুবই ত্রুটিপূর্ণ ছিল—ত্রুটিপূর্ণ বললে ভুল হয়—অত্যন্ত প্রতিহিংসামূলক। জেলের তাঁতে তৈয়ারী মোটা কালো পাড়ের কাপড় পরতে হবে—ছোবড়ার গদি ও বালিশ—জেলে তৈয়ারী কয়েদী চাদর। আর জেলের নির্ধারিত diet। ১৯১৫-১৭ সাল, ১৯২৩-২৭, ১৯৩০-৩৮ সালের ব্যবস্থা বর্তমান ব্যবস্থার কাছে স্বর্গ।

এ সম্পর্কে কি করা হবে সে ব্যাপারে আমরা সুভাষচন্দ্রের পরামর্শ চাই। তিনি তখন বিচারাধীন বন্দী। তিনি অনশন করার পরামর্শ দেন। সেদিনই

একটি দরখাস্তের খসড়া করে দেখাই সুভাষচন্দ্রকে। তিনি কিছু কিছু রদবদল করে দেন। খুব দ্রুততালে ঘটনার পরিবর্তন হতে থাকে। অনশনের তারিখও ঠিক করে দেন সুভাষচন্দ্র। আমরা ২৫শে নভেম্বর অনশন শুরু করি প্রেসিডেনসি জেলে। এর আগে আমরা সাধ্যানুযায়ী খবর পাঠাই বিভিন্ন জেলে। আলিপুরে সহজেই খবর পৌঁছে যায়। কিন্তু হিজলিতে খবর পাঠাতে পারিনি। আলিপুর জেলও আমাদের মত দাবী জানিয়ে ultimatum দেয়। হিজলিতে অপেক্ষাকৃত বেশী বন্দী। শরৎবাবু প্রায়ই জেলে আসতেন। Legal interview করতে। অতএব আমাদের সকল খবরই বাইরে এবং আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ডে পৌঁছাত।

সুভাষের মুক্তি

২৫শে শুরু হল অনশন। এক সপ্তাহ পরে শুরু হয় আলিপুর সেণ্ট্রালে, তারপর হিজলিতে। অনশনের ফলে অবস্থার অনেক উন্নতি হয়। এই মীমাংসার ব্যাপারে শরৎবাবুর অবদান প্রচণ্ড।

অন্যদিক দিয়েও এই অনশনের গুরুত্ব খুবই বেশী। তা হল সুভাষচন্দ্রের অকস্মাৎ এই অনশনে যোগদান। তিনি অনশন করেন ২৯শে। সহানুভূতি সূচক অনশন। সবকিছুই তার পরিকল্পনা মাফিক। তিনি জেল থেকে বাইরে যাওয়ার সুযোগ খুঁজছিলেন। কারণ হলওয়েল আন্দোলনের বন্দী তিনি। সবাইকে ছাড়া হল—কিন্তু কেবল তাকেই ছাড়া হল না। কতকগুলি কষ্টকল্পিত অভিযোগ এনে তাকে বন্দী রাখা হয়। তিনি এই উপসংহারে এসেছিলেন যে যুদ্ধ চলাকালীন তাকে আর ছাড়া হবে না। ভারতের স্বাধীনতার শেষ লড়াই-এ তিনি আর সেনাপতি থাকবেন না। এই অসহায় অবস্থা তাকে অস্থির করে তুলেছিল!

৪ঠা তারিখ থেকে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি শুরু। urine-এ এসিটোন দেখা যায়। এটি খুবই দুর্লক্ষণ। এই লক্ষণ দেখা দিলে তখনি খাওয়াতে হবে। সেদিনই মেডিকেল কলেজের ডাঃ মনি দেকে ডাকা হয়। ডাঃ দে খাদ্য গ্রহণের পরামর্শ দেন। কিন্তু খাওয়ানোর রাস্তা কোথায়। জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেজর পাটনী জোর করে খাওয়ানোর দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেন। জেল কর্তৃপক্ষ সরকারের চাপের কাছে অবনত হয়নি। এত বড় নেতাকে forced feeding করতে গিয়ে যদি বিপর্যয় হয়—তার লেশমাত্র দায়িত্ব নেবেন না

পাটনী। মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক সুভাষচন্দ্রকে ছেড়ে দেওয়ার সুপারিশ করেন। কিন্তু ভারত সরকার অনিচ্ছুক। বাংলা সরকার সুভাষচন্দ্রের জীবনের ঝুঁকি নিতে অরাজী, বাধ্য হয়ে তখন তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

কম্যুনিষ্টদের ভোল বদল ও ক্রীপস মিশন

১৯৪১ সালের ২২শে জুন জার্মানী হঠাৎ রাশিয়া আক্রমণ করে। রুশ-জার্মান চুক্তি ভেঙে হিটলারের এই অন্যায় আক্রমণ। জার্মানীর রুশ আক্রমণের ফলে সোভিয়েট রাশিয়ার যুদ্ধনীতির পরিবর্তন হয়।

রুশ আক্রমণের সাথে সাথে চার্চিল রাশিয়ার সাথে মৈত্রী কামনা করে ক্রীপস্‌কে রাশিয়া পাঠান। নভেম্বর বিপ্লবের উৎসবান্তে ষ্ট্যালিন তাঁর ভাষণে জানান যে পৃথিবীর প্রতিটি সৎ মানুষেরই উচিত বৃটেন এবং ফ্রান্সকে সাহায্য করা। এই পরিষ্কার নির্দেশের পর ভারতীয় কম্যুমিষ্ট পার্টি সঙ্গে সঙ্গে তাদের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নীতি ত্যাগ করে। কম্যুনিষ্টদের চোখে সোভিয়েত রাশিয়া যুদ্ধে সামিল হওয়ার পর যুদ্ধের এক ধরনের গুণাত্মক (qualitative) পরিবর্তন হয়েছে। যে যুদ্ধ ২২শে জুনের পূর্বে সাম্রাজ্যবাদী ছিল—তা ঐ তারিখের পর জনযুদ্ধে (People's war) রূপান্তরিত হয়েছে। ইংরেজ সরকারের কাছে তারা জানিয়ে দেয় এ নতুন দৃষ্টিভঙ্গির কথা। কিছুদিন পর থেকেই কম্যুনিষ্টরা মুক্তি পেতে থাকে।

কয়েক সপ্তাহের ভেতর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বৃটিশের সাম্রাজ্যিক সৌধ তাসের ঘরের মতন ভেঙে যায়। জাপান কর্তৃক সিঙ্গাপুর, মালয় উপদ্বীপ ও ব্রহ্মদেশ দখল বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। সর্বত্রই জনমানব জাপানী সৈন্য বাহিনীকে সহায়তা করে। দীর্ঘদিনের সাম্রাজ্যিক শোষণের ফলে বৃটেনের কোন বন্ধু ছিল না ঐ সব দেশে।

অকস্মাৎ বৃটিশ সরকারের টনক নড়ে। প্রতিক্রিয়াপন্থী ঝুনো চার্চিলও বৃটিশের আসন্ন পতনে ভীত সন্ত্রস্ত হন। এই ভয় থেকেই ভারতবর্ষের স্বায়ত্ব শাসনের কথা ওঠে। অনিবার্য পতনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে পাঠানো হল ষ্ট্রাটফোর্ড ক্রীপসকে। ক্রীপস শ্রমিক দলের প্রথম সারির নেতা, পণ্ডিত নেহেরুর বন্ধু।

এলেন ক্রীপস। শুরু হয় দৌত্যকার্য। কংগ্রেসের প্রতিনিধি সভাপতি মৌলানা আজাদ। দেশবন্ধুর মতন নেতাও তাকে সম্ভ্রম করতেন। মৌলানা born aristrocrat, তার চাল চলন কথা বলার ভঙ্গী সবই বাদশার মতন।

তিনিই একমাত্র নেতা যিনি গান্ধীর সামনে ধূমপান করতেন। তার নিজস্ব কোন কাজের জায়গা ছিল না। গোড়া থেকেই সারা ভারতের নেতা। দেশবন্ধুর মৃত্যু পর্যন্ত বাংলায়ই থাকতেন।

মৌলানা সাহেব ভালো ইংরেজী জানতেন না—বুঝতে ও বলতে পারতেন। তার সুবিধার জন্য প্রথম দোভাষী নিলেন পণ্ডিতজীকে। শুরু হল দীর্ঘ দর কষাকষি। তখন নতুন দিল্লী রাজনৈতিক আলোচনায় সরব। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তখন জাতির জনক দিল্লীতে অনুপস্থিত। এতে দুটি জিনিস পরিষ্কার বোঝা গেল। সরদার, পণ্ডিতজী ও আজাদ ইংরেজের সাথে বোঝা-পড়া করবার জন্য আকুল, কিন্তু গান্ধী একেবারে হিমশীতল ঠাণ্ডা।

আমরা তখন ঢাকা জেলে। মন খুব চঞ্চল। ক্রীপস কি রাষ্ট্রক্ষমতা বা তার সারটুকু দিতে পারে? জেল থেকে শুনলাম নেতাজী বার্লিন থেকে বলেছেন—এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার জন্য। তার মতে এ কংগ্রেসকে ফাঁদে ফেলার ষড়যন্ত্র মাত্র। আমার ধারণা হল—এ প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না—প্রস্তাব যতই ভালো হোক না কেন। তার প্রধান কারণ গান্ধীর অনীহা। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পক্ষে কাজ করার জন্য ওকালতি করতে হবে কংগ্রেসকে। কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃত্বের ওজন কতটুকু—যদিনা গান্ধী তার সাথে দাঁড়ান!

শেষ পর্যন্ত ক্রীপসের অনুরোধে গান্ধীজী এলেন দিল্লীতে। প্রস্তাব দেখলেন। দেখে দ্ব্যর্থ ভাষায় বললেন, ক্রীপস তুমি পরের বিমানে ইংলণ্ডে চলে যাও, এ একটা Post dated cheque। আলোচনার পর ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেন ক্রীপস।

পণ্ডিত নেহরু জাপানের জয় কল্পনা করতে পারতেন না। আর কিছু না হলেও ইংরেজ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। পণ্ডিত নেহরু শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে ইংরেজ ভাবাপন্ন। কংগ্রেস কার্যকরী সমিতিতে পণ্ডিত নেহরুর ভাবাপন্ন মানুষ কম ছিল না। গান্ধীর কাছে সব কিছুর মানদণ্ড ভারতবর্ষ। ফ্রান্সের পতন হয়েছে—পতন হয়েছে বেলজিয়াম হল্যাণ্ড লাক্সেমবার্গ ও ডেনমার্কের। তার জন্য তিনি দুঃখিত। কিন্তু এর বেশী কী করতে পারেন তিনি। গান্ধীর মত, সবাই স্বাধীন হোক—ভারতবর্ষও হোক। কিন্তু ইংরেজ পরাধীন হবে—এ ভয়ে ভারতের স্বাধীনতা বিলম্বিত হওয়ার যৌক্তিকতা গান্ধীর কাছে নেই।

তেরো ঃ আগষ্ট বিপ্লব

দুয়ারে যুদ্ধ

ক্রীপস এর ব্যর্থতার পর কংগ্রেস রাজনীতি এক নিষ্ঠুর শূন্যতায় ভরা। অতঃকিম্? কেউ কোন পথ নির্দেশ করতে পারছেন না। বল্লভভাই, রাজেন্দ্রবাবু জননেতা—কিন্তু আন্দোলনের চিন্তা বা একক ক্ষমতা নেই।

যুদ্ধ এতদিন ছিল দূরে। ইয়োরোপে। তারপর পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায়। কিন্তু যুদ্ধ এবার সত্যই ভারতের দুয়ার দেশে। তার আগুনের হল্কা খুব দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। ভারতবর্ষের প্রিয় নেতার সদা জাগ্রত মনে তার প্রবাহ এল অনেক আগেই।

এ পর্যন্ত ভারতীয় অর্থনৈতিক তথা সামাজিক কাঠামোর উপর যুদ্ধের চাপ পড়েনি। কারণ যুদ্ধ ছিল খুব দূরে, কিন্তু ১৯৪২ সালে জাপান সীমান্তে দাঁড়িয়ে। ইংরেজ ও মার্কিন সৈন্য বাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে—বিশেষ করে পূর্ব ভারতে। কারখানায় কারখানায় যুদ্ধ সামগ্রী দ্রুত তৈয়ারীর প্রচণ্ড ব্যবস্থা। খাদ্য সামগ্রী চলে যাচ্ছে সৈন্যবাহিনীর পোষণের জন্য। কতটা খাদ্য দেশের মানুষের প্রয়োজন—তার খবর কে রাখে! তারা অভুক্ত থাকুক—কিন্তু সৈন্যবাহিনীকে তৃপ্ত রাখতে হবে। সামরিক প্রয়োজনে তৈয়ারী হল হাওয়াই আড্ডা—সৈন্যবাহিনীর ঘাঁটি; নতুন সামরিক সড়ক। ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হল বহু সাধারণ মানুষ। শহর হল নিষ্প্রদীপ। তার জন্য শুরু হল বর্দ্ধিতহারে চুরি এবং ছিনতাই। অবাঞ্ছিত ব্যবসার বৃদ্ধি। যাতায়াতের ভীষণ অসুবিধা। ট্রেনেও নিষ্প্রদীপ—তাই ট্রেনেও যাতায়াতের ভীষণ অসুবিধা। শহরে সামরিক বাহিনীর অবাধ যাতায়াত। সাধারণ মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত। বিদেশী সৈন্যদের লাম্পট্যের অত্যাচার। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব। পূবের ভারত এক বিরাট advanced base এ পরিণত।

গান্ধীজী দেখলেন যে দেশ এক সামরিক আগ্নেয়গিরির সীমান্তে দাঁড়িয়ে। ইংরেজের সাম্রাজ্যিক স্বার্থে দেশের অগুণতি মানুষের অসহনীয় অবস্থা। কংগ্রেস নির্বিকার দর্শকের মতন দাঁড়িয়ে।

তার উপর এল denial Policy। এর অত্যাচারে সমুদ্রোপকুলের

মানুষের দুর্দশার অন্ত নেই। এক বা দুই দিনের নোটীশে বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে—ডুবিয়ে দিতে হবে সকল নৌকা ও অন্যান্য যানবাহন। এর ফলে কৃষকদের—বিশেষ করে জেলেদের সীমাহীন দুর্গতি। তাদের ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ। রুজি রোজগারের পথ নেই। সারা পূর্বভারত অজানা বিপর্যয়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে। কেউ জানেনা জাপান এলে কি হবে। ইংরেজ ও মার্কিন সৈন্য কোথায় যুদ্ধ করবে—কোথায় করবে না—জানেনা দেশের মানুষ। তাদের উপর Scorched Earth এর কড়া নির্দেশ। শত্রু যাতে না আসতে পারে বা না এগোতে পারে—তার জন্য কাঁচা সাঁকো পাকা পুল নষ্ট করে দিতে হবে, শত্রুর হাতে রশদ যাতে না পৌছায় তার জন্যে শস্যের মরাই ও গুদাম নষ্ট করতে হবে। সাধারণ মানুষের বুক ফাটানো অবস্থা। শত্রু কে? জাপান তো তাদের শত্রু নয়—আর ইংরেজতো মিত্র নয়! এতদিন ধরে জাতীয় আন্দোলনের শিক্ষা যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী—ইংরেজের কবলমুক্ত ভারতবর্ষ চাই, চাই পূর্ণ স্বরাজ। জাপান ইংরেজের শত্রু। অতএব শত্রুর শত্রু আমাদের মিত্র। ইংরেজের পরাজয় সাধারণ মানুষের কাছে আশীর্বাদ। তারা যে ব্রহ্মদেশের অধিবাসীরা জাপানীদের গোপন পথ দেখিয়ে দিয়েছে ইংরেজ ঘাঁটি দখল করার জন্য। ভারতের সাধারণ মানুষ ঘোরতর ইংরেজ বিদ্বেষী। ইংরেজের দুঃশাসন তাদের ঠেলে দিয়েছে জাপানের পক্ষে। জাপান এলে তারা দু'হাত তুলে নৃত্য করবে। গণবিক্ষোভ কত গভীর বোঝা যেত সাধারণের এই মনোভাব দেখে।

আগষ্ট প্রস্তাব ও নেহেরুর দ্বিধা

গান্ধী দেখলেন জাপানের ভারত আক্রমণের একমাত্র কারণ বৃটিশ সাম্রাজ্যিক শাসন। যদি বৃটিশ শক্তি ভারতবর্ষে না থাকত তবে জাপানের ভারত আক্রমণের প্রশ্ন উঠত না। জাপানী আক্রমনের একমাত্র কারণ বৃটিশের উপস্থিতি। ভারতের অধিবাসীদের সাথে জাপানের কোন বিরোধ নেই। বিরোধ ভারতের ঔপনিবেশিক শক্তির সাথে। অতএব বর্তমান সঙ্কটে বৃটেন যদি ভারত থেকে সরে দাঁড়ায়—যদি ভারতবাসীর হাতে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দিয়ে ভারত ত্যাগ করে চলে যায়—তাহলে জাপানী আক্রমন আর হবে না। অতএব গান্ধী চাইলেন ভারতবর্ষ থেকে মিত্র শক্তির সকল সামরিক বাহিনীর অপসারণ। অন্যকথায় ভারতবর্ষ ইংরেজ কবলমুক্ত হোক।

ইংরেজ শাসনের পথ বেয়েই এসেছে মার্কিন সামরিক বাহিনী। মার্কিন সামরিক বাহিনীও বৃটিশের সাম্রাজ্যিক স্বার্থে এসেছে। অতএব বৃটিশের সাথে মার্কিন সামরিক বাহিনীও চলে যাবে।

১৯৪২ সালের মে মাসে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির বৈঠক হয় এলাহাবাদে। কমিটির সকল সভ্যই হতমান ও দিশেহারা। এ সময় গান্ধী অনুপস্থিত। তিনি মীরা বেনের হাত দিয়ে একটি প্রস্তাবের খসড়া পাঠালেন ওয়ার্কিং কমিটির কাছে। সে প্রস্তাবের মর্মার্থ ইংরেজকে ভারত ছাড়তে বলা। ইংরেজ যদি তা মেনে না নেয়, তাহলে বাধ্য হয়ে বলিষ্ঠ আন্দোলন শুরু করতে হবে সম্পূর্ণ অহিংস রাস্তায়। গান্ধী এ কথাও জানালেন যে এবার আন্দোলন তড়িৎ-গতিতে আত্মপ্রকাশ করবে—আর শেষ হবে খুব অল্প দিনের মধ্যে।

ওয়ার্কিং কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই প্রস্তাব পড়ে স্তম্ভিত এবং ক্ষুব্ধ হয়। সে অংশের পুরোভাগে পণ্ডিত নেহেরু। খসড়া প্রস্তাবের ভেতর একটি লাইন ছিল যে বৃটিশ চলে যাওয়ার সাথে সাথে ভারত এক অনাক্রমন চুক্তি করবে জাপানের সাথে। স্বভাবতই ক্ষুণ্ণ হন পণ্ডিতজী। এতদিন ধরে বছরের পর বছর কংগ্রেস মঞ্চ থেকে পাশ করা হয়েছে ফ্যাসীবিরোধী প্রস্তাব। কেমন করে সেই নীতি প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন পণ্ডিতজী।. জাপানের সাথে চুক্তি করার কথা তিনি কল্পনাই করতে পারেন না। এ প্রস্তাব এতদিনকার কংগ্রেসের ঘোষিত নীতির বিরোধী। বিশ্বের প্রগতিশীল অংশের কাছে পণ্ডিত নেহেরুর মাথা হেঁট হবে এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে।

তুমুল বিতর্কের মধ্যে সভা চলে। বল্লভভাই প্রভৃতি খসড়া প্রস্তাবের পক্ষে। তিনি গান্ধীর পরিকল্পিত আন্দোলন করার পক্ষে জোর সুপারিশ করেন। সাথে সাথে একথাও বলেন যে পণ্ডিত নেহেরু ঐ প্রস্তাবের ফ্যাসিবাদের পক্ষে অংশ বাদ দিয়ে অবিলম্বে আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করুন। আচার্য নরেন্দ্র দেও ও অচ্যুত পট্টবর্ধন বলেন যে এ যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং অনতিবিলম্বে পরিকল্পিত আন্দোলন করাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু পণ্ডিত নেহেরু সে প্রস্তাবেও রাজী নন। কারণ ইংরেজকে ভারত ছেড়ে যেতে বলা মানেই জাপানকে আহ্বান করে আনা। নেহেরুর অনুমান ভুল একথা বিশেষ করে বলেন অচ্যুত পট্টবর্ধন। নেহেরু তখনো ৩৫-৩৭ সালের ফ্যাসীবিরোধী মনোভাবের বন্দী। সংখ্যাধিক্য ছিল গান্ধীর প্রস্তাবের পক্ষে। ঐ প্রস্তাব

পাশ হল সংশোধিত আকারে। জাপান সম্পর্কে সমস্ত কথা তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু আশু সংগ্রামের কথায় প্রস্তাব সোচ্চার।

কোনদিনই নেহেরু গান্ধীর বিরোধিতা করেন নি। কিন্তু এই ব্যাপারে তার মন সায় দিচ্ছে না। গান্ধীর সাথে একাধিকবার দেখা করেন তিনি। গান্ধী তাকে বোঝান যে ইম্পিরিয়ালিজম্ ও ফ্যাসিজম্ জমজ ভাই twin brothers। মিত্রপক্ষ গণতান্ত্রিক হলেও সত্যিকার ফ্যাসীবিরোধী নয়। বিশেষ পরিস্থিতিতে হিটলার যা করেছে—চার্চিলও তাই করবে। মিত্রপক্ষ অক্ষ শক্তির চেয়ে কোন অংশে শ্রেয়ও নয়। ব্যবধান কেবল চেহারায়।

শেষ পর্যন্ত গান্ধী আপোষের কোন চেষ্টারই ত্রুটি রাখেননি। এমনকি রুজভেল্টের কাছেও ব্যক্তিগত পত্র দিয়েছেন লুই ফিশারের মারফৎ। মার্কিন প্রেসিডেন্টের দূত দেখাও করেছেন গান্ধীর সাথে। ইংরেজ সরকারের বিশেষ করে চার্চিলের মনোভাব অনমনীয়। অতএব সংগ্রাম অনিবার্য।

করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে

গান্ধী প্রস্তুতির জন্য কর্মীদের ডাকলেন। উপদেশ দিলেন সকলকে—প্রস্তুত হওয়ার জন্য নির্দেশও। মনে হয় রাজেন্দ্রবাবুর মাধ্যমে বিহারের উপর জোর দিয়েছেন বেশী। বাংলার নিজস্ব শক্তি খুব সীমিত। কংগ্রেসের তমলুক· কাঁথি ছাড়া কোথাও তেমন প্রভাব ছিল না। এ দুটি মহকুমা চিরদিনই সংগ্রামী। বিদ্রোহী মেদিনীপুর আমাদের গৌরব। '২১, '৩০-৩১ ও '৪২ সালের সকল আন্দোলনেই মেদিনীপুর সকলের পুরোভাগে। বিপ্লবী আন্দোলনেও অগ্রগামী মেদিনীপুর। মেদিনীপুরকে বারংবার প্রণাম জানাই।

৮ই আগষ্ট A. I. C. C. বৈঠক। ভারত ছাড় প্রস্তাব উত্থাপিত হল—জওহরলাল প্রস্তাবক —বল্লভভাই সমর্থক। গান্ধীও দীর্ঘ সময় বক্তৃতা দেন। গান্ধী বাগ্মী নন। ঘরোয়া আলোচনার মতন বক্তৃতা দেন। কিন্তু ঐদিন খুব আবেগময়ী বক্তৃতা দেন তিনি। চরম মূল্য দেওয়ার আহ্বান জানান। নিজেকেও এই আন্দোলনে আহুতি দেন। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।

কার্যক্রম কিছুই ঘোষণা করেননি। আর একবার বড় লাটের সাথে সাক্ষাতকার। যদি কিছু না হয়—তাহলে সংগ্রামের কার্যক্রম ঘোষণা। তবে একথা জানালেন যে এবারকার আন্দোলন অন্যান্য বারের আন্দোলনের চেয়ে

আলাদা জাতের। সম্পূর্ণ অহিংস সংগ্রাম। নিরস্ত্র বিদ্রোহ (unarmed revolt) বিষয়টি লক্ষ্য করার মত। Non-violent এর বদলে বললেন unarmed। এই কথাটির মাধ্যমে গান্ধীর মানসিক গতির আভাষ পাওয়া যায়। আর revolt কথাটিও খুব তাৎপর্যপূর্ণ।

জেলের লৌহপ্রাচীর ভেদ করে একটি Programme পৌছায় আমাদের হাতে। সরকারী শক্তি কেন্দ্রগুলি দখল করার প্রোগ্রাম। এটি গান্ধী রচিত Programme নয়। তবে গান্ধীর বিশ্বাসভাজন মানুষদের তৈয়ারী কার্যক্রম। খসড়ার ভাষা প্রাঞ্জল—বলা বাহুল্য গান্ধী মতবাদে বিশ্বাসী মানুষের রচনা।

বিদ্রোহ হয়েছিল সারা দেশে। আমরা কেবল কাগজে পড়েছি। দুর্ভাগ্য আমাদের যে আমরা স্বাধীনতার এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে পারি নি। সারা জীবন ধরে যে দেবতার আবির্ভাবের জন্য প্রার্থনা করেছি, সে দেবতা যখন এল—তখন তাকে বরণ করার মত অবস্থা ছিল না। সে সময় কেবলই সুভাষচন্দ্রের কথা মনে হত। এই আন্দোলনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন তিনি। তারই ইপ্সিত সেই আন্দোলন হল—কিন্তু তিনি দেশে অনুপস্থিত।

সত্যই দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি এ সংগ্রাম। কিন্তু এই বিদ্রোহ জনজীবনের এক অভুতপূর্ব স্ফুরণ। আগ্নেয়গিরির অগ্নিবর্ষণ। সারা দেশ একপায়ে দাঁড়াল। কি অসাধারণ শক্তি জাগ্রত জনতার।

গান্ধীর বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তিনি ইচ্ছা করে কোন কার্যক্রম জানাননি। তার মত মহান নেতা কি কার্যক্রম ঠিক করেননি? আর ঠিক করলে তা জানাননি কেন? এই অভিযোগের ভেতর যুক্তি আছে। গান্ধী কেন—এই অভিযোগ Working Committeeর সকল সভ্যদের সম্বন্ধেই খাটে।

ওয়াকিং কমিটি কেন প্রোগ্রামের রূপরেখা জানাবেন না? গান্ধীজী কি বলেছেন তা বড় কথা নয়—বড় কথা দেশের কাছে তারা কি বলবেন। সমকালীন ঐতিহাসিকরা এই ফাঁকের মর্যাদা দিলে বা ক্ষমা করলেও উত্তরসুরী ঐতিহাসিকরা ক্ষমা করবে না। এর জন্যে ওয়ার্কিং কমিটি আসামী সাব্যস্ত হবে। তারা ত দেশের নেতা। তারা কেন দেশকে অন্ধকারে রাখবেন?

কংগ্রেস নেতৃত্ব ও গান্ধীজী সেদিন escapist মনোভাব অবলম্বন করেছেন একথা ভাবতে আমাদের দুঃখ হলেও উত্তরসুরিদের মোটেই তা মনে হবে না। গান্ধীর মতে এই আন্দোলন আলাদা জাতের। অতএব জেল

ভর্তি করার আন্দোলন এ নয়। দেশে Violence হতে পারে। দুদিক থেকেই তা সম্ভব। ১৯২২ ও ৩০ সালেও জনতা হিংস্ররূপ নিয়েছে—একথা তাদের জানা। জনতার সাধারণ প্রবণতা হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত হওয়া। যুদ্ধের সময় এ ধরণের কাজ খুবই বিপদজনক। জনতার পাশে দাঁড়াবার জন্য কংগ্রেসের যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত ছিল। প্রয়োজন হলে প্রথম সারির নেতাদের আত্মগোপন করা উচিত ছিল। কোন বিশেষ অধ্যায়ে আত্মগোপন করা যুক্তিযুক্ত—যেমন গান্ধীর মতে Poland এর আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ অহিংস। গান্ধীজী তো জয়প্রকাশ অচ্যুত পট্টবর্দ্ধন প্রভৃতি নেতার আত্মগোপনের নিন্দা করেন নি। ১৯৪৪এ মুক্তি পাওয়ার পর তাঁর আত্মগোপনকারীদের সাথে সাক্ষাত করার কথা অনেকের জানা। পুনার Natures clinicএ অবস্থান কালে তিনি দেখা করেছেন অরুণা আসফ আলির সাথে। যাতে তিনি নির্বিঘ্নে দেখা করে ফিরে যেতে পারেন—তার সকল সতর্কতা অবলম্বন করেছেন স্বয়ং গান্ধী। তারা আগে থেকে plan রচনা করলে আন্দোলন আরো ভয়ংকররূপ নিত—সহজে স্তব্ধ হত না।

নায়ক জয়প্রকাশ

আন্দোলন আবার কিছুটা গতিধারা পেল জয়প্রকাশ নারায়ণের হাজারীবাগ জেল থেকে পলায়নের পর। তাঁর সাথে বেরিয়ে এসেছিলেন যোগেন্দ্র শুকুল, রামনন্দন মিশ্র এবং সুরজ নারায়ন সিং প্রভৃতি। এরা সারা দেশ ঘুরে ঘুরে সংঘর্ষ সংগঠিত করেন। জয়প্রকাশ নেতাজীর সাথে যোগসূত্র রচনা করাব চেষ্টা করেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে নায়ক জয়প্রকাশ।

উত্তরকালে এদের সকলের সাথেই কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। শুকুলজীকে প্রথম দেখি লাহোর কংগ্রেসের সময়। তিনি তখন মৌলানীয়া ডাকাতি মামলায় ফেরারী। রামনন্দনবাবু কৃষক পঞ্চায়েতের সভাপতি ও সোস্যালিষ্ট পার্টির প্রথম সারির নেতা। সুরজবাবুর শেষের জীবনে তার সাথে সোস্যালিষ্ট পার্টির সতীর্থ হিসেবে খুব নিবিড় ভাবে কাজ করার সুযোগ হয়েছে আমার। এরকম আপনভোলা বাহাদুর জননেতা খুব কম দেখা যায়।

জয়প্রকাশ বেরিয়ে এসে ছত্রভঙ্গ কর্মীদের আবার সুসঙ্ঘবদ্ধ করেন। সোস্যালিষ্ট পার্টির অচ্যুত পট্টবর্দ্ধন, রামমনোহর লোহিয়া, কংগ্রেসের অরুণা আসফআলি, আচার্য যুগোলকিশোর, সুচেতা কৃপালিনী, অন্নদা প্রসাদ

চৌধুরী, নানা পাতিল প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ অসাধারণ নৈপুণ্যের সাথে কাজ করেছেন এ অধ্যায়ে। আজাদ রেডিওর ভারপ্রাপ্ত কর্মী বোম্বাইয়ে উষামেটার কথা মনে পড়ে এ অধ্যায়ে। জেল থেকে বেরিয়ে এসে তার সাথে যখন দেখা করি, তখন তিনি আর সক্রিয় রাজনীতিতে নেই। এই অধ্যায়ে পরিকল্পনা মাফিক কিছু কাজ হয়েছে ঠিকই—কিন্তু ধীরে ধীরে সকল নেতাই গ্রেপ্তার হন। কেবল পট্টবর্দ্ধন ও অরুণা আসফ আলি গ্রেপ্তার হননি। তাঁরা শেষ পর্যন্ত আত্মগোপন করেছিলেন।

এ সময়কার কম্যুনিষ্ট পার্টির আগষ্ট আন্দোলন বিরোধী ভূমিকা এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে সহযোগিতার কথা সর্বজনবিদিত। তখনকার C. P. I. এর সাধারণ সম্পাদক পুরনচাঁদ যোশী ও জি অধিকারীর ভারত সরকারের কাছে পত্র তার সাক্ষী। ১৯৪২ সালের ৪ঠা মে এই পত্র প্রখ্যাত শ্রমিক নেতা এন· এম· যোশীর মাধ্যমে বোম্বাইএর গভর্ণর Sir Roger Lumley কে পাঠানো হয়। লামলি তা ভারত সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেন। এই পত্রে কম্যুনিষ্ট পার্টির যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্যের কথা জানানো হয়। জুন মাসের ৪ঠা থেকেই কম্যুনিষ্ট পার্টির সভ্যরা কারাগার থেকে মুক্তি পান।

সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে জয়প্রকাশ নারায়ণ যে নেতৃত্ব দিয়েছেন ভারতবর্ষের মানুষ তার কাছে চিরদিন ঋণী তার জন্য। উত্তরকালে জয়প্রকাশের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছি আমি। এ ধরণের মধুর প্রকৃতির নেতা, সহকর্মীদের সম্বন্ধে এমন সজাগ ও সহানুভূতিশীল নেতা আর দেখিনি।

চৌদ্দ ঃ ভাটার টান

ঢাকা জেলে আমরা সম্পূর্ণ segregated। বাইরের আন্দোলনের হাজার হাজার বন্দীদের সাথে আমাদের দেখা করতে দেওয়া হয়নি। বাইরের আন্দোলনের সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে পারেনি এই সময় হঠাৎ নরেন মহারাজ (সেন) আমাদের এখানে এলেন। নরেন মহারাজ অনুশীলন দলের প্রখ্যাত নেতা, অপূর্ব রাজনৈতিক জ্ঞানের ভাণ্ডার। অনেক খবর জানা গেল তার কাছ থেকে। নেতাজীর বেতার ভাষণের কথা। তার কাছ থেকে শুনলাম যে মালয় থেকে সাবমেরীনে কয়েকজনকে পাঠিয়েছেন সুভাষচন্দ্র। তখনই শুনলাম আজাদ হিন্দ বাহিনীর কথা। রাসবিহারী বসুর খবর। নেতাজীর সিঙ্গাপুরে আসার কথা। সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ খবর পেলাম—আজাদ হিন্দ বাহিনীর মণিপুর প্রবেশ এবং ভারত ভূখণ্ড দখলের কথা। এই সকল বহুবাঞ্ছিত খবর যেদিন পেলাম—তখন সংগ্রামের জোয়ার থেকে আমরা নির্বাসিত। ১৯৪০ সালে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে বিপ্লব সৃষ্টি করার শপথ নিয়েছিলাম—কিন্তু আমাদের ভাগ্যে তা হল না।

দমদম জেলে

১৯৪৪এ ঢাকা থেকে স্থানান্তরিত হই দমদম জেলে। বড় আকর্ষণ ছিল সহকর্মী ও বন্ধুদের সাথে দীর্ঘদিন পর মিলন। আমরা তো একেবারেই দুনিয়ার সকল রাজনৈতিক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম। দেখা হল অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ, হেমন্ত বসু, রমেশ আচার্য, অনিল রায়, সৌমেন্দ্র নাথ ঠাকুর, আর দেবেন ঘোষের সাথে।

অধ্যাপক ঘোষকে আমরা মাষ্টারমশাই বলে সম্বোধন করতাম। মাষ্টার-মশাই এক অপূর্ব চরিত্র। শিশুর মত ব্যবহার অথচ বিরাট পণ্ডিত। হেমন্ত-বাবু ৩৮-৪০ সালের ঘনিষ্টতম বন্ধু। আমার চেয়ে বয়সে বড়—তবুও বন্ধু। একটি ঘটনাবহুল অধ্যায়ে এক সঙ্গে কাজ করেছি আমরা। তাঁর সাথে ছিলেন অমরদা (বসু), হরিদাস ঘোষ, জিতেন পাল। রমেশদা অনুশীলন দলের সভ্য হিসেবে আমার নেতা। রমেশদা বিপ্লবকর্মের ব্রতী। এক ধরণের কর্মতপস্বী। সকল কাজে যোগ দিয়েও নিজেকে লুকিয়ে রাখতে ভাল-

বাসতেন। আত্মপ্রচারের বালাই ছিল না। অনিলবাবু বাংলার প্রথম সারির নেতা। বিদ্বান মানুষ। সমাজবাদের উপর তার নিজস্ব চিন্তাধারা আমাদের আকর্ষণ করে। সঙ্গীতজ্ঞ। ৩১ সালে বক্সা দুর্গে ও পরে প্রেসিডেন্সী জেলে ও দেওলী শিবিরে একত্র ছিলাম। ৩৭-৪০ সালে সুভাষ সমর্থকদের ঘনিষ্ঠ মহলের মানুষ অনিলবাবু।

সৌমেন্দ্রনাথ একজন বর্নাঢ্য মানুষ। এ ধরণের আকর্ষণীয় মানুষ বাংলার রাজনীতিতে বিরল। দীর্ঘকায় সৌম্য মানুষটিকে ভিড়ের মধ্যেও চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। সকল প্রকারে গুণী মানুষ। সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গেত রচয়িতা। রবীন্দ্র সঙ্গীতে তার প্রজ্ঞা সর্বজনস্বীকৃত। কম্যুনিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা বেয়েই তিনি কম্যুনিষ্ট। রাজনীতি তার সঠিক কর্মক্ষেত্র ছিল না। কিন্তু তার ঐ পথ পরিক্রমণের সার্থকতা সীমিত। জীবনের অপরাহ্নে ভারতের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন তিনি। তাঁর মত সুবক্তা খুব কম। তাঁর অপূর্ব বাচনভঙ্গী, বাংলা শব্দ চয়ন করার অনবদ্য ক্ষমতা মুগ্ধ করে মানুষকে। বাংলাদেশ তাকে সম্যক অনুধাবন করতে পারেনি।

বন্দীনিবাসে গান্ধী

১৯৪৬ সাল। রিচার্ড কেসী তখন বাংলার রাজ্যপাল। ওই সময় গান্ধী বাংলার অতিথি। যুদ্ধোত্তর বাংলার সমস্যা অন্তহীন। যুদ্ধের চাপে বাংলার সমাজ জীবন বিপর্যস্ত। মন্বন্তর। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি। দ্রব্যের অভূতপূর্ব অভাব। চোরাবাজারের প্রথম প্রচলন। যুদ্ধের সুযোগে হঠাৎ গজিয়ে ওঠে একদল ঠিকাদার। তাদের অনায়াস লব্ধ বিপুল অর্থ ও তার সমাজ দেহে অনুপ্রবেশে তছনছ করা হয়েছে বাঙালীর জীবন।

ওই সময় এলেন গান্ধী বাংলার দুর্ভাগ্যের শরিক হতে। তাঁর ওই কাজ ছাড়াও অন্য একটি দায়িত্ব ছিল, বাংলার বন্দী মুক্তি। ১৯৪৫ সালের মধ্যে সকল প্রদেশের বন্দী মুক্তি সম্পূর্ণ—ব্যাতিক্রম শুধু বাংলাদেশ।

গান্ধীর দীর্ঘ আলোচনা হয় গভর্নরের সঙ্গে। আলোচনা শেষ করে গান্ধী যান প্রথমে প্রেসিডেন্সী পরে আলিপুর জেলে, বন্দীদের সঙ্গে কথা বলেন গান্ধী। সবার শেষে আসেন দমদম জেলে।

গান্ধী এলেন ১৭ই জানুয়ারী সন্ধ্যা ছটায়। তাঁর জেলে আসার খবর

আগে থেকেই জানাজানি হয়। স্বভাবতই বেশ ভীড় জড় হয় জেলের সমুখে।

প্রতিনিধিবৃন্দ ও জেল সুপার কেশব সেনের সঙ্গে জেলের ভেতর প্রবেশ করেন গান্ধী। ভেতরে গেটের প্রশস্ত সাজান রাস্তা ধরে এগিয়ে—ডান দিক ঘুরে বন্দীদের যাবার ঘর পেরিয়ে এলেন ছোট্ট দলটি। ওই অল্প সময়ের ভিতরেই গান্ধীর সঙ্গে আলাপ শুরু করেন কেশববাবু। তিনি কত সুবিধা দিয়েছেন বন্দীদের তা প্রকারান্তরে জারি করেন। সরল মনে তার কাজের তারিফ করেন গান্ধী। ধীরে ধীরে এসে গেলেন ছোট্ট খেলার মাঠে। কেশববাবু বলেন, "এই খেলার মাঠ ব্যবস্থা করা সত্বেও বন্দীদের অভিযোগ যে ওই মাঠ ছোট।

গান্ধী বুঝলেন যে বন্দীদের সঙ্গে জেল কতৃপক্ষের সম্পর্ক মধুর নয়। তাই খিল খিল করে হেসে জবাব দেন "That is also a game with them."

গান্ধীর অভ্যর্থনার জন্যে একটি হলঘর ব্যবস্থা করা হয়। পূজার মন্দিরের মতন সাজন হয় ওই ঘরটি। কিছু শিল্পী সুন্দর আলপনা এঁকে এক মনোরম রূপ সৃষ্টি করে। একটি ছোট্ট তক্তপোশের উপর গান্ধীর বসার ব্যবস্থা। তাঁর ডাইনে বাঁয় ও সমুখে ঘিরে বন্দীরা।

গান্ধী হলঘরের সমুখে এসে ব্যবস্থা দেখে খুশী হয়ে "এত Ceremony হ্যায়" বলেই ভেতরে প্রবেশ করেন। গোয়েন্দাদের উদ্দেশ্যে বন্দীরা চীৎকার করে বলে "জুতো খুলে প্রবেশ করুন।" এ কথা শুনেই জুতো বাইরে রেখে এলেন গান্ধী। আমরা তার জন্য একথা বলিনি তা বুঝেছেন তিনি। কিন্তু আচরণে গান্ধী চিরদিনই অপরাজিত।

হাসি মুখে আসন গ্রহণ করেন। তারপর পাতা ও ফুল মেশানো শক্ত মালা পরাণ হল তার গলায়। মালা হাতে নিয়ে বলেন "এ ত Wreath। এ ত মৃত ব্যক্তিকে দেয়া হয়। আমি কেবলমাত্র ফুলের হার চাই।" আমাদের প্রচলিত ধারার ত্রুটি দেখিয়ে দিলেন নিখুত শিল্প রসিকের মতন। আমাদের ভেতর থেকে একটি বন্ধু দাঁড়িয়ে বলে যে আমাদের মধ্যে একজন বন্দী আছেন যিনি কানে কম শোনেন। তাকে কি গান্ধীর পাশে তক্তপোশের উপর স্থান দেয়া সম্ভব? মুহূর্ত বিলম্ব না করে গান্ধী বলেন "That will be a Concession to me।" কী পরিশীলিত ও মার্জিত রুচি! বন্ধুবর জ্যোতীষ জোয়ারদার আসন নিলেন তক্তোপোশের উপর।

এর ভেতর কিছুটা অপ্রত্যাশিত গুঞ্জন শুরু হয় গান্ধীর সঙ্গে তাঁর একান্ত

সচিব প্যারেলাল। আমাদের ভেতর থেকে দুজন প্রবীন ব্যক্তি একটি পত্র দেন প্যারীলালের হাতে। এতে বাধা দেয় গোয়েন্দা পুলিশ। এ আচরণের জন্যে পুলিশ প্যারেলালের জেলের ভিতরে প্রবেশ করায় আপত্তি তোলে। শ্রীলাল গান্ধীকে জানান একথা। তখন গান্ধী ইংরেজীতে বলেন যে তাঁর সঙ্গে রিচার্ড কেসবীর শর্ত যে তিনি যেখানে যাবেন সেখানে তার সাথে থাকবেন শ্রীলাল। তবে যদি জেল সুপার তার উপস্থিতিতে আপত্তি জানায় তা হলে প্যারেলালের জেলের অভ্যন্তরে না থাকা উচিত। স্বভাবভীরু কেশব সেন পুলিশের কথায় সায় দেয়। ফলে প্যারেলাল বেরিয়ে যান তার হাতের সকল কাগজ পত্র গান্ধীর হাতে দিয়ে। গান্ধী সেগুলি হাতে নিয়ে বলেন যে ওই সব কিছুই সরকারের হাতে দিয়ে দেবেন তিনি। আসলে ওই ধরণের কোন পত্র দেওয়ার প্রয়োজন ছিলনা—আর তা সরাসরি গান্ধীর হাতে না দিয়ে তাঁর সচিবের কাছে দেয়াও কিছুটা নীতিবিরুদ্ধ কাজ হয়েছে। গুপ্ত আন্দোলনে অভ্যস্থ প্রাদেশিক কংগ্রেসের নেতৃত্বের আসনে থাকলেও দীর্ঘদিন গোপনে কাজ করায় অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেননি।

আরম্ভক্ষণে জিজ্ঞেস করেন কোন ভাষায় তিনি তাঁর বক্তব্য রাখবেন। আমরা সমস্বরে জানাই হিন্দি। এ কথা শুনে কত না আনন্দ গান্ধীর। শিশুর মতন হাসি হেসে বলেন আগের দুটি জেলে সকলেই ইংরেজীতে কথা বলেছেন ইংরেজীতে কথাবার্তা চলা তিনি পছন্দ করেন না।

তারপর গম্ভীর স্বরে বলেন যে গভর্ণরের সাথে বন্দীমুক্তি সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে ঠিকই কিন্তু ফলপ্রসূ হয়নি। কারণ তখন যারা জেলে ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট খুব খারাপ। তিনি বন্দী মুক্তির জন্য সরকারের কাছে হেঁট হতে চাননা—আর বন্দীরাও তা নিশ্চয়ই চাননা। অতএব আমাদের আশু মুক্তির সম্ভাবনা নেই।

গান্ধীকে যে সকল সামগ্রী দেয়া হয় তার মধ্যে কিছু হাতে কাটা সুতো ছিল। ওই সুতো হাতে নিয়ে খুশী চিত্তে বলেন যে শিক্ষিত বুদ্ধিমান মানুষ যদি সুতো কাটেন, সাধারণ কাটুনির হাতের সুতোর চেয়ে এর মূল্য ঢের বেশী। কিছুটা আবেগের সঙ্গে বলেন "তোমরা আমার সঙ্গে কাজ করলে না তার জন্য আমার দুঃখ হয়। তোমরা বুদ্ধিমান কর্মী—intellectual, তোমরা আমার সঙ্গে কাজ করলে আমি অনেক কিছু করতে পারতাম।" কিছুটা আত্মস্থ হয়ে গর্বের সঙ্গে বলেন "তবে আমি কিছু করিনি এমন নয়। যেদিন

ভারতবর্ষে আসি তখন অনেক কিছু ছিলনা। আমি তোমাদের জাতীয় পতাকা দিয়েছি—দিয়েছি একটি জাতীয় ভাষা, আর জনতার জাতীয় সংগঠন, সকলের উপর আমি দিয়েছি জাতীয় চেতনা (জাগৃতি)। জাগৃতি কত ব্যাপক ও গভীর তা শুনলে আশ্চর্য হবে। আমি হালে আসামে গিয়েছিলেম সেখানে আদিবাসীরা এসেছে দলে দলে। তারাও আছে আমার সাথে। আমি ঈশ্বরের কাছে রোজ প্রার্থনা করি ঈশ্বর তুমি আমাকে ১২৫ বছর বাঁচিয়ে রাখ। এখনো অনেক কাজ বাকি।"

একথা বলে আবার পুরানো কথায় ফিরে এসে বলেন, "আবার তোমাদের কাছে অনুরোধ তোমরা অহিংসায় পূর্ণ বিশ্বাস রাখ। এমন শক্তিশালী অস্ত্র আর নেই। হিংসায় কোন কল্যাণ হয় না। axis ছিল হিংসার উন্মত্ত। সে axis কি আর আছে? তেমনি দশা হবে Big threeর। ওরাও ধুলায় নাক ঘষবে। কিন্তু গান্ধী কারো কাছে কোন দিন মাথা হেট করেনি। এখন atom Bomb হয়েছে। কিন্তু atom Bomb ও অহিংসার কাছে পরাজিত হবে। তোমরা অহিংসার আস্থা রাখবে এই আমার আশা।

"দেখ বাংলায় কত দুর্দিন। বাংলায় কোন নেতা নেই। আমি শরৎ বোসকে বলেছি (গলা পর্যন্ত হাত দিয়ে দেখিয়ে) অহিংসায় বিশ্বাস করো। সব বড় বড় দল ছিল, অনুশীলন, যুগান্তর। ওরা ত এখন লোপ (গায়েব) পেয়ে গেছে। বাংলায় অনেক অনেক দল। এখানে গান্ধীরও নাকি দল আছে। তাদের ভেতরও নাকি তিনটি গোষ্ঠি—একটি প্রফুল্ল ঘোষের, আর একটি সতীশ দাসগুপ্তের। এক সময় বাংলায় ত এক প্রসিদ্ধ (মশহুর) নেতা ছিলেন। তিনি আর কেউ নন—তিনি চৈতন্যদেব। শুনেছি সোদপুরের কাছেই তার এক মন্দির আছে। এতদিন আমি জানতাম না, কেউ আমাকে বলেওনি। আমি সতীশবাবুকে বলে কাল কি পরশু ওই তীর্থে যাব। নেতারা ভুল করলেও তোমরা তাদের আদেশ মানবে, নইলে কোন সংগঠন টিঁকতে পারে না।

প্রায় এক ঘণ্টা আলোচনার পর মনে হল যে ক্লান্ত তিনি। তখন বয়স ৭৭। বন্দীদের ভেতর থেকে প্রশ্ন এল, "শুনলাম বাংলা শিখছেন, বলুন না বাংলা কথা! হেসে বলেন, "বাংলা যদি বলতে হয় তবে গুরুদেবের কথাই বলব—অন্তর মম বিকশিত কর অন্তর তর হে।"

আবার প্রশ্ন এল, "আপনি স্বাধীনতার চেয়ে সত্যকে উপরে স্থান দিয়ে

থাকেন"। একটু গম্ভীর হয়ে বলেন "এ অত্যন্ত বাঁকা কথা—এ ধরণের কথা আমি বলিনা"। কাঁথির পরিমল রায় প্রশ্ন করে "Is the August movement a Success ?" নিমেষের মধ্যেই ইংরেজীতে জবাব দেন "Yes to the extent it has roused mass Conciousness not, to the extent it has deviated from non violence." এই dialectical জবাব দিয়ে ওই সূত্রধরে বলেন "আজ সকালের কাগজে নিশ্চয়ই দেখেছ অচ্যুত পট্টবর্দ্ধন ও অরুনা আসফআলির বক্তব্য। ওরা আন্দোলন সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন। ওই সব কথা ঠিক নয়। ওরা কাজ করেছে খুবই, কিন্তু মূল্যায়ন ঠিক নয়। অচ্যুত অবশ্য পণ্ডিত মানুষ—ভাল কর্মী। আমার কাছে খুব আসত। আর অরুনা ?" বলে খিল খিল করে হেসে বলেন "ও ত মেয়েছেলে (লড়কী)।"

কতকটা আবেগে বলতে থাকেন—"তোমাদের সাথে দীর্ঘ আলোচনা করলাম। এমনি দীর্ঘ আলোচনা করিনা। করলাম তার প্রধান কারণ তোমরা আমাকে হিন্দীতে বলতে অনুমতি দিয়েছ। এখন রাত প্রায় দশটা। আমি শেষ বারের মতন আবার বলি—তোমরা অহিংসায় আস্থা স্থাপন কর। এমন অমোঘ অস্ত্র আর নেই। আমার দৃঢ় প্রত্যয় যে তোমরা একদিন অহিংসায় বিশ্বাস করবে। কিন্তু সেদিন আমি এ জগতে থাকবনা। তখন তোমাদের মনে পড়বে আমাকে। ভাববে এই শীতের রাত্রে একটি বুড়ো পাগল আমাদের কাছে অহিংসার কথা বলেছিলেন—কিন্তু আমরা তাঁর কথা শুনিনি," এই বলেই লাঠিখানি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে বলেন, "চলো"।

ওঠার সময় এমন একটি আবেগ সৃষ্টি করেন যে সমগ্র বন্দী জনতা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে প্রণাম জানায়। শৃংখলার সাথে চলেন সবাই। সমূখে গান্ধী। পেছনে প্রায় দুশ' বন্দী। ধীর পদক্ষেপে উপস্থিত হন ভেতরে গেটের সমূখে। ওখানে অপেক্ষা করছিলেন বিনোদ বেরা। দাশপুর দারোগা হত্যা মামলার আসামী। ১৯৩০ সালের সত্যাগ্রহের সময় থেকে বিনোদবাবু সাধারণ কয়েদীর মতন রয়েছেন। লবন সত্যাগ্রহের সকল বন্দী মুক্তি পেয়েছে দীর্ঘ ১৬ বছরের মধ্যে। এর ভেতর একটা বিরাট বৈপ্লবিক আন্দোলন হয়ে গেল। ওই উপেক্ষিত বন্দীটার কথা বোধ হয় অনেকের স্মরণে ছিলনা। তাই দীর্ঘ ১৬ বছর তিনি জেলে। গান্ধীজী পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসে বিনোদ বাবু লুটিয়ে পড়েন গান্ধীর পায়ে। তারপর সে কী কান্না! বিনোদবাবুকে আপন হাতে তুলে নিলেন গান্ধী। আশ্বাস দিলেন যে তার কথা মনে

থাকবে তাঁর। বন্দী আনন্দে ফিরে গেলেন আপন কারা কক্ষে। তার কোন সংশয় রইলনা তার আসন্ন মুক্তি সম্বন্ধে। গান্ধীর আশ্বাস সরকারী আশ্বাসের সমতুল্য। গান্ধী এক ধরণের parallel Government.

আমরা ফিরে এলাম আপন আপন সেলে। খাওয়ার সময়ে স্বতই কথা হল গান্ধীর আলোচনা সম্পর্কে। তখন ৭নং ওয়ার্ডে আমরা কয়েকজন মাত্র উপরতলায় থাকি। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন জ্ঞান মজুমদার ও ত্রিদিব চৌধুরী। দীর্ঘ আলোচনা হল নেতৃত্বের পরিকল্পনা সম্পর্কে। বাংলা সম্পর্কে গান্ধীর ঔৎসুক্য চিরদিনের। বাঙালী তা বুঝতে চায়নি। তার অনেক কারণ। প্রধান কারণ বাংলা দেশ থেকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের কেন্দ্রবিন্দুর অপসারণ বা স্থানান্তর।

বাংলার জন্য

বিপ্লবীরা গ্রেপ্তার হয়েছেন বারে বারে আর তাদের মুক্তির জন্যে গান্ধী এসেছেন বারংবার। অথচ বিপ্লবীরা তাঁর নীতিতে কখনই পূর্ণ আস্থা স্থাপন করেন নি। তা সত্বেও এসেছেন তিনি। কারণ গান্ধী মূলত মানবধর্মী। Humanist।

দেশবন্ধু যতদিন জীবিত ছিলেন তখন এ দায়িত্ব তিনি নেননি—কারণ দেশবন্ধু তারই সমপর্যায়ের নেতা। কিন্তু তাঁর তিরোধানের পর এসেছেন বারংবার। এমনকি দেশবন্ধুর তিরোধানের পরের দিন শিয়ালদহ স্টেশনে তার শবদেহ গ্রহণ করেন তিনি নিজে তারপর প্রায় দীর্ঘ একমাস কলকাতায় থেকে তার স্মৃতির জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন। আজিমগঞ্জ জিয়াগঞ্জের মতন ছোট শহরে গিয়েছেন অর্থসংগ্রহ করার জন্যে। দেশবন্ধুর রসারোডের বাড়ি মহাজনের কাছে ঋণের দায়ে বাঁধা। তা মুক্ত করার জন্যে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রয়োজন এবং ওই বাড়ীতে সেবা সদন প্রতিষ্ঠা। সবকিছুই করেছেন তিনি সকল কাজ ফেলে। দেশবন্ধুর কাজ ছিল সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। তারপর বড় কাজ ছিল সেনগুপ্তকে দেশবন্ধুর উত্তরাধিকারী করা। তেমনি এসেছেন দুর্গত মেদিনীপুরে। তমলুক ও কাঁথি মহকুমার গণ্ডগ্রামে। ১৯৪৩ সালের বৃটিশের অত্যাচার, প্রকৃতির অভিশাপে বিপর্যস্ত মেদিনীপুরে এসে দুর্গতদের পাশে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা দিয়েছেন সকলকে। যেখানে স্বাধীন সরকার গড়ে উঠেছিল সে ত তার তীর্থস্থান। হিংসা অহিংসার কথা তোলেননি— অথচ অহিংসার পূজারী গান্ধী!

তেমনি এসেছিলেন নোয়াখালিতে ১৯৪৬ সালের নভেম্বরে। অনুন্নত জিলা নোয়াখালী, মনুষ্যত্বের অবমাননার চূড়ান্ত প্রকাশ হয়েছে ওখানে। মাতৃজাতির অভূতপূর্ব অবমাননা। মানবতার প্রতি নিষ্ঠুর পরিহাস। তখন দিল্লীতে ক্যাবিনেট মিশনের আলোচনা ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি তাকে। মানবতায় অপমানের প্রতিকার সবার আগে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বাঙালী তাঁকে সর্বদাই ভুল বুঝেছে। তিনি বাঙালী বিদ্বেষী, বাংলা বিদ্বেষী। এই অভিযোগ বাংলার ব্যাপারে হয় ভুল করেছেন। কিন্তু এর পেছনে ছিলনা কোন অপকৌশল।

১৯৩৮ সালে শান্তি নিকেতনের দারুণ অর্থাভাব। তখন গুরুদেবের বয়স ৭৮। দলবল সহ দিল্লী গেছেন। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থসংগ্রহ করবার পরিকল্পনা। গান্ধী তখন দিল্লীতে। এ খবর গেল গান্ধীর কানে। বেদনায় ভরে ওঠে তাঁর মন। টেলিফোন করে জানতে চান কবিগুরুর দিল্লী পরিভ্রমণের উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সংকল্প জানালে গান্ধী ব্যথিত চিত্তে জিজ্ঞেস করেন ওই সামান্য অর্থের জন্য ৭৮ বছর বয়সে অনুষ্ঠান করতে হবে আপনাকে? জিজ্ঞেস করেন কত টাকার দরকার। আমি যতদূর শুনেছি ৬০ হাজারের মতন। গান্ধী রবীন্দ্রনাথকে তাঁর পরিকল্পিত অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করেন। দুদিন পরে রবীন্দ্রনাথের হাতে ওই টাকার একটি চেক পৌঁছিয়ে দেন। একজনেই ওই টাকা দিয়েছিলেন। আমি তার নামও জানি। আমরা বাঙালীরা কিন্তু আমাদের প্রিয়তম কবির জন্য ওই অর্থসংগ্রহ করে দিতে পারিনি।

ঠিক ওই কারণেই এক বছর পরে গান্ধীর হাতে একটি শীলমোহর করা পত্র দেন বোলপুর ষ্টেশনে। গান্ধী গুরুদেবের দর্শনের পর ফিরছিলেন। সে পত্রে ছিল গুরুদেবের অবর্তমানে বিশ্বভারতীয় দায়িত্ব নেয়ার অনুরোধ। গান্ধী সে দায়িত্ব নিতে স্বীকার করেছিলেন। তখন ইংরেজ রাজত্ব ছিল। সরকারী সাহায্য ছাড়াই তিনি দায়িত্ব নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন কবিগুরুকে। নিশ্চিত হলেন রবীন্দ্রনাথ। এই হল গান্ধী।

নেহেরুর ভুল

১৯৪৫ সালে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সবাই মুক্তি পেলেন। শুরু হল আলোচনা। হয় সিমলা বৈঠক। জিন্নার সঙ্গে কথাবার্তা চলে কিন্তু এ আলোচনা ব্যর্থ হয়

দারুণভাবে। ১৯৪৬ সালে এল ক্যাবিনেটমিশন। ত্রিপাক্ষিক আলোচনার পর ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। সে প্রস্তাব সকলের জানা।

জওহরলাল কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন। সর্দার প্যাটেল তা চাননি।

নেহেরু কংগ্রেস সভাপতি হয়ে প্রথমে যে বক্তব্য রাখেন তাতে রাজনীতির ধারা সম্পূর্ণ বদলে যায়। তিনি আবেগধর্মী মানুষ। অহেতুক বামঘেঁষা মনোভাবের বশবর্তী হয়ে তিনি জানান যে ক্যাবিনেট মিশন তারা পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি। গ্রহণ করেছেন কেবল Constituent Assembly গঠনের ধারা। সাংঘাতিক বিবৃতি। Grouping মানা হবে না বা অন্ত কিছু মানা হবে না—তাহলে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানের রইল কি? নেহেরু উত্তেজনার বশে বলেন যে Constituent Assembly হয়তো ফরাসী ইতিহাসের Tennis court meetingএ রূপান্তরিত হতে পারে।

এই দায়িত্বহীন বক্তব্যের সম্পূর্ণ সুযোগ নিল মোসলেম লীগ। তারা জানাল যে নেহরু মিশন প্ল্যান মানেনা—অতএব তাদের রাস্তা পরিস্কার। তাদের রাস্তাও সংগ্রামের রাস্তা।

নেহেরুর এই বক্তব্যে সকল কংগ্রেস নেতা ও কর্মী স্তম্ভিত ও ক্ষুব্ধ। মিশন প্ল্যানের সমাধি হল। ভারতীয় ঐক্য চিরতরে শেষ হয়ে গেল। ভারত বিভাগ তথা পাকিস্থানের রক্তরাঙা গলিপথ উন্মুক্ত হল। উত্তরকালে নেহেরু এর সংশোধন করতে চেষ্টা করেছেন সত্য কিন্তু তখন দেরী হয়ে গেছে। ইতিহাস এই ভুল ক্ষমা করেনি।

আজাদ হিন্দ সৈন্যাধ্যক্ষের বিচার

১৯৪৫ সালের সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনা আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনীর নেতাদের বিচার। লাল কিল্লার বন্দী তারা। ভারতের বিভিন্ন জেলে এ ধরণের অনেক বন্দী ছিল।

বিচার শুরু হওয়ার সাথে সাথে ভারতবর্ষে এক অগ্নিগর্ভ বিক্ষোভ দেখা দেয়। এই বিচারের ভেতর দিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনী তথা সরকারের ঘটনাবলী প্রকাশ পায়। এই সরকারের বীরত্ব কাহিনী ও সংগঠন শক্তির কথা শুনে গর্ববোধ করল সারা দেশের মানুষ। তাদের প্রিয়তম নেতা ভারতের বাইরে কী অসাধারণ কাজ করেছেন সে কাহিনী দাবানলের মত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সারা দেশ জুড়ে নেতাজী সম্পর্কে চারণ গাঁথা। 'কদম কদম

বাড়ায়ে বা' এই সঙ্গীতেও জয়হিন্দ ধ্বনিতে দেশের আকাশ বাতাস মুখরিত। লাল কিল্লার বিচার গণজাগরনের দুয়ার খুলে দেয়। মানুষের মনে বেদনা বোধ ছিল। নেতাজীর জন্যে। একদিন কংগ্রেস দলের শাস্তিপ্রাপ্ত এ বীর সন্তান আপন মাতৃভূমি ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে ভারতবাসীর অন্তরের জ্বালা সীমাহীন।

বিচার চলতে থাকে। আর দিনের পর দিন সারা ভারতবর্ষের মানুষ যেন লাল কেল্লার দিকে এগিয়ে চলেছে। কণ্ঠে তাদের জয়ধ্বনি। তাদের বজ্রনির্ঘোষ জানিয়ে ছিল যে লাল কেল্লা আর ইংরেজের কবলে থাকবে না। ও দুর্গ ভারতবর্ষের।

এই সময় আলিপুর জেলেও কয়েকজন সামরিক আইনে অভিযুক্ত বন্দী ছিলেন। তার মধ্যে ডাঃ পবিত্র রায় ও হরিদাস মিত্র ছিলেন। হরিদাসবাবু নেতাজী পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। পবিত্রবাবু নেতাজীর নির্দেশে মালয় থেকে ভারত উপকূলে অবতরণ করেছিলেন। তার লেখা একখানি পত্র দেখতে পেলাম প্রতুলদার (প্রতুল গাঙ্গুলীর) কাছে। পবিত্রবাবু অনুশীলন দলের সভ্য। প্রতুলবাবুও আলিপুর জেলে ছিলেন তখন। সেই সময় গোপনে এই পত্রখানি পাঠান তার নেতার কাছে। সেই পত্রখানি মৃত্যু পথযাত্রীর এক তুলনাহীন সামগ্রী। উত্তরকালে এদের মুক্তিবিধান করে এক অসাধ্য সাধন করেছেন গান্ধীজী।

কিছুদিন পরে নৌবিদ্রোহ হয় বোম্বাই-এ। সেই বিদ্রোহের সমর্থনেও বিরাট বিক্ষোভ দেখা দেয়—বিশেষ করে বোম্বাই শহরে। সর্দার প্যাটেলের হস্তক্ষেপে এই বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি হয়। সেনা ও নৌবাহিনীর পর Air Force এর বিক্ষোভের স্ফুরণ হয়। তবে তা সেনা বা নৌবাহিনীর মতন ব্যাপক নয়।

প্রতিরক্ষার তিনটি ক্ষেত্রে ব্যাপক অসন্তোষ বৃটিশ সরকারের চোখ খুলে দেয়। শ্রমিক দলের নেতৃবৃন্দ অপেক্ষাকৃত উদার মতাবলম্বী। সাম্রাজ্যের ব্যবসা যে অচল—সে কথা হৃদয়ঙ্গম করল তারা। শ্রমিক দলের কাছে প্রশ্ন, তারা স্বেচ্ছায় ভারত ত্যাগ করবে, না তাড়িত হয়ে যাবে। শ্রমিক সরকার চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এ এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। স্বেচ্ছায় কোন সাম্রাজ্যবাদী সরকার তার অধিকৃত দেশ পরিত্যাগ করে যায়—এরকম সচরাচর দেখা যায় না।

পনের ঃ হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা ও ভারতবিভাগ

মানুষকে সঙ্গে পেতে হলে গান্ধী ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু ১৯৪৬ সাল থেকে কংগ্রেস দেশের নেতৃত্ব চালাতে চেয়েছেন সরকারী প্রশাসনের মাধ্যমে। প্রশাসন ত তখনো বৃটিশের হাতে। প্রশাসনের বাইরে বা প্রশাসনকে অকেজো বা অনাবশ্যক করে অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন ছিল। তা একমাত্র গান্ধী করতে সক্ষম। সরকার তার সমস্ত সৈন্যবাহিনী দিয়েও একটি বড় দাঙ্গা দমন করতে অক্ষম। তারা হাজার হাজার মানুষ হত্যা করতে সক্ষম—কিন্তু জনমত গঠন করা তাদের অসাধ্য। গান্ধী এ দুঃসাধ্য কাজ করতে সক্ষম তার নৈতিক শক্তির প্রভাবে। কিন্তু গান্ধীকে এক পাশে ঠেলে দেওয়া হল, কারণ তিনি নাকি প্রশাসনের জটিলতা বোঝেন না। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখ করা উচিত।

নোয়াখালির পরে দাঙ্গার দাবানল জ্বলে ওঠে বিহারে। বিহারের দাঙ্গা কলকাতায় বিরাট হত্যালীলার (Great Calcutta killing) চেয়েও অনেক ব্যাপক ও অধিক ভয়ঙ্কর। দাঙ্গা নিবারণের জন্য বিহারে আসেন জওহরলাল ও লিয়াকত আলী। দাঙ্গার নিষ্ঠুর নৃশংসতার কথা শুনে কেবল লিয়াকত আলী বিচলিত নন—জওহরলালও অভিভূত। পণ্ডিতজী তার নিরপেক্ষতা প্রমাণ করার জন্য ঘোষণা করেন যে দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য তিনি বজ্রের মত কঠোর—প্রয়োজন হলে বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করে হত্যাকারীদের সাজা দেওয়া হবে। পণ্ডিতজীর এই উক্তি গান্ধীকে ব্যথা দেয়। তিনি তখন নোয়াখালিতে। সাথে সাথে তিনি বিজ্ঞপ্তি দেন "That is the British method।" হিংসা—তা যত ভীষণই হোক না কেন—হিংসার দ্বারা সাম্প্রদায়িক কলহ মেটানো যায় না। দাঙ্গাকারী দুটি উন্মত্ত দলের মধ্যস্থানে দাঁড়িয়ে শুধু উপস্থিতির জোরে যুক্তিদ্বারা দাঙ্গা বন্ধ করবেন! যদি সক্ষম না হন—তাহলে আত্মাহুতি করবেন। কানপুরে গনেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী এমনিভাবে আত্মাহুতি দানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পণ্ডিত নেহেরু যা বলেছেন—তা তো বৃটিশের মনোভাব ও প্রণালী। প্রশাসনের সহায়তায় বা বোমার ভয় দেখিয়ে বিহার দাঙ্গা বন্ধ হয়নি।

গান্ধী বনাম কংগ্রেসী প্রশাসন

গান্ধী সেবার পাটনায় ডঃ সৈয়দ মামুদের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন—সাদাকত আশ্রমে নয়। তিনি এখানে আসার পর সাম্প্রদায়িক কলহ বন্ধ করার স্থায়ী ব্যবস্থা হয়। তখন কিছুদিন ছিলেন পাটনায়। ঐ সময়ের কিছু আগে বিহারে পুলিশ বিদ্রোহ হয়। ঐ বিদ্রোহের নেতা ছিলেন রামানন্দ তেওয়ারী। তেওয়ারীজী বিদ্রোহ চালাতেন আত্মগোপন করে। পলাতক তেওয়ারজীকে গান্ধীর কাছে নিয়ে যান জয়প্রকাশ নারায়ণ। সকল কথা শোনেন গান্ধীজী। আলোচনা শেষ করে বেরিয়ে আসেন তেওয়ারীজী। সদর দরজায় বিহার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে আসে। এত বড় শিকার কেমন করে ছাড়বে পুলিশ! অতএব গ্রেপ্তার কর পলাতক আসামীকে। রামানন্দবাবু ভেতরে গিয়ে "বাপু"কে জানান যে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে চায়। গান্ধী স্বয়ং বেরিয়ে এলেন। পুলিশের অধিকর্তাকে জানালেন যে তেওয়ারী তার কাছে এসেছিলেন—তার আশ্রিত। তাকে গ্রেপ্তার করা চলে না। পুলিশ শ্রীবাবুর (শ্রীকৃষ্ণ সিংহ) সাথে পরামর্শ করে ছেড়ে দেন তাদের দুজন শিকারকে।

এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে বিহারের মন্ত্রী কৃষ্ণবল্লভ সহায় বিনয়ের সহিত গান্ধীকে সত্বর বিহার পরিত্যাগ করতে বলেন। গান্ধী কারণ জানতে চান। শ্রী সহায় জানান যে গান্ধীজী বিহারে অধিকদিন থাকলে বিহারের প্রশাসন ব্যবস্থা ভেঙে যাবে। অবাক বিস্ময়ে গান্ধী জানতে চান যে—তা কেমন করে হল। উত্তরে শ্রী সহায় জানান যে তিনি জয়প্রকাশ নারায়ণকে খুব প্রশ্রয় দেন। জয়প্রকাশ সরকারের পক্ষে নন। তিনি পুলিশ বিদ্রোহের সমর্থক। জয়প্রকাশকে সমর্থন জানালে পুলিশ আস্কারা পাবে এবং তার ফলে প্রশাসনের দারুণ ক্ষতি অনিবার্য।

চমকে ওঠেন গান্ধীজী এই দারুণ কথা শুনে। অল্পক্ষণ গম্ভীর থেকে হেসে বলেন—"দেখ, আমাকে প্রশাসনের কথা না বলা ভাল। একটি কথা মনে রেখ যে ভারতবর্ষের প্রত্যেক নেতাকে আমি নিজের হাতে রচনা করেছি—কেবল সুভাষ ও জয়প্রকাশ ছাড়া। এরা দুজন আপন আপন কক্ষপথে বড় হয়েছে। গান্ধী মর্মাহত হয়ে ফিরে গেলেন পাটনা থেকে।

নির্বাসিত নায়ক

গান্ধীজী সকল কিছু থেকে বহুদূরে—দাঙ্গা বিধ্বস্ত ক্ষেত্র ভ্রমণরত ভারত পথিক। সর্দার প্যাটেল ও তার মতাবলম্বীরা গান্ধীকে সকল ব্যাপার থেকে দূরে রাখতে চায়। দিল্লীতে উপরতলার সকলেই ক্ষমতার জন্য উন্মাদ। রাষ্ট্রক্ষমতার হাতছানি। যে কোনভাবে হোক (দেশ ভাগ করেও যদি হয়) নিতে হবে ক্ষমতা। এ সময় গান্ধীজীকে দিল্লীতে রাখা উচিত ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি। বলা হয় নিজের ইচ্ছায় এই কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন তিনি। ছেঁদো যুক্তি। নেহেরু প্যাটেল জোর করে তার উপস্থিতি চাইলে—তিনি কি কখনও অস্বীকার করে থাকতে পারতেন? আসলে গান্ধীর উপস্থিতি যদি কোন বাধা সৃষ্টি করে এই ছিল ওদের ভয়। লীগ কিন্তু সকল ক্ষমতা জিন্নার হাতে রেখেছে। কংগ্রেস, লীগ ও ভাইসরয়—এ তিন পক্ষের লড়াই-এ জিন্না উপস্থিত—কিন্তু গান্ধী অনুপস্থিত। এই আলাপ আলোচনায় কংগ্রেস নেতৃত্ব দিশেহারা ও পর্যুদস্ত। কংগ্রেস নেতৃত্বের ভেতর ঐক্যের অভাব। ভাইসরয় মাউন্ট ব্যাটেন এ খবর ভাল করে জানতেন। এই সময়কার ইতিহাস সবটুকু কেউ জানে না। যেটুকু জানা যায় বিভিন্ন কর্মকর্তাদের লেখা থেকে—তাতে, লজ্জায় মাথা হেঁট হয়। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন নেহরু প্যাটেলের মত-পার্থক্যের সুযোগ নিয়েছিলেন পুরোপুরিভাবে। কংগ্রেস নেতৃত্বের ভেতরকার সকল খবর জানতেন তিনি এবং যাকে যেভাবে প্রয়োগ করা দরকার তাই করেছেন ভাইসরয়। সব প্রাচীন কংগ্রেসী নেতারা সাংঘাতিকভাবে মার খেয়েছেন একজন তরুণ ইংরেজ শাসকের কাছে। চরম পর্যায়ে আমাদের রাষ্ট্রপিতাকে জানাতে সাহস করে বৃটিশ ভাইসরয়—"Mr. Gandhi, the Congress Working Committee is with me." এ সকলই হল পরাজয়ের লক্ষণ। সেদিন রাষ্ট্রপিতা তার স্বভাবসুলভ ভাষায় মাউণ্ট ব্যাটেনকে জানিয়েছিলেন—But the country is with me"। এত বড় সত্য কথা আর হয় না। কিন্তু তা প্রমাণ হল কোথায়? কংগ্রেস নেতৃত্ব সে সুযোগই দেন নি। তারা ক্ষিপ্র গতিতে তাদের deal শেষ করে ফেললেন। তারা পাকিস্থান স্বীকার করে নেন। সর্দার প্যাটেলের ভারত বিভাগে কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু পণ্ডিত নেহেরু ভাইসরয়ের চাতুর্যের কাছে পরাজিত হন। তিনি একটি কৌশল অবলম্বন করার জন্য নেহেরুর সমর্থন চান। মাউণ্ট ব্যাটেন বলেন যে পাকিস্থান এক বাতুলের পরিকল্পনা। কিন্তু কৌশলের

জন্ত সরাসরি পাকিস্থানের বিরোধিতা না করে পাকিস্থান পরিকল্পনা স্বীকার করে তা কার্যকরী করার অসম্ভাব্যতার কথা বোঝাতে চান। অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্থান—সরাসরি যোগাযোগের অভাব—অতএব এই পোকায় খাওয়া পাকিস্থান জিন্না নিতে রাজী হবেন না। অন্যান্য প্রশাসনিক অসুবিধা সম্পর্কেও জিন্নার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। এই পরিকল্পিত কৌশল অবলম্বনে সরল বিশ্বাসে নেহেরু সম্মতি দেন। নেহেরুর এ সম্মতি পরোক্ষে পাকিস্থান সমর্থন। এই ফাঁদ থেকে পণ্ডিতজী আর বেরিয়ে আসতে পারেন নি। দাম্ভিক জিন্না—জেদী জিন্না—moth eaten পাকিস্থান গ্রহণ বরেন।

ভারত ভাগ হল। ভারতমাতার গিরি নদী প্রান্তর ভাগ হয়ে গেল। মানুষ ভাগ হল—ভ্রাতৃত্ব ভাগ হল—ভাগ হল সৌহার্দ্য। ভারতীয় ঐতিহ্যের মোড় ঘুরে গেল।

১৫ই আগষ্ট গান্ধী কলকাতায়। বেলেঘাটায় একটি বাড়ীতে। সেদিন তিনি আনন্দ করেন নি—উপবাসী ছিলেন সারাদিন। প্রার্থনা করেছেন সকলকে শুভবুদ্ধি ফিরিয়ে দেবার জন্য। সত্যাশ্রয়ী ঋষি রাজনীতিক আবেগভরে বলেছিলেন তার সহযোগীদের—"আর একটি গণআন্দোলন করতে দাও—ভারত বিভাগ মেনে নিও না"। কিন্তু কে শোনে তার কথা। কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ গান্ধীকে দেশবিভাগের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। কিন্তু তিনি বিরোধিতা করার জন্যে জয়প্রকাশ প্রভৃতিকে পরামর্শ দেন। জানান যে জীবনের সায়াহ্নে নিজ সৃষ্টি সহকর্মীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আন্দোলন পরিচালনা করার সামর্থ তার নেই। ১০ বছর আগে হলে তিনি সাহস করতেন।

গান্ধীর এ কাজের সমালোচনা হয়েছে প্রচণ্ডভাবে। তাঁর মতন মানুষের নেহেরু প্যাটেলের প্রতি দুর্বলতা কেন? তার শারীরিক শক্তির অভাব মেনে নিলেও ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব সরাসরি বিরোধিতা না করা সঙ্গত হয়নি। জীবনে তিনি সর্বদা একাই চলেছেন অজানা পথে। আবার চলতেন! তার ফল কী হত তা আলাদা কথা। হয়ত A. I. C. C. তে তিনি পরাজিত হতেন—কিন্তু ইতিহাসের কাছে তার দাবি আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে থাকত।

ষোল ঃ মুক্তির পর

ভাঙা মন নিয়ে বেড়িয়ে আসি বন্দী নিবাস থেকে, বাইরে এসে বিচার বিশ্লেষণ করি বন্ধুদের সঙ্গে। আমার বেদনার অন্ত নেই। তখন রাজনৈতিক জীবনের পঁচিশ বছর পূর্ণ করেছি আমি। ওই ২৫ বছর কোন বিশ্রাম নেইনি রাজনৈতিক কাজ থেকে। বিপ্লবী দলের কঠোর অনুশাসন মেনে নিবিড়ভাবে কাজ করেছি। প্রাণ বিসর্জন দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম আমি। সেই বাঞ্ছিত স্বাধীনতা যেদিন এল—সেদিন আমরা পরিত্যক্ত। এ এক বিষম ব্যথা। আর· এস· পি পুরানো অনুশীলনের রাজনৈতিক প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। জাতীয় আন্দোলনে অনুশীলন সমিতির অবদান নগণ্য নয়। কেবল বাংলাদেশের প্রভাবশালী শক্তি ছিল না অনুশীলন দল, বাংলার বাইরেও বিশেষ করে উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবে এ দলের শক্তি অগ্রাহ্য করার মতন নয়। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, প্রতুল গাঙ্গুলী, শচীন সান্যাল, যোগেশ চ্যাটার্জী প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে খুবই পরিচিত, বিপ্লবী হিসেবে, বামপন্থী হিসাবে। অনুশীলন দলের এ মূলধন আপন ভাণ্ডারে সঞ্চয় করতে ব্যর্থ হল আর· এস· পি। এর প্রধান কারণ আর· এস· পি-র পুঁথি ঘেষা কর্মনীতি।

ছত্রভঙ্গ আর· এস· পি·

আর· এস· পি-র নেতৃত্বের ব্যর্থতা প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেছে প্রবীণ নেতৃবৃন্দকে। অত্যন্ত অসহায়বোধ করেন তাঁরা। প্রাদেশিক কমিটি তাড়াহুড়া করে নির্বাচন শেষ করেছে প্রবীণ নেতৃবৃন্দের মুক্তির অল্প কিছুদিন পূর্বে। বন্দী মুক্তির নীতি যখন নিয়েছে নির্বাচিত লীগ সরকার তখন ২।৪ মাস অপেক্ষা করা উচিত ছিল কমিটি নির্বাচনের ব্যাপারে। কিন্তু তা না করার ব্যাপারটি ভালো চোখে দেখেন নি নেতৃবৃন্দ। তাদের ধারণা হল যে তাঁদের বাদ দিয়ে চলতে চায় প্রাদেশিক কমিটি। এর উপর কমিটির আর একটি কাজে বিষম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। মহারাজ, রবি সেন, প্রতুল গাঙ্গুলী প্রভৃতি আর· এস· পি-র founder member দের কাছে একটি করে applicant membership form পাঠিয়ে দেয় কমিটি। এর চেয়ে

ঘোরতর অবিবেচনার কাজ আর কী হতে পারে! এ কাজটি খুব খারাপ চোখে দেখেন এঁরা। নতুন করে সভ্য করার প্রক্রিয়া তাঁদের রাজনৈতিক সম্মানে আঘাত করে। ফলে ভুল বোঝাবুঝি বেড়ে গেল প্রচণ্ডভাবে।

বিগত ৪০ বছর যারা দলের নেতৃত্ব করেছেন, বাংলার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে যারা খুবই পরিচিত, কেবল পরিচিত নয় সম্মানিতও, তাদের প্রতি সৌজন্যের অভাব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এঁরাও নীরব দর্শক হয়ে থাকতে চান নি। সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। সুরেন ঘোষ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির তরফ থেকে আহ্বান জানান আবার সরকারী কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্যে (কারণ আমরা সকলেই বাতিল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্য ছিলাম)। কথা হয় শরৎবাবুর সংগে। শরৎবাবু তখন কেন্দ্রীয় বিধান সভায় কংগ্রেসের নেতা। বাংলার কংগ্রেস রাজনীতির উপর কিছুটা বিরক্ত। তার প্রধান কারণ প্রাদেশিক বিধানসভার নির্বাচন। এখানেও কতকটা ১৯৩৯-৪০ সালের মনোভাব কাজ করে। শরৎবাবুও বাতিল বি. পি. সি. সি.র নেতা। কিরণশংকর রায় ও খাদি গোষ্ঠির সম্মিলিত শক্তি শরৎবাবুকে কতকটা কোণঠাসা করে। শরৎবাবু সবকিছু মেনে নেন গান্ধীর অনুরোধে। গান্ধী শরৎবাবু ও সত্যরঞ্জন বকসীকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে বাংলার নেতৃত্ব আবার তাদের হাতে তথা বাতিল বি. পি. সি. সির নেতাদের হাতে ফিরিয়ে দেবেন। কারণ প্রাদেশিক কমিটি বাতিল করার ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ভুল সংশোধন করতে চেয়েছেন তিনি। গান্ধীজী তার কর্মব্যস্ততা, বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্যে এ বিষয়ে মন দিতে পারেন নি। মহারাজ প্রভৃতির সঙ্গে সসম্মানে কংগ্রেসে ফিরে যাওয়ার রাস্তাও খুব খোলা ছিল না। আলোচনা হয় সুরেশ মজুমদার, হেমন্ত বসু ও অমর বসু প্রভৃতির সঙ্গে। সুরেশবাবু, হেমন্তবাবু প্রভৃতি আমাদের একান্ত কাছের মানুষ। বাংলায় কংগ্রেসের কাজে অনুশীলন দল ও সুরেশ মজুমদারের সমর্থকরা চিরদিনই একই গোষ্ঠি। ওই সময় সুরেশ বাবুও খুব দিশেহারা। এডহক বি. পি. সি. সি তাকে এড়িয়ে চলার সকল সম্ভাব্য চেষ্টা করে। সুতরাং সুরেশবাবুও খুব অগ্রণী হয়ে কিছু করতে সাহস করেন নি। তখন তিনি দিল্লীতে হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড বের করছেন। কাগজের ব্যাপারে তিনি খুব জড়িত। তার উপর তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। হরেন ঘোষ, সত্যপ্রিয় ব্যানার্জী ও সত্যরঞ্জন বকসীও যেন আলো দেখতে

পাচ্ছিলেন না। কনষ্টিটুয়েণ্ট এ্যাসেমবেলিতে আমরা একটি মাত্র আসন লাভ করি। জ্ঞান মজুমদার নির্বাচিত হন। তাছাড়া শরৎবাবু, সুরেশবাবু প্রভৃতিও ছিলেন।

ইংরেজ ভারত ছেড়ে যাবে, ক্লিমেণ্ট এ্যাটলীর এ ঘোষিত প্রতিশ্রুতির সম্মুখে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস পার্টি ছাড়া সকল দলই কিছুটা নিষ্প্রভ। কংগ্রেস পার্টি উল্লাসে সীমাহীন। গত চল্লিশ বছরের স্বাধীনতার যজ্ঞে সর্বজনীন মন্থনের যে অমৃতভাণ্ড উঠেছিল তা সবটুকু নিয়ে নিল কংগ্রেস দেবতারা। অন্য কাউকে অংশীদার করেনি তারা। অন্যদের মধ্যে আমাদের মতন সুভাষ সমর্থকদের অবস্থা সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক। বিশেষ করে বাংলার সুভাষ সমর্থকদের। বাংলার বাইরের সুভাষ সমর্থকরা কংগ্রেসের ভেতরে ছিলেন—ফলে তাদের প্রতিবন্ধকতা ছিল কম।

সকলকে একজোট করার সুযোগ ছিল শরৎবাবুর। তার সমর্থকের অভাব ছিল না। কিন্তু দিল্লীতে অবস্থানের জন্যে তাঁর পক্ষে এ দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব হয়নি। তারপর ছিলেন সুরেশ মজুমদার, অনুশীলন নেতৃবৃন্দ হেমন্তবাবু, অমরবাবু, হরেনবাবু (ঘোষ) প্রভৃতি এ দায়িত্ব নেওয়ার জন্যে অনুরোধ জানান সুরেশবাবুকে। সুরেশবাবুর সীমাবদ্ধতা আমরা জানতাম। তাঁর শরৎবাবুর মতন ব্যক্তিত্ব ছিল না। সুরেশবাবু খোলাখুলি ভাবে জানান যে তিনি একটি হাতি। তাকে চালনা করার জন্যে একজন মাহুত দরকার। কংগ্রেসের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ—বিশেষ করে নেহেরু ও প্যাটেল চাননি যে শরৎবাবু বামপন্থীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন বা ফরওয়ার্ড ব্লক সংগঠন করেন। তাদের বিশ্বাস যে শরৎবাবু বামপন্থী নেতৃত্ব গ্রহণ করলে নেতাজী ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর সকল গৌরব এসে পড়বে ওই সংগঠনের উপর। শরৎবাবু কংগ্রেসের সঙ্গে থাকলে বা কংগ্রেস বিরোধী না হলে আই. এন-এ ও নেতাজীর সবটুকু ক্রেডিট তাঁদের ভাণ্ডারে জমা হবে। নেহেরু-প্যাটেলের এ কৌশল যে ফলবতী হল তা বলা বাহুল্য। ফলে সুভাষ—সমর্থক কর্মীরা সংঘবদ্ধভাবে কোন সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হন।

মুক্তি পাওয়ার কিছুদিন পরে পার্টির প্রথম ও দ্বিতীয় সারির নেতৃবৃন্দের একটি সভা হয় লক্ষ্ণৌতে শ্রীঅমর রায়ের বাড়িতে। সে সভায় বাংলার নেতৃবৃন্দ ছাড়াও উত্তর প্রদেশের যোগেশ চ্যাটার্জী ও আজমগড়ের ঝাড়খণ্ড রায় উপস্থিত ছিলেন। দুদিন দীর্ঘ আলোচনা হয়। কিন্তু মতৈক্য হল না।

রবিবাবু, মহারাজ, জ্ঞানবাবু প্রভৃতি প্রবীণ নেতৃবৃন্দের কোথায় যেন ব্যথা ছিল। তাদের ধারণা তখনকার পশ্চিন বাংলার আর. এস. পি. কতকটা বেসরকারী কম্যুনিষ্ট পার্টির মতন; প্রবীণ নেতৃবৃন্দের সোস্যালিজমের ধারণা ঠিক কম্যুনিজমের মত নয়—চলার ভঙ্গি কম্যুনিষ্টদের মতন নয়। তারা জাতীয় বিপ্লবের নিরন্তর সংগ্রামের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন, এবং জাতীয় বিপ্লবের ধারায় সাঁতার কেটে সোস্যালিজম গ্রহণ করেছেন। ওই সোস্যালিজমের চলার ভঙ্গি, গতিছন্দ ও মূল্যবোধ কম্যুনিষ্টদের চেয়ে আলাদা। তাঁদের ধারণা আর. এস. পি কর্মীরা যে মতবাদ প্রচার করেছেন—তাতে করে কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে আলাদা পার্টি করার কোন যৌক্তিকতা নেই।

ওই সম্মেলনের পর এক ধরণের ছাড়াছাড়ির মনোভাব দেখা দেয়। প্রবীন নেতৃবৃন্দ সকলের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন। হেমন্তবাবু তখন কংগ্রেসের বিধানসভার সভ্য। অমরবাবুর সঙ্গেও কথা হয়। সুরেশবাবু প্রবীণ নেতৃবৃন্দকে সোস্যালিজম রাস্তায় কাজ করার জন্যে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করতে উপদেশ দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলেন যে তিনি সোস্যালিষ্ট নন এবং ওই ধরণের পার্টিতে সামিল হওয়াও তার পক্ষে সম্ভব নয়। ফরওয়ার্ড ব্লক পুনর্গঠিত করার ব্যাপারে নিরুৎসাহবোধ করি। কেবল নিছক আদর্শের প্রশ্ন ছাড়া সহমর্মীতার প্রশ্নও বড় কথা। শরৎবাবু, সুরেশবাবু প্রভৃতিকে ছাড়া ফরওয়ার্ড ব্লক পুনর্গঠন করায় উৎসাহবোধ করেনি নেতৃবৃন্দ। সারা ভারতের ক্ষেত্রে ফরওয়ার্ড ব্লক ঠিক ঠিক ভাবে দানা বাঁধতে পারেনি। এই জন্যেই ফরওয়ার্ড ব্লকের কথাটি চাপা পড়ে গেল।

সোস্যালিষ্ট পার্টিতে যোগদান

এর পর পূর্ণানন্দবাবুর উদ্যোগে দেওঘরে রমেশ আচার্যের বাসায় অনুশীলন তথা আর. এস. পি-র নেতৃবৃন্দের আর একবার বৈঠক হয়। ঐ বৈঠকে মোটামুটিভাবে ঠিক হয়, কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির সঙ্গে একত্র হয়ে কাজ করা সংগত। ১৯৩৮-৩৯ সালে আমরাও কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টিতে সামিল হয়েছিলাম। ত্রিপুরী সিদ্ধান্তে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি, অনুসৃত নীতির জন্যে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি ত্যাগ করতে বাধ্য হই এবং সুভাষচন্দ্রের একান্ত সহযোগী হিসাবে কাজ সুরু করি। ১৯৪২ সালের ভারতছাড়

আন্দোলনে কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট পার্টির ভূমিকা খুব গৌরবময়। জয়প্রকাশ, লোহিয়া, অচ্যুত পট্টবর্ধন, অরুনা আসফ আলী প্রভৃতি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেছেন জাতীয় বিপ্লব। কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট পার্টি যখন ত্রিপুরী সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে সুভাষচন্দ্রের কাছাকাছি এসেছে তখন কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট পার্টিতে ফিরে যাওয়া সংগত। কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট পার্টিতে ফিরে গেলে কংগ্রেসের বামপন্থী অংশ হিসাবে কাজ করা সহজ হবে। নেতৃবৃন্দ একেবারে কংগ্রেস পরিত্যাগ করতে চাননি। দেওঘরের প্রস্তাবে রমেশবাবু তখন মত দেননি—মনস্থির করার জন্যে কিছুটা সময় নিতে চান তিনি।

এরপর কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট পার্টির সঙ্গে আলোচনা চলতে থাকে। মীরাট কংগ্রেসের অধিবেশনের পর পাটনায় বৈঠক হয়, সোশ্যালিষ্টদের তরফ থেকে জয়প্রকাশ নারায়ণ ও আমাদের তরফ থেকে রবি সেন, জ্ঞান মজুমদার ও আমি। প্রাথমিক পর্যায়ে আলোচনা হয় মাত্র। ওই সভার রিপোর্ট রবিবাবু সংশ্লিষ্ট বন্ধুদের কাছে পেশ করেন। দেওঘরের পর একটি informal nucleus গড়ে ওঠে। তার কাছেই সব রিপোর্ট পেশ করা হত এবং ওখানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি পদক্ষেপ করা হয়।

এর কিছুদিন পর ত্রৈলোক্য মহারাজ, রবি সেন, জ্ঞান মজুমদার, যতীন রায়, দেবেন ঘোষ, পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত ও আশু কাহিলি প্রভৃতি নেতা ও কর্মী আর. এস. পিতে যোগ না দেয়ার কথা ঘোষণা করেন। বলাই বাহুল্য, যে অস্থিরতা ছিল তার অবসান হয়।

সোশ্যালিষ্টদের সঙ্গে দ্বিতীয় দফা আলোচনা হয় ধানবাদে। সেখানে যান রবিদা, নীহার রায় ও আমি। ওই সময় সোসালিষ্ট পার্টির অনেকের সঙ্গে আলোচনা হয়। তাদের মধ্যে বি পি. কৈরালার নাম উল্লেখযোগ্য। বি. পি. নেপাল কংগ্রেসের নেতা। নেপাল কংগ্রেসের অনেক সক্রিয় কর্মী কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট পার্টির সভ্য।

ধানবাদের পর কলকাতায়ও কয়েকটা বৈঠক হয়। একবার জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রতুল গাঙ্গুলীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। চূড়ান্ত আলোচনা হয় নাগপুরে। ওই বৈঠক হয় ৪২ সালের বিখ্যাত লাল সেনার নেতা মগনলাল বাগড়ীর পরিচালনায়। বাগড়ীকে দেখার ইচ্ছা ছিল বহুদিন থেকে। মগনলাল বাগড়ী নাগপুরে একটি Legend। '৪২ সালের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের

জন্য তার ফাঁসির হুকুম হয়। কিন্তু উত্তরকালে রদ হয় ওই হুকুম।

আমরা কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টিতে মিলে গেলাম। আমাদের তরফ থেকে জাতীয় কার্যকরী সমিতির সদস্য মনোনীত হন ত্রৈলোক্য মহারাজ ও রবি সেন। বাংলায় কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টিতে গ্রহণ করা হয় আমাদের সকল সভ্যদের। আমাদের সভ্য করার বেলায় Probationary period-এর বিধি রদ করা হয় এবং সকলেই সরাসরি সদস্যভুক্ত হয়। ১৯৩৭-৩৮ সালে এই সুবিধা আমরা পাইনি। বাংলায় প্রাদেশিক কার্যকরী কমিটিতে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি ও আমাদের সমপরিমান সদস্য থাকবে এবং উভয় গোষ্ঠী থেকে দুজন সাধারণ সম্পাদক হবে। প্রাদেশিক পার্টিতে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির তরফ থেকে পরিতোষ ব্যানার্জী ও আমাদের তরফ থেকে নরেন দাস সাধারণ সম্পাদক হন। যারা কার্যকরী সমিতিতে নির্বাচিত হন তাদের মধ্যে ত্রৈলোক্য মহারাজ, রবি সেন, জ্ঞান মজুমদার, পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, দেবেন ঘোষ, চারু রায়, দিনেশ ভট্টাচার্য, নীহার রায়, হরেন রায়েরনাম উল্লেখযোগ্য।

ভারতবিভাগের পর কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টিও ভাগ হয়। মহারাজ ও দেবেন ঘোষের উপর দায়িত্ব পড়ে পূর্বপাকিস্থান সংগঠনের। মহারাজ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্থানে কাজ করেন। তিনি পূর্ব পাকিস্থানের বিধানসভার সভ্য নির্বাচিত হন। দেবেন ঘোষ পূর্ববাংলায় সমাজবাদী আন্দোলনের পুরোধা।

চারু রায়েরও ঢাকা যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অসুস্থতার জন্যে তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। চারুবাবু আজ আমাদের মধ্যে নেই। চারুবাবুর মতন সহযোগী পাওয়া এক দুর্লভ সৌভাগ্য। এ ধরণের বন্ধুবৎসল দক্ষ সংগঠক কমই পেয়েছি আমার দীর্ঘ রাজনীতিক জীবনে।

অনুশীলন ও সোস্যালিষ্ট পার্টির সংযুক্ত করণের ব্যাপারে সবচেয়ে উৎসাহী ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ ও ডঃ লোহিয়া। কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট দলের অশ্বিনী গুপ্ত, অতুল বসু, গুনদা মজুমদার, সুধীন মজুমদার, অমর রায়, অজিত দত্ত ও কানাই চ্যাটার্জী। এরা সকলেই আমাদের অভ্যর্থনা করল দুহাত তুলে। শিবনাথ ব্যানার্জী খুশী হন আমাদের পার্টিতে যোগ দেয়াতে।

আর. এস. পি. ছেড়ে যেতে গভীর বেদনা বোধ করি। আর. এস. পির সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্ক আমার দীর্ঘ দিনের। আমি প্রায় সকলের মধ্যে

অপেক্ষাকৃত বয়স্ক সাথী। তাদের সঙ্গে মতান্তর হয়নি কখনও। অনুশীলনের পুরানো কর্মী ও আর· এস· পির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে সংগঠন রচনার কাজে পুরোভাগে ছিলাম আমি। এমনি অবস্থায় বিদায় ব্যথা খুবই গভীর। কর্মীরা প্রায় সকলেই আদর্শনিষ্ঠ। আমার সঙ্গে ব্যবধান আদর্শগত। ব্যক্তিগত নয়। অতএব কোন প্রশ্ন ছিল না নেতৃত্ব সম্পর্কে। আর· এস· পির প্রথম সারির সম্মান ছেড়ে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির পেছনের সারির কর্মী হলাম কেবল আদর্শপ্রীতির জন্যে। নিশ্চিত নীড় ছেড়ে অজানা সমুদ্রে যাত্রা। বিরাট ঝুঁকি নিয়েছি সেদিন। ভেবেছি আন্তরিকতা যখন আছে তখন শঙ্কার কী কারণ? একথাও মনে হয়েছে যে আর· এস· পির সঙ্গে হয়ত পুনর্মিলন হবে। তার চেষ্টাও হয়েছিল ১৯৫২ সালের নির্বাচনের পর। আচার্য নরেন্দ্র দেওয়ের সঙ্গে আলোচনাও হয়েছিল আর·এস পি· নেতৃত্বের। কিন্তু ফলপ্রসূ হয়নি আলোচনা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আর· এস· পি· কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির সঙ্গে মিলিত হলে এর প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ সারা ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে বিশেষ আসন গ্রহণ করে ভারতের সমাজবাদী আন্দোলনকে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করতে সক্ষম হত। কিন্তু তা, হ'ল কোথায়? তা হলে আর· এস· পি কর্মীরা কংগ্রেসের কার্যকরী ও শক্তিশালী বিকল্প রচনা করতে সক্ষম হ'ত। আর· এস· পি· এককভাবে থেকে তা সম্ভব নয়।

সতের ঃ কংগ্রেসে অন্ধকার ও নতুন যাত্রা

মীরাট কংগ্রেসে কৃপালিনীজী কংগ্রেস সভাপতি। তার সঙ্গে বিরোধ প্যাটেল ও নেহেরুর। কৃপালিনী খুব উচ্চস্তরের intellectual। গোঁড়া গান্ধীবাদী। সরকার পরিচালনা সম্পর্কে তার নিজস্ব পরিকল্পনা থাকা স্বাভাবিক। তার অভিযোগ যে নেহেরু, প্যাটেল তাকে যথোচিত স্বীকৃতি দেন না। অপমানিত বোধ করেন কৃপালিনী। বিষয়টি গেল গান্ধীর কাছে। গান্ধী তাকে পরামর্শ দেন পদত্যাগ করার জন্য। পদত্যাগ করেন কৃপালিনী।

নতুন সভাপতি নির্বাচন হবে। নাম সুপারিশ করবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি। অন্তবর্তী নির্বাচনে ওই নিয়ম। চূড়ান্ত নির্বাচন করবে A.I.C.C.। প্রারম্ভিক কাজের জন্য বৈঠক হয় ওয়ার্কিং কমিটির।আলোচ্য বিষয় সভাপতির নাম সুপারিশ করা। পূর্ণাঙ্গ সভা। সকলেই উপস্থিত। গান্ধীও উপস্থিত। নেহেরুর প্রস্তাব সভাপতি হবে আচার্য নরেন্দ্র দেও। তখন সোশ্যালিষ্টদের তরফ থেকে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য জয়প্রকাশ ও রাওসাহেব পট্টবর্দ্ধন। নেহেরু প্রস্তাবের পর নিচ্ছিদ্র নীরবতা। মুখ চাওয়া চাওয়ি করছেন সকলে। কিন্তু নতুন নাম প্রস্তাব করছেন না কেউ। কারণ প্রস্তাবক নেহরু স্বয়ং। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী। ওই নিষ্ঠুর নীরবতায় নেহেরুর অস্বস্তির অন্ত নেই। তাঁর মনে হল যে তাঁর প্রস্তাব প্যাটেল গোষ্ঠির মনঃপুত হয়নি। গত্যন্তর না দেখে গান্ধীকে জিজ্ঞেস করেন "বাপু তুমহারা কেয়া রায়"। সেদিন সোমবার। গান্ধীর মৌন দিবস। একটি ছোট্ট কাগজ চেয়ে নিয়ে গান্ধী তাতে লিখলেন "I like Narendra Dev as I like Jayaprakash"।সভার মেজাজ আন্দাজ করে প্রস্তাব করেন আর একটি নাম—জয়প্রকাশ। গান্ধী ও নেহেরু সভাপতি হিসেবে সোশ্যালিষ্টদের চান। এর পর অন্যান্য সভ্যদের আরো সংকট। একে জওহরলাল—তার উপর আবার গান্ধী। কার হিম্মৎ পালটা নাম রাখে! প্যাটেল গোষ্ঠি ঠিক করল যে নতুন নাম প্রস্তাব না করে প্রস্তাবিত নাম দুটির বিরোধ করা। কিদোয়াই উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে নরেন্দ্র দেও গোষ্ঠীর বিরোধী। হঠাৎ আপত্তি তোলে কিদোয়াই। কারণ আচার্য দেও কংগ্রেসের নেতা নন। অন্যান্য সকলে তাদের নীরব ইংগিতে সমর্থন জানান কিদোয়াইকে।

জে· পি· খুব আবেগধর্মী মানুষ। বলাবাহুল্য নরেন্দ্র দেও সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা তার ভদ্র অন্তঃকরণে আঘাত হানে। তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে জানান যে নরেন্দ্র দেওয়ের মত মানুষ এর অনেক আগেই কংগ্রেসের সভাপতি হওয়া উচিত ছিল এবং সুভাষচন্দ্র ত্রিপুরীর পরে তার জায়গায় নরেন্দ্র দেওর নাম প্রস্তাব করেন মীমাংসার সূত্র হিসেবে। কিন্তু ভবি ভোলেনি তাতে। পণ্ডিত নেহেরুকে তার প্রস্তাব তুলে নেয়ার জন্যে অনুরোধ জানান জে· পি·। পণ্ডিতজী নাম প্রত্যাহার করার সঙ্গে সঙ্গে পাশ হ'ল ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের নাম। এই রাজেন্দ্রবাবু হাইকমাণ্ডের yes man। ১৯৩৯ সালে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করার পর সভাপতি হন রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

বেদনাহত চিত্তে জয়প্রকাশ পরে কেন আচার্য দেওয়ের নাম উত্থাপন করলেন এ নিয়ে অনুযোগ করেন পণ্ডিত নেহেরুর কাছে। কারণ নেহেরু ত সব কিছুই জানেন, তবে কেন এ অপমান। নেহেরু জেনে শুনেই একাজ করেছেন, জানান তিনি তাঁর জবাবে। উত্তেজিত হয়ে বলেন যে প্যাটেল গোষ্ঠিকে ভয় পেলে কি চলে? ওরা ত আমাকেও (নেহরুকেও) চায় না। কতবার যে তিনি ওদের সঙ্গে বিরোধ করে পদত্যাগ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। ওদের সঙ্গে ওই ভাবেই চলতে হবে এবং জয়প্রকাশকে ইমোশনাল হতে বারণ করেন।

এতে জে· পি'র মন ভরেনি। গেলেন স্বয়ং গান্ধীর কাছে। গান্ধীজী পিতৃতুল্য। পিতার মতনই স্নেহের পাত্রকে স্বান্ত্বনা দেন। তিনি জোরের সঙ্গে বলেন "ওয়ার্কিং কমিটি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে ওরা সংখ্যাধিক্য, তাই পাশ করে নিল আজ। এটি ত bye election। পরে A. I. C. C.তে দেখা যাবে।

সবকিছু মিলে মিশে এক ধরণের অবসাদ সৃষ্টি হয় সোস্যালিষ্টদের মনে। তাদের মনে এ ধরণা হল যে একই সংগঠনে থেকে নিত্যদিন সোস্যালিজম বিরোধী প্যাটেল গোষ্ঠির সঙ্গে বিরোধ করা অসম্ভব, অবাস্তব, সময়ের বৃথা অপচয়। তার চেয়ে কংগ্রেসের বাইরে থেকে কাজ করা ঢের ভালো।

এমনি বিষাদভরা মন নিয়ে গান্ধী ও নেহেরুর সঙ্গে সোস্যালিষ্টদের আলোচনা। কংগ্রেস ছাড়ার প্রস্তাব দেন উভয় নেতার কাছে। এ আত্ম-হননকারী প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন উভয় নেতা। গান্ধী আবেগের সঙ্গে বারণ করে বলেন "এ কংগ্রেস তোমাদের হবে। ছেড়ে যেয়ো না। এখানে

কাজ কর। দিন বদল হবে। বদল হবে পালা।"

চলতে থাকে আলোচনা। হয়ত কংগ্রেস ছেড়ে যেত না সোস্যালিষ্ট পার্টি। কিন্তু অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। অপরাহ্ন বেলায় আঁধার নেমে এল জাতীয় জীবনে। ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর ইতিহাসের এক কলংক-ময় ঘটনা ঘটে ৩০শে জানুয়ারী বেলা পাঁচটায়। এক হিংসায় উন্মত্ত হিন্দু আততায়ীর হাতে প্রাণ দিলেন গান্ধী। বর্তমান ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ প্রাণ হারালেন ভারতবাসী বলে পরিচিত এক যুবকের হাতে। পণ্ডিত নেহেরুর ভাষায় "the light is out"। দেশ ভরে গেল আঁধারে। যিশুখৃষ্ট, সক্রেটিস প্রভৃতি অনেক হত্যা মসীলিপ্ত করেছে পৃথিবীর ইতিহাস। কিন্তু আপন স্রষ্টাকে হত্যা এই প্রথম। এ যে পিতৃহত্যার চেয়ে ঘৃণ্য।

নতুন যাত্রা

বদল হল যাত্রী দলের। সোস্যালিষ্ট পার্টিতে আমি একজন নতুন যাত্রী। ১৯৪৬ সালে কং. সো. পার্টি নাম বদল করতে বাধ্য হয়। এজন্য বক্তব্য ছিল যে কংগ্রেস কথাটি পার্টির নামের সঙ্গে যুক্ত করে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কোন আলাদা পার্টি থাকা চলবেনা। কংগ্রেস সংজ্ঞাটি রাখতে হলে যেতে হবে কংগ্রেসের বাইরে। কৃপালিনীজীর এ এক অজীব যুক্তি। কারণ কংগ্রেস বিশেষণ রেখেই ১৯৩৪ সাল থেকে পার্টি ছিল কংগ্রেসের ভেতর। এই পার্টির তিনজন সদস্যকে ১৯৩৬ সালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য করেন সভাপতি জওহরলাল। কৃপালিনী যখন কংগ্রেসের সম্পাদক তখনও কং. সো. পার্টি নেতৃবৃন্দ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। তিনি সভাপতি হওয়ার আগের বছরও কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় ও রাও সাহেব পট্টবর্ধন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। তাছাড়া ১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসের পর দেশবন্ধুর নেতৃত্বে যে দল গঠিত হয় তার আসল নাম ছিল কংগ্রেস খিলাফত স্বরাজ্য পার্টি। অতবড় নাম বলতে অসুবিধা, তাই সকলেই বলতেন স্বরাজ্য দল। কৃপালিনীর যুক্তির পেছনে লুকানো ছিল অন্য কারণ। কৃপালিনী সর্দার প্যাটেল গোষ্ঠির প্রথম সারির সদস্য। প্যাটেল গোষ্ঠি কং. সো. পার্টির ক্রম-বর্ধমান জনপ্রিয়তা ভাল চোখে দেখেনি। কং. সো. পার্টি নেতৃবৃন্দ অপেক্ষাকৃত তরুণ। বিরক্ত হয়ে কংগ্রেস ছেড়ে দেবে নতুবা দল ভেঙে দিয়ে কংগ্রেসের ভেতর থেকে যাবে। কিন্তু কং. সো. পা. গান্ধী ও নেহেরুর খুব প্রিয়। অতএব

তাদের তাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। যদি তারা আপন থেকে বেড়িয়ে যায় তবে আলাদা কথা। প্যাটেল গোষ্টির কৌশল ব্যর্থ হয়নি। সোস্যালিষ্ট পার্টি এক বছরের ভেতরই ছেড়ে দিল কংগ্রেস।

নতুন দলে এসে এক বছরের ভেতর আমি জাতীয় কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য নির্বাচিত হই। কমিটিতে ছিলেন অনেক প্রখ্যাত নেতা যারা চিন্তা ও কর্মের জন্য ভারত বিখ্যাত। আচার্য নরেন্দ্র দেও, জয়প্রকাশ নারায়ণ, ইয়ুসুফ মেহেরালী, অচ্যুত পট্টবর্ধন, রাম মনোহর লোহিয়া, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, অরুনা আসফআলী, অশোক মেহতা।

আমার জীবনে এই প্রথম প্রকৃত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এর আগে অনুশীলন, আর. এস পিতে এ ধরণের আলোচনা হয়েছে ঠিকই কিন্তু তার বাস্তবতা ছিল না। নামে যাই হোকনা কেন মূলত আমরা ছিলাম বাংলা দেশের পার্টি। নেতারা সকলে বাঙালী।

সোস্যালিষ্ট পার্টির সংগঠন জাতীয় স্তরে। সমস্যা দেখা দেয় জাতীয় পর্যায়ে-লড়াই ও জাতীয় পর্যায়ে সংগঠন নিয়ে। তেমনি বিশ্বের সকল সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে এর যোগাযোগ, বিশেষ করে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সদস্য দেশগুলির সঙ্গে। যুদ্ধোত্তর কালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের প্রথম সম্মেলনে উপস্থিত ছিল সো. পার্টি প্রতিনিধি। তাঁর কাছ থেকে শোনা গেল সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার কথা। রাজনৈতিক কাজে খুলে গেল নতুন দিগন্ত।

বিশ্বের খাদ্যাবস্থার খবর ছিল কমিটির সমূখে। যুদ্ধোত্তর বিশ্বের খাদ্য উৎপাদন বাড়াবার জন্যে যে বিরাট কর্ম যজ্ঞ চলছিল তার খুঁটিনাটি খবরের উপর খাদ্য সমস্যা আলোচনা হত। কৃষি ও খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে ডঃ লোহিয়ার জ্ঞান খুব গভীর। তাঁর নির্দেশেই Land Armyর পরিকল্পনা নেয়া হয় ১৯৪৭-এ। বিদেশ নীতি সম্পর্কে লোহিয়া ছিলেন খুবই অবহিত। তাঁর পরিকল্পিত Third Camp এর থেকেই জন্ম নিয়েছে non-alignment নীতি। এসকল বিষয়ের উপর লোহিয়ার বক্তব্য ছিল তথ্যমূলক ও জ্ঞানগর্ভ।

এ সকল নীতি নির্ধারণ ছাড়া কতগুলি আশু বৈপ্লবিক সংঘর্ষের সঙ্গে জড়িত ছিল পার্টি। হায়দ্রাবাদ তখনো নিজামের অধীন। হায়দ্রাবাদ মুক্তি সংগ্রামের দায়িত্ব নিয়েছিল সো. পার্টি। সশস্ত্র বিপ্লবীদের দল আক্রমণ চালাত নিজামের পুলিশ চৌকীর উপর। উদ্দেশ্য ভারত সংলগ্ন নিজামের ভূখণ্ড দখল। বিপ্লবী আমি। এ সকল ঘটনা দোলা দিত আমার মনে।

তখন হায়দ্রাবাদের নেতা মহাদেব সিংহ এবং আমাদের সংঘর্ষের নেতা কাবর।

হায়দ্রাবাদের পর নেপাল কংগ্রেস গঠিত হয় ভারতভূমিতে। কৈরালা ভাইরা ভারতবর্ষের সোস্যালিষ্ট পার্টির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। ৪২ সালের বিপ্লবের সময় হতেই ওই যোগাযোগ। ভারতছাড় আন্দোলনের সময় অনেক সোস্যালিষ্ট নেতা আত্মগোপন করে আশ্রয় নেন নেপালে। ভারতসীমান্তে তখন কিছু কিছু প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হয়েছে সোস্যালিষ্টদের সঙ্গে বৃটিশের সিপাহীদের। স্বাধীন ভারতে সোস্যালিষ্ট পার্টি একটি বড় দল। নেপাল কংগ্রেসকে সাহায্য করার সুযোগ অনেক। এই ভারতভূমিতে বসেই নেপাল কংগ্রেস কর্মীরা গেরিলা যুদ্ধের মহড়া নিয়েছে। বিরাটনগর সীমান্ত ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মকেন্দ্র। ভারতসীমান্তে ফরবেশগঞ্জ। ওপারে নেপালের বিরাট-নগর। অস্ত্র ও অর্থসাহায্য করত সোস্যালিষ্ট পার্টি। স্বয়ং জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রচুর অস্ত্র বহন করেন ব্রহ্মদেশ থেকে। বর্মা সোস্যালিষ্ট পার্টির অবিসম্বাদি নেতা উ· বা· সে· তখন ব্রহ্মদেশের গৃহমন্ত্রী ও পরে প্রধানমন্ত্রী। ব্রহ্মদেশ থেকে গেরিলা যুদ্ধের সম্ভার যোগার করার কোন অসুবিধা ছিলনা। জয়প্রকাশ নারায়ণের লাগেজ তল্লাসী করতনা ভারতীয় কাসটমস। নেপাল বিপ্লবের যজ্ঞে পশ্চিমবাংলার বারীন ঘোষ ও ভোলা চ্যাটার্জী যুক্ত ছিল নিবিড়ভাবে। সুবর্ণ সমসের জঙ্গ তখন কলকাতায় থাকেন। তার বাড়ীতে ছিল বড় আড্ডা। সুবর্ণ রানা গোষ্ঠির হলেও বিপ্লবের নেতা। ভারত সরকার তার কার্যকলাপে কোন হস্তক্ষেপ করেনি। বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ার পর সুবর্ণ সমসের অর্থমন্ত্রী ও বিশ্বেশ্বর কৈরালা প্রধানমন্ত্রী হন। রাজা ত্রিভূবন ছিলেন প্রগতিশীল রাজা। তার মৃত্যুর পর আবার প্রতিবিপ্লব হয়। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে নেপাল কংগ্রেস কেন্দ্র আবার ভারতভূমিতে।

নেপাল কংগ্রেসের কাজে সমর্থন ছিল গান্ধীর। তিনি ডঃ লোহিয়ার গোয়া অভিযানের সমর্থন করতেন। উত্তর কালে (গান্ধীর অবর্তমানে) পণ্ডিত নেহেরু নেপাল কংগ্রেসের ভারত ভূমিকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহের কাজে বিরক্ত বোধ করতেন, কারণ তাতে করে তার প্রগতিশীল বিদেশনীতি অনুসরণ করায় অসুবিধা হত। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা নেহেরু আর প্রধান মন্ত্রী নেহেরুর মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। ১৯৩৬ সালের মার্কসবাদী নেহেরুর ঐ পরিবর্তন দেখে দুঃখ হত।

পার্টিতে আচার্য নরেন্দ্র দেওকে মনে হয়েছে যেন হিমালয়ের গৌরিশৃঙ্গ। বিরাট পণ্ডিত চিন্তা নায়ক বাগ্মী, নিরভিমান, আপন ভোলা মানুষটি। সকলের তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। সভায় সাধারণত একবারই বক্তব্য রাখতেন তিনি। সভা তখন সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। তাঁর হিন্দী উর্দু ও ইংরেজী বক্তৃতা শুনেছি আমি। হিন্দী বক্তৃতায় প্রতিটি শব্দ সংস্কৃতধর্মী। আবার উর্দু বক্তৃতায় একটিও হিন্দী শব্দ ব্যবহার করতেন না। একবার বৌদ্ধ দর্শনের উপর তার বক্তৃতা শুনে আমার বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

নরেন্দ্র দেও ছিলেন মার্কসবাদী জ্ঞান তপস্বী। তবে সরকারী মার্কস-বাদীদের সঙ্গে সর্বদা মিল হতনা তাঁর। তাঁর উপর এঙ্গেলসের প্রভাব খুবই।

এমনি আর একটি মানুষ ছিলেন যার বক্তব্য সকলের নতুন চিন্তার খোরাক জোটাত। আবেশ ভরে তিনি ধাপে ধাপে আমাদের কল্পনা রাজ্যে নিয়ে বিচরণ করতেন। তিনি মার্কসবাদী নন—গান্ধীবাদী। তার সঙ্গে মতের মিল না হলেও তার বক্তব্য সদস্যদের কল্পনার তারে আঘাত করত। তিনি ডঃ লোহিয়া। ডঃ লোহিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প বয়েস—কিন্তু চিন্তানায়ক। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অভিধানে ভারতে তাঁর অবদান প্রচুর। গান্ধীর মতন অতটা গভীর ও ব্যাপকভাবে না হলেও ভারতীয় সমাজ বিন্যাসের সম্বন্ধে তার জ্ঞান গভীর। ভারতের সমাজবাদী আন্দোলনে তার অবদান অপরিসীম।

কিন্তু সোস্যালিষ্ট পার্টি তথা আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র জয়প্রকাশ নারায়ণ। অপেক্ষাকৃত অল্পদিনে ভারতবর্ষে জাতীয় নেতৃত্বের আসন গ্রহণ করেন জয়প্রকাশ। আমি তাঁকে প্রথম দেখি ১৯৩৮ সালে দেউলী ক্যাম্প থেকে আমার মুক্তির পরে। অত্যন্ত মধুর ভাষী, মধুর ব্যবহার। আলোচনার মান তুলে দেন উচ্চস্তরে। মার্কসবাদী কিন্তু গোঁড়ামি নেই। সোস্যালিষ্ট আন্দোলনের প্রগতি যজ্ঞে তাঁর অবদান অন্তহীন।

পার্টি কংগ্রেস ছাড়ল

গান্ধীর মৃত্যুতে সমাজবাদী শিবিরে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ৪২ সালের আন্দোলনের পর থেকেই তরুণ সমাজবাদীরা গান্ধীর ভূমিকা সম্পর্কে কেবল অবহিত নয়—মুগ্ধ। ত্রিশ দশকে সমাজবাদীদের জন্মলগ্নে তারা ছিলেন পণ্ডিত নেহেরুর প্রতি অনুরক্ত। কারণ আপনাকে মার্কসবাদী বলে

আখ্যা দিতেন পণ্ডিতজী। জয়প্রকাশ, অচ্যুত পট্টবর্ধন, লোহিয়া প্রভৃতিকে বলা হত Nehru Boys। পণ্ডিত নেহেরু যে এই তরুণ কর্মীদের ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করেছেন একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। ১৯৩৬ সালে জয়প্রকাশের বয়স ৩২, পট্টবর্ধন ২৯, আর লোহিয়া মাত্র ২৫ বছরের। নেহেরুর জন্যেই ভারতবর্ষের দ্বিতীয় শ্রেণীর উদীয়মান নেতৃত্বের তিলক এদের কপালে পড়িয়ে দেয় দেশের মানুষ। নেহেরুর এ প্রয়াস মোটেই পছন্দ করেনি প্যাটেল, প্রসাদ, কৃপালিনী ও রাজা গোপাল আচারী প্রভৃতি। তারা কিছুটা শঙ্কিত হন—কারণ তাদের নিজস্ব কোন উদীয়মান নেতৃত্ব রচনা করার পরিকল্পনা ছিলনা। কংগ্রেসের উচ্চতম কতৃপক্ষ সম্পূর্ণ সোস্যালিজম বিরোধী। গান্ধী ছিলেন এ সব কিছুর বাইরে।

১৯৩৭ সাল থেকে গান্ধী ও সোস্যালিষ্টদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এর মূল কারণ আচর্য নরেন্দ্র দেও। বৈদেশিক শিক্ষা সত্বেও আচার্য দেও পুরোপুরি ভারতীয়। ভারতের শাশ্বত ধারা সম্বন্ধে সচেতন। গান্ধী দর্শনের সারবস্তুটি জানতেন বলেই সোস্যালিষ্টদের সঙ্গে গান্ধীর ঘনিষ্টতা।

আচার্যজী ও পণ্ডিত নেহেরু সমবয়সী। আচার্য দেও কয়েক দিনের বড়। বিদগ্ধ মানুষ। দুজনই মার্কসবাদী। তা সত্বেও উভয়ের প্রভেদ অনেক। একজনের ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দর্শন—অন্যজনের পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ থেকে। নরেন্দ্র দেও সোস্যালিষ্ট গোষ্টির মধ্য মণি। তার জন্যে সোস্যালিষ্টরা অপরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন এ অভিযোগ অচল। এদিক দিয়ে আচার্য দেওর ভূমিকা অপরিসীম।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে গান্ধীর সঙ্গে সর্দার প্যাটেলের মত বিরোধের কথা সকলের জানা। গান্ধীর মৃত্যু সম্পর্কে সোস্যালিষ্টদের অভিযোগ গুরুতর। তাদের সকল অভিযোগ সর্দার প্যাটেলের বিরুদ্ধে। তাদের দৃঢ় ধারণা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যথোচিত সতর্কতার অভাবের জন্য এ হত্যাকাণ্ড। প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে সকল ব্যাপারটি বিশ্বের দরবারে হাজির করেন সমাজ-বাদীরা। এই স্পর্ধার জন্যে গর্জে ওঠে সর্দার প্যাটেল। পণ্ডিত নেহেরু দাঁড়ালেন প্যাটেলের সমর্থনে।

গান্ধীর মৃত্যুর পর সমাজবাদীদের কংগ্রেসে থাকার আগ্রহ কমে যায়। গান্ধী ছিলেন কতকটা পিতার মতন। গান্ধী ছাড়া সমাজবাদীদের অন্য আকর্ষণ ছিল পণ্ডিত নেহেরু। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর নেহেরুর রাজনৈতিক

মতবাদের পরিবর্তন খুব তাৎপর্যপূর্ণ। খুব দ্রুতগতিতে তিনি দূরে, বহুদূরে চলে গেছেন সোস্যালিজমের আদর্শ থেকে।

ওই সময় থেকে সোস্যালিষ্টদের কংগ্রেসের বাইরে একক যাত্রা সুরু। মার্চ মাসে নাসিক কনফারেন্সে কংগ্রেস ছাড়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন সমাজবাদীরা। কতকটা ঘটনা চক্রে পরে এবং কতকটা বাধ্য হয়ে কংগ্রেস ছেড়ে আসতে হল সোস্যালিষ্টদের। কিছুটা বিচার বিশ্লেষণ হয়নি এমন নয়। কংগ্রেস ছাড়ার দুটি মূল কারণ। প্রথম কারণ কৃপালিনী তথা সর্দার প্যাটেল গোষ্ঠির বিরূপ মনোভাব। কংগ্রেস সংগঠনের ভিতরে অন্য একটি গোষ্ঠির অস্তিত্ব রাখায় তাদের বিরোধিতা। দ্বিতীয় কারণ তাত্ত্বিক। সোস্যালিষ্টরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক কাঠামো সংসদীয় প্যাটার্ণের। কতকটা বৃটিশ সংসদীয় ব্যবস্থার মতন। সংসদীয় গণতন্ত্রে অন্তত দুটি দল থাকা উচিত। একটি সরকারী। আর একটি বিরোধী। কংগ্রেস সরকারী দল গদিতে আসীন। সোস্যালিষ্টরা চাইলেন বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করতে।

১৯৪৭ সালের পর থেকে সমাজবাদীরা নিজেদের মার্কসিষ্ট লেনিনিষ্ট আখ্যা দেয়া বন্ধ করেন। ওই সময় থেকে আপনাদের বলতেন ডেমক্রেটিক সোস্যালিষ্ট। তাদের মতে বর্তমান দুনিয়ায় ডেমেক্রটিক সোস্যালিজমই হচ্ছে সায়েন্টিফিক্ সোস্যালিজম।

Demorcatic Socialism and Social Democracy এক নয়। একটি বৈপ্লবিক. অন্যটি সংস্কারপন্থী। প্রথমটিতে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বিধান রয়েছে কিন্তু দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণভাবে বৈধানিক, Constitutional। প্রথমটিতে শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম—যেমন সত্যাগ্রহ সহিংস অসহযোগ রয়েছে হাতিয়ায় হিসেবে, দ্বিতীয়টিতে কেবল নির্বাচনই একমাত্র পথ। প্রথমটিতে সংঘর্ষ ও নির্বাচন, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে কেবল নির্বাচন। Democratic Socialsm এর তূণে সত্যাগ্রহের মতন অস্ত্র থাকার জন্যে অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করা সম্ভব। গান্ধী প্রদর্শিত অহিংস সংগ্রাম, সত্যাগ্রহ হরতাল, শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট সকলই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। Democratic Socialismএর মতবাদের সৃষ্টিতে গান্ধীর অবদান সবচেয়ে বেশী। গান্ধীজীর রাস্তায় কখনই Dictatorship সৃষ্টি হবেনা—হতে পারেনা। Means determines end-এ হল গান্ধীর বাণী।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কার্যকারিতা ভারতভূমিতে বহু পরীক্ষিত। অহিংস সংগ্রামের ফল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। পক্ষান্তরে সহিংস সংগ্রামের পরিণতি এক

নায়কত্বে। অহিংস সংগ্রাম বহু সংখ্যক মানুষের সহযোগিতা ও সমর্থন ছাড়া সম্ভব নয়। বহুজনের সচেতন ও সজাগ অংশ গ্রহণের ফলে এর জয় সুনিশ্চিত। কিন্তু সহিংস সংগ্রাম এর ঠিক উল্টো। এখানে মুষ্টিমেয় সুশস্ত্র মানুষ অস্ত্রের সাহায্যে দাবিয়ে রাখে বহুসংখ্যক অচেতন মানুষকে। বহুসংখ্যক মানুষ সচেতন হলেও অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা থাকেনা। কারণ শেষ পর্যন্ত সকল শক্তি সাধারণ মানুষের হাতে। অল্প সংখ্যক মানুষের রাজত্ব কায়েম করার জন্যে একনায়কত্ব অনিবার্য। একবার একনায়কত্ব—বিশেষ করে পার্টি একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা হলে—অস্ত্রবলে তা টিকিয়ে রাখা শক্ত নয়। এমন সমাজে সকল রকম স্বাধীনতার অবসান হয়। না থাকে ব্যক্তি স্বাধীনতা, না থাকে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা। থাকেনা সভা সমিতি করার অধিকার। মানুষের সকল অধিকার কেড়ে নেযাই এ ধরণের ব্যবস্থার রেওয়াজ। সরকার বিরোধী কোন রাজনৈতিক দল থাকেনা। সমাপ্তি হয় pluralistic রাজনীতির, গড়ে ওঠে এক ধরণের ভয়াবহ Monolithic সমাজ।

আঠের ঃ বিপ্লবী মনের জিজ্ঞাসা

১৯২১-৪৭ এই ছাব্বিশ বছর ভারতবর্ষের সবচেয়ে সৃজনশীল যুগ। এ অধ্যায়েই বর্তমান ভারতবর্ষের প্রগতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা। এর পেছনে রয়েছে বহু মণীষী ও সাধক এবং অগণিত দেশসেবকের অবদান।

নব যুগের এ সৃজনশীল অধ্যায়ে গড়ে উঠেছি আমি। দেশের অগ্রগমনের সাথে সমান তালে এগিয়েছি আমিও। আমারও পরিবর্তন হয়েছে প্রচণ্ড। আমার ধারণা অনেক কিছু নির্ভর করে সামাজিক অবস্থিতির উপর—সমাজের কোন স্তরে অবস্থিতি আমার—কোন পরিবারে জন্ম আমার। কী কী সুযোগ পেয়েছি—কত পর্বত প্রমাণ বাধা ছিল পথে।

১৯২১ সালের ১লা আগষ্ট। সেদিন লোকমান্য তিলকের মৃত্যু তিথি। ১৫ বছর বয়স আমার। ওই দিন বিপ্লবী দলে যোগ দিই আমি। এর ঠিক তিনবছরের মধ্যে বরিশাল জিলার সাধারণ কর্মী থেকে ফরিদপুর জিলার বিপ্লবী দলের ভারপ্রাপ্ত সংগঠক হই। ১৯২৪ সালের ইষ্টারের ছুটিতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন সিরাজগঞ্জে। সেখানে উপস্থিত ছিলাম প্রতিনিধি হিসাবে। ওই সম্মেলনে বার্তা এল ঢাকায় প্রতুল গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা করার জন্য। প্রতুলদা তখন পলাতক। তিন আইনের গ্রেপ্তারী পরওয়ানা তার বিরুদ্ধে। সম্মেলনের শেষে ঢাকা যেতে হবে।

প্রতুলবাবুর সঙ্গে ব্যবস্থা হল দেখা করার। রাত্রি প্রথম প্রহরে পল্টন মাঠে নিয়ে গেলেন চট্টগ্রামের সারদা ভট্টাচার্য। তিনি তখন ঢাকা কংগ্রেসের কর্মী, পার্টি সদস্য। প্রতুলদা নির্দেশ দেন ফরিদপুর যাওয়ার জন্য। ওই জিলার ভার নিতে হবে আমাকে। ওই জিলার ভারপ্রাপ্ত মানুষ ছিলেন রাজশাহীর জিতেশ লাহিড়ী। জিতেশবাবু স্থানান্তরিত হলেন ঢাকায়—আর তার শূন্য স্থান পূরণ করব আমি। ঢাকা থেকে গেলাম ফরিদপুরে। দেখা হল সকল কর্মীর সাথে। অনেকেই আমার চেয়ে বয়সে বড়। সাদর অভ্যর্থনা পেলাম তাদের কাছে। কারো সঙ্গেই আমার পরিচয় ছিল না। কিন্তু উপরের পত্র পেয়ে তারা বরণ করে নেন, যেন কতদিনের চেনা।

ফরিদপুরে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ আসে। অল্পদিনের মধ্যে জিলার সীমা পেরিয়ে কুষ্টিয়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কাজ শুরু করি। ঠিক এক

বছর পরে ফরিদপুরে প্রাদেশিক সম্মেলন হয়। ওই সম্মেলনে একটি পত্র নিয়ে এলেন সিরাজগঞ্জের মণি লাহিড়ী। পত্রটি নরেন্দ্রমোহন সেনের কাছ থেকে। মণি লাহিড়ী পাবনায় প্রথম সারির কর্মী—শহিদ, রাজেন লাহিড়ীর ভাই।

নরেনদা তখন পলাতক। তিনি আমাকে ফরিদপুর ছেড়ে রাজশাহীর ভার নিতে নির্দেশ দেন। রাজশাহী মানে রাজশাহী বিভাগ—পাবনা ছাড়া আর সকল জিলা। নরেনবাবু তখন সংগঠন বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে। কলকাতায় রমেশ আচার্য গ্রেপ্তার হওয়ার পর আর প্রথম সারির কোন নেতা ছিলেন না। ঢাকায় একমাত্র নরেনবাবু। তিনি ঢাকা ছেড়ে ঘুরে ঘুরে কাজ করার পক্ষপাতী ছিলেন। রমেশবাবুর গ্রেপ্তারের পর কলকাতার দায়িত্ব ন্যস্ত করেন শচীন সান্যালের উপর। শচীনবাবুকে এলাহাবাদ থেকে নিয়ে আসা হয়।

এই বিরাট দায়িত্ব ছিল আমার কল্পনাতীত। লোকের অভাব—তাই আমার মতন তরুণ কর্মীর উপর এত বড় বিরাট দায়িত্ব। রাজশাহী থেকে আমি বাকি সকল সংগঠন পরিচালনা করেছি। কোচবিহার দেশীয় রাজ্য। কোচবিহারেও কাজ শুরু হয়। সংগঠক জলপাইগুড়ির বীরেন দত্ত। সহকর্মীদের ভিতর ছিলেন শচীন ব্যানার্জী ও পুলকেশ দে সরকার। রংপুরে সাথীদের ভেতর ছিলেন সুশীল দেব ও যতীন দেব। দিনাজপুরে কাজ শুরু হয় বিভূতি গুহের মাধ্যমে। ওখানকার ভাল কর্মীদের মধ্যে হৃষিকেশ ভট্টাচার্য। দিনাজপুর থেকে এগিয়ে যাই পুর্ণিয়ায় এবং রংপুর থেকে ধুবড়িতে। ধুবড়ীর ভারপ্রাপ্ত কর্মী ছিলেন হিরণ্য বসু। দার্জিলিংএ-ও সংগঠনের প্রয়াস হয়। ঐ জিলায় মিলিটারীর সত্যেন মজুমদার ছিলেন ভালো কর্মী। সত্যেন উত্তরকালে পার্লামেন্টের সভ্য হন।

অনেক প্রশ্ন জাগতে থাকে। নেতাদের কাছে বিশেষ করে নরেনবাবুর কাছে নানান প্রশ্ন তুলি। প্রশ্ন ওঠে ভারতবর্ষের বৃটিশ শাসনের মূল উৎপাটন করতে হলে অনুরূপ শক্তিশালী পার্টি প্রয়োজন। কোথায় কোথায় দলের শাখা আছে—বিশেষ করে বাংলার বাইরে কোথায় কোথায় সংগঠন আছে তা জানার ইচ্ছা হয়। এ সম্পর্কে নরেনবাবুর কাছেই প্রথম জানতে পারি আমাদের শক্তি ও সামর্থ্যের পরিধির কথা। নরেনবাবুর জবাবে মন ভরেনি। সশস্ত্র বিপ্লবের রূপ দেওয়ার মতো শক্তিশালী সংগঠন আছে কিনা—এ ছিল

জিজ্ঞাসা। ১৯১৫ সালে রাসবিহারী যে আয়োজন করেছিলেন—তা-ও প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। এছাড়া ছিল নেতৃত্বের প্রশ্ন। তেমন নেতা কোথায়?

নরেনবাবু আমার জিজ্ঞাসু মনের সম্মান দিলেন। পাবনা জিলায় মুলাডুলি বলে একটি গ্রামে আত্মগোপন করে থাকতেন তিনি। সেখানেই দীর্ঘ আলোচনা হয়। তিনি বলেন, অনেক কিছু করার বাকি—আমাদের তা করতে হবে। উত্তরভারতে অনুশীলন সমিতির সংগঠনের কিছু আভাস দেন। অনুশীলন ছাড়া অন্যান্য দলের বাংলার বাইরে সংগঠন ছিল না সে কথাও জানান। বিভিন্ন বিপ্লবী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে একটি পক্ষপাতহীন চিত্র তুলে ধরেন তিনি।

সবকিছু শুনে নরেনবাবুকে আরো কিছু প্রশ্ন করি। কর্মকৌশল সম্পর্কে তাঁর মত খুব পরিষ্কার। তিনি সন্ত্রাসমূলক কাজের ঘোরতর বিরোধী। ব্যক্তিগত টেররিজমে তার বিরোধিতা দ্ব্যর্থহীন। তিনি বাংলা, বিহার, আসাম নিয়ে এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনার কথা বলেন। সমতল ভূমি বাংলায় গরিলা যুদ্ধ শক্ত। ওই ধরণের সংঘর্ষের জন্য ছোটনাগপুর আদর্শ স্থল। ছোটনাগপুর অঞ্চলে ছোট পাহাড় থাকার জন্যে আত্মরক্ষা করা সহজ। তিনি স্বয়ং একাজের জন্যে বাংলা ছেড়ে ঐ অঞ্চলে যাওয়ার পরিকল্পনার কথা জানান। তার জন্যেই বাংলার সংগঠনের বিকেন্দ্রীকরণ। বলাবাহুল্য, তার সঙ্গে আলোচনা করার পরও ফাঁক থেকে গেল কতগুলি জায়গায়, এটুকু বুঝলাম যে সার্থক বিদ্রোহের সম্ভাবনা কম তবে স্থানীয় ভাবে সশস্ত্র অভ্যুত্থান করা সম্ভব। এ ধরণের সংঘর্ষ ভবিষ্যতে ব্যাপক অভ্যুত্থানের পথে প্রথম পদক্ষেপ। এর জন্যে আমাদের কিছু মানুষকে প্রাণ দিতে হবে। তখনো একথা মনে হয়নি যে এধরণের সংঘর্ষের জন্য স্থানীয় জনসমর্থন প্রয়োজন। অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে জনসমর্থন জোগার করা যায়না।

১৯২৬-২৭-এ ডাক্তার যাদুগোপাল মুখার্জীর সঙ্গে আলোচনায় খুবই উপকৃত হই। তাঁর মত ছিল খুব উদার। গুপ্ত সমিতির মানুষের সহজাত সংকীর্ণতা মুক্ত ছিলেন তিনি। দৃষ্টিও ছিল সুদূর প্রসারী। তিনি ছিলেন কতকটা National Revolutionery Democrat। সমাজবাদের কথা ভাবেননি তিনি। প্রথম প্রশ্ন স্বাধীনতা। তারপর আর সব কিছু। যে জিজ্ঞাসা নিয়ে বন্দীনিবাসে প্রবেশ করি সে কুয়াশা দূর হয় আমার। তার প্রধান

কারণ, দুটি দলের সংযুক্তি করণের প্রয়াস। এ দল দুটি মিলে গেলে অন্যান্য গোষ্ঠির একীকরণ অনেক সহজ হবে। আর এ-ও ঠিক হয় যে সুভাষচন্দ্রকে সম্মুখে রেখে কংগ্রেসের ভেতর এগুতে হবে। সুভাষচন্দ্র অন্দর মহলের মানুষ না হলেও আপনার।

আমাদের সকল উৎসাহ উদ্যমে আঘাত এল, অনুশীলন যুগান্তর সংযুক্ত দলের ভাঙন এল। এর মূল কারণ আদর্শগত নয়। গোষ্ঠিগত। বলা বাহুল্য, গোষ্ঠি স্বার্থ মূলত ব্যক্তিস্বার্থ। এই বিষাক্ত গোষ্ঠি স্বার্থ বাংলা দেশের রাজনীতির এক বিরাট অভিশাপ।

বিপ্লব কর্ম তখন দু একটি সরকারী কর্মচারী নিধনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। একটি থানা দখল করাও সম্ভব হয়নি। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ভাটার মুখে হতোদ্যম জনতার কাছে কোন বিকল্প বৈপ্লবিক কার্যক্রম উপস্থাপিত করে নতুন দিগন্তে দিশা দিয়ে জনমানসে বৈপ্লবিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। কারণ বিপ্লবীদের এ ধরণের পরিকল্পনা ছিল না। এ ব্যর্থতার জন্যে আমার মতন কর্মীও দায়ী। আমাদের হাতে যে অস্ত্র ছিল তার সাহায্যে দুর্গম অঞ্চলে দু' একটি থানা বা মহকুমা দখল করতে পারতাম। কিন্তু সে পরিকল্পনার জন্য তৈয়ারী ছিলাম না। সরকারী নিষ্পেষণের মুখে কেবল আত্মরক্ষামূলক ব্যূহ রচনা করায় ব্যস্ত থাকি। আর কোন ক্ষেত্রে তেমন জন সমর্থনও ছিল না। জন সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া এ কাজ হয় না। হয়ত কাঁথিতে সম্ভাবনা ছিল—কিন্তু ঐ মহকুমার বিপ্লবীদের কোন জোরদার সংগঠন ছিল না। গান্ধীপন্থী কংগ্রেসীদের সংগঠন ছিল। দেশের গণ জাগরণের নিজস্ব প্রতীতি ছিল না—গান্ধীর আন্দোলনের সম্বন্ধে কোন বিশ্লেষণ অনুমানও সুষ্ঠু ছিলনা। বিপ্লবীরা কেবল যুবক সর্বস্ব পার্টির চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন—বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত হয়নি।

আমি এ নিশ্চিত উপসংহারে আসি যে মূল ধারা থেকে আলগা থেকে কোন শক্তিশালী বৈপ্লবিক সংগ্রাম সম্ভব নয়। সুতরাং অবনত মস্তকে মেনে নিতে হবে মূল ধারার অনুশাসন। এ ধারায় পথ বেয়ে সহযাত্রীদের জানিয়ে দিতে হবে কংগ্রেসের নীতির অপূর্ণতার কথা। এ ধারার বাইরে থেকে উপদেশ দিয়ে একে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব নয়, ক্ষীণ ধারাকে মূল ধারায় রূপান্তরিত করার এই একমাত্র পথ। নতুবা ক্ষীণ ধারাটি এককভাবে চলতে বা মরুপথে হারিয়ে যেতে বাধ্য।

গ্রেপ্তারের পর গেলাম বক্সা দুর্গের বন্দী নিবাসে। সেখানে দেখলাম এক বন্ধ্যা গতানুগতিকতা। নতুন কোন চিন্তা বা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নেই। কেবল গোষ্ঠি বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা। অনুশীলন, যুগান্তরও তৃতীয় ব্লক, সকলেরই এই ভাবনা। এর জন্যে আলাদা আলাদা খাওয়ার ব্যবস্থা। একত্র খাওয়া দাওয়া করলে যদি দল ভেঙে যায় এই দুশ্চিন্তা। ৩০ সালের বিরাট গণ অভ্যুত্থান বিপ্লবী নেতৃত্বের উপর কোন রেখাপাত করেনি। তৃতীয় শক্তি(Third force), যারা যুগান্তর ও অনুশীলন দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে জোটবদ্ধ হয়েছিলেন। তাদের কিছু নতুন চিন্তা নতুন ভাবনা থাকা উচিত ছিল, কিন্তু তারাও গতানুগতিকতায় বন্দী। সেদিনকার নেতাদের হাসিভরা মুখের পেছনে বিষাদের ছায়া ঢাকা পরেনি। মুক্তি পেয়ে আবার দল চালিয়ে যাবেন এই চিন্তায় মশগুল। সেদিন কল্পনা করেননি যে জেলের ভেতরই দল ভেঙে যাবে।

পার্টির নেতাদের মধ্যে প্রতুলবাবুর কিছুটা জনসংযোগ ছিল। দিনের পর দিন তাঁর সাথে আলোচনা হয়। উজার করে দিই মনের কথা। কিন্তু অসুবিধা খুবই। কারণ, এ সকল আলোচনার অর্থ নেতৃত্বের ব্যর্থতা। নেতৃবৃন্দ তা স্বীকার করতে চাননি। তারা ভাবতেন আগামী দিনে ভুল ত্রুটি সংশোধন করে নিলে সব ঠিক হবে। তারা যে ব্যাপক বিপ্লব কার্য চালনার জন্যে ততটা সক্ষম নন একথা কেউ ভাবেননি। প্রতুলবাবুও ভাবেননি। এই চৈতন্যোদয় হলে নতুন পথে যেতে হবে—যেখানে হয়ত তাদের নেতৃত্ব থাকবে না। প্রতুলবাবু ছাড়া চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন কেদার সেন। তিনি বিশ্লেষণ করতেন ঠিকই, কিন্তু কোন উপসংহারে আসতেন না। মহারাজ সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা। জনচিত্তের অল্পবিস্তর খবর রাখতেন তিনি। তিনি স্বীকার করতেন সকল ত্রুটি বিচ্যুতির কথা। বলতেন "অপেক্ষা কর, মুক্তি পাওয়ার পর সব ঠিক করা যাবে।" ভবিষ্যৎ কোন পরিকল্পনা করতে চাননি।

রবিদার সঙ্গে আমার নিবিড় সম্পর্ক। এ অধ্যায়ে কলকাতায় দায়িত্ব ছিল তাঁর। মোটামুটিভাবে সকল ব্যাপারে তার সহায়ক ছিলাম আমি। বক্সা জেলে তিনি ছিলেন খুব কর্মব্যস্ত। যারা পার্টি ছেড়ে দিয়েছিলেন তাদের ফিরিয়ে আনার সর্বদা প্রচেষ্টা তাঁর। এ ব্যাপারে কিছুটা সার্থক হয়েছিলেন তিনি। তাদের সাথে আপোষ রফার ফলশ্রুতি হল। এইমত ভাটার টানের মধ্যেও কিছু প্রত্যক্ষ সশস্ত্র সংগ্রাম করা দরকার। আমি তাঁর সঙ্গে একমত

হইনি। প্রথম কারণ, তখন দ্বিতীয় সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু হয়েছে। এ সময় সশস্ত্র সংগ্রাম করা অনুচিত। দ্বিতীয় কারণ, একবার যখন সরকারী নিষ্পেষণ যন্ত্র চালু হয়েছে—তখন সব নতুন করে গুছিয়ে নিয়ে বড় কিছু করা সম্ভব নয়। আমাদের হাতে যে অস্ত্র শস্ত্র ছিল তা দিয়ে অভ্যুত্থান করা সম্ভব নয়। পার্টির কেন্দ্রীয় অস্ত্রশস্ত্রের ভাণ্ডারী ছিলেন জিতেন গুপ্ত, রাধাবল্লভ গোপ ও ক্ষিতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি তাঁকে বলি যে সারা বাংলার সংগঠনের শেষ খবর কেবল আমি জানি। সে সংগঠনের উপর বিরাট আঘাত এসেছে। regroup করাও শক্ত। তা ছাড়া পার্টিতে উচ্চ পর্যায়ে পুলিশের লোক অনুপ্রবেশ করেছে। এ সময় গোপন কাজ করা খুব শক্ত। কিন্তু রবিদা "কিছু একটা" করার ব্যাপারে অটল।

আমি অসুস্থতার জন্যে প্রেসিডেন্সী জেলে স্থানান্তরিত হই। ওই জেলে রমেশ আচার্য ছিলেন। তাঁর কাছে বকসার নতুন চিন্তাধারার কথা জানাই। রমেশবাবুর মন ছিল সামরিক অভ্যুত্থানের দিকে। সামরিক বিদ্রোহ ছাড়া কার্যকরী কোন কিছুই সম্ভব নয়। নিজেদের ব্যর্থতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন তিনি। আর তা স্বীকার করতে তার কোন সংকোচ ছিল না।

১৯৩২ সালে ২২শে মে আমরা প্রথম দল প্রেসিডেন্সী জেল থেকে দেওলী যাই। বোঝা গেল যে দীর্ঘ দিনের জন্যে জেলে থাকতে হবে।

ভারতবর্ষে তখন পর্যন্ত সোস্যালিষ্ট আন্দোলন শুরু হয়নি। মূল ধারা জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন। তার নেতৃত্ব কংগ্রেসের। এমনি পরিস্থিতিতে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়। জেলের ভেতর একটি জাতীয় বিপ্লবী দল সমাজবাদী আদর্শ ও কার্যক্রম গ্রহণ করে, আর ঠিক ওই সময় জেলের বাইরে জাতীয় সংগ্রামের জঠরে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টির জন্ম। ঘটনাচক্রে দুটি ধারার ভেতর এক স্বাভাবিক সম্পর্কের আবিষ্কার খুব তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯৩৮ সালে মুক্তি পেয়ে জাতীয় আন্দোলনের মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত হই। একদিকে কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টি ও অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র। এ অধ্যায়ে অনুশীলন দল সুভাষচন্দ্রের একান্ত ও ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। এ নিয়ে বিশদ আলোচনা আগেই করেছি, যুগান্তরের বিপ্লবীদের সুভাষ-বিরোধিতা তথা কংগ্রেসের মধ্যে তাদের ভূমিকা।

গান্ধীর প্রভাব

ওই সময় গান্ধীজীর ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আমার মনে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে। ভারতরক্ষা আইন জারি রয়েছে। সে সময় গণআন্দোলন করা এক-রকম অসম্ভব ব্যাপার। প্রকাশ্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তুতি এক কঠিন কাজ।

গান্ধীজী নিজস্ব ধারায় গণসংগ্রামের যাদুকর। গঠনমূলক কাজ ও গণ-সংগ্রাম উভয় কাজে তাঁর সমান আনন্দ। তার কর্মধারায় একটা ছন্দ আছে। যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে বিরাট গণসংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে যুদ্ধবিরোধী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ একটি বড় পদক্ষেপ। যুদ্ধ জারি থাকাকালীন এ আন্দোলন রাজনৈতিক রাস্তায় পরিচালনা না করে নৈতিক পথে নিয়ে যান। রাজনৈতিক রূপ দিলে এ আন্দোলন অঙ্কুরে নষ্ট হত এ ছিল গান্ধীর শঙ্কা। নৈতিক আন্দোলন সম্ভাব্য রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্ব।

একবছর আগের চেয়ে ওই সময় গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি পরিচ্ছন্ন, চলার ভঙ্গি ঋজু। ১৯৪০ সালে তিনি বুঝলেন যে যুদ্ধপ্রচেষ্টার সঙ্গে তার সংগ্রাম আপোষহীন।

১৯৪২ সালে গান্ধী খুব শান্ত, সমাহিত। স্থির, দৃঢ়প্রত্যয় সম্পন্ন। তাঁর সম্মুখে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা। এর আগে বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কে কোন উৎসাহ ছিল না গান্ধীর। ভারতবর্ষই তাঁর মনপ্রাণ। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ তাঁকে ভাবিয়ে তোলে। দুনিয়ার ধ্বংস স্তূপের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে ভারত-বর্ষের ভবিষ্যৎ নির্ধারন করতে হবে গান্ধীকে। এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। কবির কাছ থেকে জেনেছেন ভারত-বর্ষের আত্মার বাণী। ওই শাশ্বত ধারা বেয়ে কোথায় যাবে ভারতবর্ষ। ১৯৩৯ সালে শ্যামলী'তে বসে রবীন্দ্রনাথের সাথে স্বাধীনতার পরের ভারতবর্ষের সামাজিক রূপ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন আর একজন সত্যাশ্রয়ী তাপস। তাঁর চক্ষু দিয়ে মিলেছে সত্য দৃষ্টি।

১৯৪২ সালের মাঝামাঝি সময় কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের চেয়ে গান্ধী অনেক সংগ্রামী। আমি গান্ধী ও কংগ্রেস নেতৃত্বের ভেতর একটি সীমারেখা টানছি। এতদিন পর্যন্ত জওহরলাল কংগ্রেসের ভেতর বামাচারী বলে স্বীকৃত। সকল চিন্তা ধারা ইউরোপ থেকে ধার করা। তার নিজস্ব মৌল চিন্তা-ধারা খুব সীমিত। জওহরলাল চন্দ্র। গান্ধীর অবর্তমানে জওহরলালের চিন্তা য়ুরোপের প্রতিফলন। কতকটা ধোঁয়াটে। ভারতীয় সমাজে তা অচল।

জওহরলালের ব্যর্থতা সম্পর্কে আগামী দিনের ইতিহাস সোচ্চার হতে বাধ্য। ভারতের স্বাধীনতাকে তিনি ফ্যাসী বিরোধী আন্দোলনের অঙ্গ মনে করতেন। কিন্তু ফ্যাসী বিরোধিতা যদি ভারতের স্বাধীনতায় সহায়ক না হয়—তা হলে কী হবে তার জবাব জওহরলালের কাছে ছিলনা। সুভাষ-চন্দ্রের মনে এ ধরণের কুয়াশা ছিলনা। সুভাষচন্দ্র একান্তভাবে ইংরেজ সাম্রাজ্যতন্ত্রের বিরোধী। যদি ইংরেজ ফ্যাসীবিরোধী হয় তা'হলেও গান্ধীরও তাই।

গান্ধী অনেক সময় আপনাকে সোস্যালিষ্ট আখ্যা দিতেন। তাঁর সোস্যালিজম কেতাবী নয়। বলা বাহুল্য, তিনি ভারতবর্ষকে জানতেন গভীর-ভাবে। ভারতবর্ষের বিচিত্র ক্ষেত্রে কৃষক শ্রমিকের আপন রাজত্ব কীভাবে প্রতিষ্ঠা হবে তার ধারণা গান্ধীর খুব পরিষ্কার। মা-ও-সে তুং যেমন চীনকে গভীরভাবে জানতেন, গান্ধী ভারতবর্ষকে তার চেয়েও গভীরভাবে জানতেন।

১৯৪২-এ গান্ধীর ভূমিকায় মুগ্ধ হই আমি। যুদ্ধকালীন ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যতন্ত্র বিরোধী গণ আন্দোলন সুরু করার অর্থ স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করা। গান্ধী সেদিন সে ভীষণ ঝুঁকি নেবার জন্ম সমর্পিত প্রাণ। জীবন সমর্পনের পালা সুরু হল ৮ই আগষ্ট। বন্দী নিবাসে বসে ওই প্লাবনের বৈপ্লবিক রূপ দেখে মাথা নত হয় বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায়। আমরা যে আন্দোলন করার স্বপ্ন দেখতাম তার এক মহান অভিব্যক্তি দেখি ৯ই আগষ্ট থেকে। এত বড় গণ-সংগ্রাম করার সামর্থ আমাদের ছিলনা। আমাদের অর্থাৎ যুক্ত বামপন্থীদের। অনেক পরিকল্পনা ছিল, প্রস্তাব পাশ করেছি অনেক। কিন্তু রূপ দিতে ব্যর্থ হয়েছি আমরা।

রক্ষণশীল ও সংকীর্ণ বিপ্লবী বন্ধুরা

স্বতঃই ভবিষ্যৎ রাজনীতির সম্পর্কে ভাবনা হত। তখন যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয় সুনিশ্চিত। মুক্তি পাওয়ার পর রাজনৈতিক সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়তে হবে। ১৯৪০ দশকে রাজনৈতিক পরিবর্তন অনস্বীকার্য। কংগ্রেসের শক্তি ও ইজ্জৎ তুলনাহীন, ত্রিপুরির সময়ের কং· সো· পা ছিল খুব ছিন্নভিন্ন—কিন্তু ১৯৪২-এর বিপ্লবের পরে পুনর্জীবন লাভ করে, অমিত শক্তিশালী হয়। এর সকল কৃতিত্ব জয়প্রকাশ নারায়ণের। হাজারীবাগ জেল থেকে তার পলায়ন ও আগষ্ট বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ স্তিমিত সংগ্রামে নতুন প্রাণসঞ্চার করে।

কং· সো· পা'র কর্মকৌশল দেখে মনে হয়, ওরা আন্দোলনের আভাস পেয়ে ঠিক করেছিল আপন কর্মকৌশল। অচ্যুৎ পট্টবর্ধন, ডঃ লোহিয়া ও আরো অনেকের আত্মগোপন তার প্রমাণ। কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতৃত্বের অনুপস্থিতিতে স্বভাবতই কং· সো· পা আন্দোলনের দায়িত্ব নেয়। সংগ্রামী কংগ্রেস কোন প্রোগ্রাম রেখে যায়নি। সম্বল কেবল গান্ধীর শেষ নির্দেশ do or die. সোস্যালিষ্টরা তা পালন করেছে আপন ছন্দে।

ঢাকা জেলে দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সর্বদাই আলোচনা হত বন্ধু ও সহকর্মীদের সঙ্গে। ভবিষ্যতের কর্মনীতি সম্পর্কে স্বভাবতই আলোচনা হত। আমি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমার চিন্তাধারার কথা কোন কোন সহকর্মীর গোচরে আনি। ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ সম্পর্কে সকলেই প্রায় একমত—গান্ধীর নতুন ভূমিকা, কং· সো· পা'র অবদান প্রভৃতি—কম্যুনিস্ট পার্টির ভারত ছাড় আন্দোলনের বিরোধিতা ইত্যাদি। কিছুদিন যেতে দেখলাম যে বন্ধুরা বিশ্লেষণে সব কিছু মানলেও এর অনিবার্য ফলশ্রুতিতে পৌঁছাতে রাজী নন। এ মানসিকতায় খুব বেদনা বোধ করি। এ-ও এক ধরণের রক্ষণশীলতা। পুরানোকে জড়িয়ে থাকার প্রবণতা।

আমাদের দলের নীতি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। এ সম্পর্কে পার্টির সাথিরা অধ্যয়ন করেছে খুবই। সকলেই আমার স্নেহাস্পদ সহকর্মী, তাদের রাজনৈতিক শিক্ষা বিকাশের সঙ্গে আমি নিবিড়ভাবে জড়িত। মার্কসবাদী সূত্র প্রয়োগ সম্পর্কে তারা পুঁথির লিখিত অক্ষরের বাইরে যেতে পারতেন না বলে ব্যথা বোধ করতাম। আর বিশেষ করে ভারতবর্ষের সকল আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ না থাকার জন্য মার্কসীয় সূত্র প্রয়োগ ব্যাপারে ভুল হত। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নাড়ীর জ্ঞান না থাকলে কোন মূল নীতির application করা শক্ত।

মার্কসবাদী কথাটি ব্যবহার না করে বৈজ্ঞানিক সমাজবাদী ব্যবহার করবার পক্ষে ছিলাম আমি। কারণ ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি মার্কসবাদী। কে সাচ্চা মার্কসবাদী এ বিষয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা অর্থহীন। কম্পিটিশনে সরকারী কম্যুনিষ্ট পার্টির মার্কসবাদী বিশ্লেষণই দুনিয়া গ্রহণ করবে।

দেশের বিচিত্র বিন্যাস

ভারতবর্ষ একটি মহাদেশ। এর সমস্যা বিভিন্ন ধরণের। খুব জটিল। এখানে উলঙ্গ আদিবাসী থেকে সুরু করে অতি আধুনিক মানুষের বাস। অতএব সংস্কৃতি ও সভ্যতা মানের বিরাট তারতম্য। ধনতান্ত্রিক দেশের মতন এখানে পরিচ্ছন্ন শ্রেণী বিভাগ নেই। এখানে শ্রেণী বৈষম্যের চেয়ে বর্ণবৈষম্য (Castisme) অত্যন্ত তীব্র। এ ছাড়া সাম্প্রদায়িক বিরোধও মজ্জাগত। এখানকার উৎপাদন ব্যবস্থা নানাস্তরের। তার জন্য সম্পদ সম্পর্ক নানা ধরণের। ১৯৪৫-৪৬ সালে শিল্প ব্যবস্থার মান খুব উন্নত নয়। মূলতঃ ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। এ সকলই মৌল সমস্যা।

এ ত গেল অর্থনৈতিক দিক। তাছাড়া এ দেশের মানুষ খুব রক্ষণশীল, ধর্ম ভীরু। এখানকার তীর্থক্ষেত্র সভ্যতার ও সংস্কৃতির সঙ্গমস্থল। পৃথিবীতে কোথাও এত সংখ্যক মানুষ তীর্থদর্শনে যায় না। এক একটি উৎসব উপলক্ষ্যে এক একটি তীর্থে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয়। এ সমাবেশের জন্য কোন নোটিশ দিতে হয়না। বিলি করতে হয়না প্রচারপত্র বা দেয়াল পত্র। কুম্ভমেলা ৫ বছর অন্তর হয়। এতে হয় সকল প্রদেশের মানুষের ভীড়। যে দক্ষিণ ভারত আর্যসভ্যতা বিরোধী, ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় দাবি তোলে, তারাও কাশীতে বিশ্বনাথ দর্শনে আসেন, আর মাথা নত করে মুক্তি চায়, ধন চায়, যশ চায়, রূপ চায়। মেলা ভারতবর্ষের আপন সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচার ক্ষেত্র। মিলনের ক্ষেত্র, আনন্দ সৃষ্টির কেন্দ্র। এর জন্তেও কোন প্রচার প্রয়োজন হয় না। আপনা থেকেই মানুষ সমবেত হয়। বর্তমান রাজনৈতিক সভা ও সমাবেশের মতন প্রচার পত্র প্রয়োজন হতনা। আধুনিক মানুষ বহন করার জন্যে ভাড়া করা যানবাহনের, গাড়ী ভাড়া প্রয়োজন হয় না ও খাওয়ার খরচ দেয়ার। ভারতবর্ষের শাশ্বত ধারায় অন্তরের বিষয়টি বুঝতে হবে ফরমুলার মাধ্যমে নয়—মৌলিক চিন্তনের মাধ্যমে। গান্ধী ছাড়া সকল নেতার জনসভায় জন্য ব্যাপক প্রচার যন্ত্র চালু হত। গান্ধীর এ সকল প্রয়োজন হত না। জনতার ভীড় এড়াবার জন্যে বড় ষ্টেশনে নামতেন না তিনি। গান্ধীর কেন প্রয়োজন হত না, আর অন্যদের কেন দরকার হত সে বিষয়টিও অনুধাবন করতে হবে সকল অন্তর দিয়ে। অন্তর দিয়ে না দেখলে এর সত্যিকার জবাব মিলবে না।

বিপ্লবী দলের সীমাবদ্ধতা

আমি একথা ভুলতে পারিনি যে ভারতবর্ষে সমাজবাদী বিপ্লব সার্থক করার কাজে আমার দল খুবই ছোট। আমাদের মানবিক ও অন্যান্য সঙ্গতি ও সম্পদ সম্পর্কে আমার কোন মোহ ছিল না। এ পার্টিকে বাড়িয়ে একটি credible alternative এ রূপান্তরিত করা সম্ভব নয়। প্রশ্ন হতে পারে, তা তখনকার Communust Pairty ও খুব বড নয়। কমুনিষ্ট পার্টির কতগুলি সুবিধা আছে—যা অকম্যুনিষ্ট মার্কসবাদী পার্টির নেই। কম্যুনিষ্ট পার্টি আন্তর্জাতিক সংগঠনের অচ্ছেদ্য অঙ্গ, বৈদেশিক সাহায্যে এই পার্টির প্রসাব লাভ করার সম্ভাবনা অনেক বেশী। কম্যুনিষ্ট পার্টি সোভিয়েট সাহায্যে শক্তিমান, কোন এক বিশেষ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে একটি ছোট্ট কম্যুনিষ্ট পার্টিকে গদীতে বসিয়ে দিতে পারে সোভেয়েট রাশিয়া।

বাংলাদেশে অনুশীলন সমিতি একটি সক্রিয় পার্টি। তার দীর্ঘদিনের পুরানো সংগঠন রযেছে, তার নেতৃবৃন্দের আন্তরিকতার তুলনা নেই। কিন্তু সারা বাংলায় নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা আমাদের ছিলনা। এখানেও আমরা একটি পার্টি মাত্র। ভারতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ধারক বাহক হওয়া সম্ভব নয় ক্ষুদ্র পার্টির পক্ষে।

তার জন্ম আমার সুচিন্তিত পরামর্শ ছিল কংগ্রেস ও সোশ্যালিষ্ট পার্টির সাথে মিলে যাওয়া। ১৯৩৭-৩৮ সালে একবার মিলিত হয়েছিলেম আমরা, তারপর কতগুলি অনিবার্য কারণে মতবিরোধ হয়। সেই বিচিত্র পরিস্থিতি আর নেই! আগষ্ট বিপ্লরের পর কং· সো· প্যার গুণগত পরিবর্তন লক্ষ্য করার। কং· সো· প্যার শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে দারুণ ভাবে। কংগ্রেসের বিকল্প হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাদের। আমরা মিলিত হলে কেবল শক্তি বৃদ্ধি পাবেনা—একটি ঐক্যবদ্ধ সমাজবাদী দল প্রতিষ্ঠার দুর্বার প্রবাহ সৃষ্টি হবে। কং· সো· পা কংগ্রেসের ভেতর একমাত্র শক্তিশালী বিকল্প। এ ধারাটি শক্তিশালী হলে জাতীয় বিপ্লবের নেতৃত্ব কংগ্রেসের হারাবার সম্ভাবনা আছে। বাংলাদেশে বহু দল জিইয়ে রাখার ঐতিহ্য সর্বজনবিদিত। অনুশীলন, যুগান্তর ৪০ বছরের বেশী বাংলায় যুবশক্তির নেতৃত্ব যুগিয়েছে—কিন্তু তারা একত্র হতে পারেনি। তখনকার পরিস্থিতিতে আর এস· পি আর একটি দল হবে মাত্র।

১৯৩৫-৩৬-এ দেউলী বন্দী নিবাসে অনুশীলন সদস্যবা কং সো পাঃর সঙ্গে মিলনের প্রস্তাব পাশ করতে সমর্থ হন। কিন্তু ১৯৪৩-৪৪ সালে এ ধরণের

মিলন প্রস্তাব পাশ করা সম্ভব হল না। সেদিনও কং. সো. পাঃ মার্কসবাদী লেনিনবাদী বিশ্বাসী। মীরাট ও ফৈয়জপুর থিসিসে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ঘোষণা রয়েছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ যদি মিলনের নিরিখ হয় তা হলে অসুবিধা কোথায়? আমরা মার্কসবাদ লেনিনবাদ গ্রহণ করেও কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে মিলে যাইনি। পক্ষান্তরে প্রমাণ করতে চেয়েছি যে কম্যুনিষ্ট পার্টি সাচ্চা মার্কসবাদী লেনিনবাদী নয়। সকল অকম্যুনিষ্ট মার্কসবাদী লেনিনবাদ পার্টিই বোধ হয় এ দোষে দুষ্ট। কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে এ লড়াই করা বৃথা। কারণ তারা আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের অংশ বিশেষ। তাদের কার্যাবলীই মার্কসবাদী লেনিনবাদী বলে গৃহীত হবে। মার্কসবাদ লেনিনবাদের মূলসূত্র যেমন—Historical materialism, class struggle, Dictatorship of proletariat-এ ধরণের তত্ত্ব সকল দল মেনে নেয়, তাহলে কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে আলাদা দল লালন পালন করার সার্থকতা কোথায়? এ সবই আপন গোষ্ঠী মনোভাব বিসর্জন দেয়ায় অনীহা। গোষ্ঠীও এক ধরণের কায়েমী স্বার্থ। এর গতি ডিঙিয়ে যাওয়া খুব শক্ত। বাংলায় প্রাক্তন বিপ্লবীরাও ছিল এ ব্যাধির বন্দী।

আমার মতবাদের কথা যে বিভিন্ন জেলে ছড়িয়ে গেছে তা দমদম জেলে স্থানান্তরিত হয়ে বুঝতে পারি। সম্মুখীন হলাম কিছু বাঁধান মনের সাথে। খুব দুঃখ হল যে আমার কথা আমার কাছ থেকে না শুনেই মন বেঁধে ফেলেছে কিছু কিছু তরুণ কর্মী।

দমদম জেলে এসে আমার নিজস্ব চিন্তাধারার কথা কাউকেই জানাইনি —কারণ যে সকল অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক কর্মীরা ছিলেন তাদের মত ও মন নির্ধারিত হয় অন্যের দ্বারা। খোলা মনের অভাব। দমদমে সমস্যা দেখা দিয়েছিল অন্য দিক থেকে। তা হচ্ছে কম্যুনিষ্ট পার্টিতেই আর. এস. পি. সদস্যদের যোগ দেয়া উচিত। এদের মুখপাত্র ছিলেন কুমিল্লার বীরেন ভট্টাচার্য। দমদম জেলে প্রবীণদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রমেশ আচার্য ও কেদার সেনগুপ্ত। এদের সঙ্গে দমদম জেলের অন্যান্য কর্মীদের খুব তাত্ত্বিক আলোচনা হত না। কেদারবাবু অসুস্থ। রমেশবাবু কতকটা হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। দমদমে পৌঁছে আমি ঢাকা জেলে রচিত আর. এস. পি. নীতি বক্তব্য বিশ্লেষণ করে বোঝাতে থাকি। তার ফল ভালই হয়। ২/৩ মাস সর্বক্ষণ তাত্ত্বিক আলোচনা, ক্লাশ নিয়ে দলত্যাগ করার প্রবণতা বন্ধ

করি। মেদিনীপুর জেল থেকে বন্ধুরা আসার ফলে দুর্গ রক্ষা করা সহজ হয়। আমার চিন্তাধারার কথা কেবল দু-এক জনের কাছে জানাই।

ঐ সময় গান্ধীর কাছে একটি পত্র লিখি। খুবই ছোট্ট পত্র। তার একটি সুন্দর জবাব পাই। ভাবলাম যদি বন্ধুদের সাথে ছাড়াছাড়ি হয় তাহলে গঠনমূলক কাজ করব গান্ধীর নির্দেশে। গঠনমূলক কাজের প্রয়োজনীয়তা খুব অনুভব করি—বিশেষ করে ভারত ছাড় আন্দোলনের পর থেকে। সারা ভারতবর্ষে যেখানে যেখানে গঠনমূলক কাজ হয়েছে, সেখানেই ভারত ছাড় আন্দোলন শক্তিশালী কেন্দ্র, গঠনমূলক নীরব কর্মীরা সরকারী প্রশাসণ যন্ত্রকে স্তব্ধ করার কাজে ছিল অগ্রণী। তমলুক ও কাঁথি মহকুমা তার প্রমাণ।

হতাশার ছায়া

আলিপুর থেকে এলেন প্রতুলবাবু। প্রতুলবাবুর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হয়। প্রতুলবাবু কতকটা মনমরা। মনে যেন চাপা বিক্ষোভ লুকানো। খুব বিষণ্ণ। কতকটা হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। প্রতুলবাবু যেন আগের প্রতুলবাবুর ছায়া। আলোচনায় মনে হল তার মন কিছুটা কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতি সহানুভূতিশীল।

এর আগে রমেশবাবুর (আচার্য) সাথে বিশদভাবে আলোচনা হয়। তিনি কতকটা গতানুগতিকতায় বন্দী। নতুন কিছুই ভাবেন নি। তারপর এলেন মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী। মহারাজের নিজস্ব চিন্তাধারা আছে। ভারত ছাড় আন্দোলনের জন্যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক শক্তি বিন্যাসের যে মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে তা বুঝতেন তিনি। বুঝলেও নতুন পথ আবিষ্কার করেননি—তিনি ভরসা করতেন সহকর্মীদের উপর। তিনি এক সময় ঢাকা জেলে ছিলেন। তখন পার্টির প্রবাহমান রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে তার মিল ছিল না। আর. এস. পির সঙ্গে তাঁর মনের যোগ ছিঁড়ে গেছে মনে হল। জ্ঞান মজুমদারের মতও কতকটা মহারাজের মতন।

সকলের মনে এক ধরণের নিরাশার ছায়া। তার প্রধান কারণ সুভাষচন্দ্রের অভাব। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে যে নতুন পার্টি গড়ার আশা ছিল তা ভেঙে গেছে। মুক্তির পর আগামী দিনে কি করা যাবে সে সম্পর্কে মনে নানা প্রশ্ন। প্রবীণ নেতৃবৃন্দ আর. এস. পি. কর্মধারার সম্পর্কে উৎসাহহীন। নতুনভাবে কী করা যায় সে সম্পর্কে কেউ কেউ ভাবছেন।

আর. এস. পি.

ওই সময় খুবই অল্প সংখ্যক বন্দী ছিলেন বন্দী নিবাসে। অনেকেই বাইরে গিয়ে কাজ সুরু করেছিল। ত্রিদিব তখন জেলের বাইরে। ত্রিদিবের সঙ্গে আমার কোন মৌল পার্থক্য ছিল না বলেই আমার ধারণা। emphasis-এর ব্যবধান ছিল আমাদের ভিতর। দমদম জেলে আমরা দুজনে পাশাপাশি সেলে ছিলাম ৭নং ওয়ার্ডে। তার মুক্তির আগে দীর্ঘ আলোচনা হয় আমার সঙ্গে। তখনো অন্যান্য বন্দী নিবাস থেকে প্রবীণ নেতৃবৃন্দ দমদমে পৌঁছায়নি। তাই তাদের তখনকার চিন্তাধারার কথা বিশদভাবে ত্রিদিব জানত না। তার জন্যে স্বতই কিছুটা অসুবিধা হয়েছে। ত্রিদিবের সঙ্গে আমার সম্পর্ক দীর্ঘ দিনের। ১৯২৯ সাল থেকে একত্র কাজ করেছি আমরা। ত্রিদিব তখন বহরমপুর কলেজের ছাত্র। ওই সময় থেকে নানা ঝঞ্ঝার ভেতর দিয়ে চলেছি আর নানান চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছি আমরা। কোনদিন কোন মতবিরোধ হয়নি। তিরিশের দশকে দেউলী জেলে যখন অনুশীলন সমিতির একটি অংশ পার্টি ছেড়ে Communist Consolidation এ যোগ দেয় তখন ওই সঙ্কট পেরিয়েছি একত্র হয়ে। কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট পার্টিতে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্তে ত্রিদিব অন্যতম রূপকার। আমাদের চেয়ে প্রায় এক বছর আগে মুক্তি পেয়ে কং. সো. পা র সঙ্গে মিলনের সকল দায়িত্ব নিয়েছিল আপন কাঁধে। অনুশীলন দলের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমরা উভয়ই ছিলাম সজাগ। আমাদের ছোট্ট গোষ্ঠি সোস্যালিজম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কার্যকরী ও উপযুক্ত হাতিয়ার নয়, নতুন নেতৃত্ব প্রয়োজন। সতীশ সরকারও আমাদের সঙ্গে একমত ছিলেন। ১৯৩৭-৩৮ সালে উভয়ই ছিলাম অনুশীলন দল বিলোপ করে বড় দলের সঙ্গে মিলনের পক্ষপাতী।

১৯৩৭-৩৮ সালে যা ছিল সম্ভব—৪৪-৪৫ সালে তা সম্ভব হল না। আসলে অনুশীলন দলই নাম পরিবর্তন করে হয় আর. এস. পি.। তাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে যা কিছুই বলি না কেন বস্তুত উভয় ছিল এক। কোন নতুন নেতা বা গোষ্ঠী আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করেনি। কেবল দ্বিতীয় সারির নেতারা নেতৃত্বের অংশীদার হন। মানুষগুলির কোন পরিবর্তন হয়নি। পার্টি কিছুটা formal হয়। উভয় অধ্যায়েই সোস্যালিজম ছিল আদর্শ। এবং তা মার্কসীয় সোস্যালিজম।

ত্রিদিব ও সতীশবাবু স্বীকার করতেন যে কেবল ideology-র উপর নির্ভর

করে পার্টি গড়ে ওঠে না। নেতৃত্বও বড় কথা। রুশ সোশ্যাল ডেমক্রেটিক পার্টিতে লেনিনের মত নেতা না থাকলে অক্টোবর বিপ্লব সার্থক হত কিনা সন্দেহ। ১৯১৭ সালের যে মাসে sealed train-এ লেনিন রাশিয়ায় এসে বলশেভিক পার্টির কর্মনীতি পরিবর্তন করে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব না দিলে বলশেভিক পার্টি রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে পারত না বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। চরম লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে দলের প্রয়োজনীয় শক্তি যদি না থাকে তবে তার সার্থকতা কোথায়?

১৯৪০-এ ব্যাপক গ্রেপ্তারের আগে আর. এস. পি. খুব বেশী কাজ করতে পারে নি, কেবল যাত্রা শুরু। জেলে সব বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা হয় মহারাজ, প্রতুলবাবু, জ্ঞানবাবু প্রভৃতির সঙ্গে। মহারাজ ও জ্ঞানবাবু ছিলেন কংগ্রেসের ভিতর দিয়ে কাজ করার পক্ষপাতী। আর কংগ্রেস প্লাটফরমে কাজ করতে হলে কং. সো. পার. সঙ্গে মিলে যাওয়া যুক্তিযুক্ত। এ নীতির ফলে কংগ্রেস ও ছাতার প্রয়োজন হবে না—আর কং. সো. পার. সঙ্গে মিলিত হয়ে জাতীয় বিপ্লবের বামপন্থী শক্তি হিসেবে গড়ে ওঠা হবে সহজ। দমদম জেলে বরিশালের দেবেন ঘোষ ও যতীন রায়ের মত প্রবীণ সদস্যরা মহারাজের সঙ্গে একমত। মহারাজ জানালেন যে রাজশাহীর প্রভাস লাহিড়ীও মহারাজের সঙ্গে সহমত। ১৯৪৫ সালের শেষের দিকে বৈধানিক ভাবে কাজ সুরু করে আর. এস. পি.। সতীশবাবু (সরকার) প্রথম প্রাদেশিক সম্পাদক। পার্টির কাজকর্ম সম্পর্কে কিছু খবর পেতাম জেলে বসে।

শ্রমিক দলের নতুন নীতি অনুযায়ী দেশে নতুন নির্বাচন ঘোষণা করা হয়। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভাগ্য যে বিপুলভাবে পরিবর্তন হবে তা রাজনৈতিক মহলের দৃঢ় ধারণা। চার্চিল শোচনীয়ভাবে পরাজিত হবে তা অনেকেই অনুমান করেননি। তার ফলে জাতীয় বিপ্লবের কর্মনীতির পরিবর্তন হবে প্রচণ্ডভাবে। বিধানসভা নির্বাচনে অনুশীলন দলকে কেবলমাত্র ৩টি আসন দিল প্রাদেশিক কংগ্রেস। বেশী আসন পাওয়ার জন্য কোন চেষ্টাই করেননি বন্ধুরা। গণেশ ভট্টাচার্য, প্রভাস লাহিড়ী ও অমূল্য অধিকারী এ তিনজনই জয়লাভ করে। প্রতুলবাবুর আসনটি অন্য দল পেল। যে তিনজন নির্বাচিত হলেন তারা কেউই আর. এস. পি. সভ্য বলে পরিচয় দেয়নি। কেউ কেউ জেলে থাকা সত্ত্বেও নির্বাচনে প্রার্থী মনোনীত হয়েছিলেন—যেমন মনোরঞ্জন গুপ্ত। মনোরঞ্জনবাবু প্রার্থী হওয়ার পরই মুক্তি, নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার

জন্যে। প্রতুলবাবুর বেলায় তা করা যেত।

নির্বাচন সমাপ্ত হল। নতুন লীগ মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হল সহিদ সারওয়ার্দীর নেতৃত্বে। মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হওয়ার পর আমরা ১৫/১৬ জন বন্দী ছাড়া সকলেই মুক্তি পান। ওই ১৫ জনের মধ্যে ছিলেন প্রতুলবাবু, মহারাজ, অনিল রায়, ভূপেন দত্ত, অরুণ গুহ প্রভৃতি। ১৯৪৬ সালে মে মাসে আমরা সকলে মুক্তি পাই।

এই জটিল অথচ সৃজনশীল অবস্থায় সম্মুখে আর.এস পি. যেন দিশেহারা। রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে কীভাবে দাগ কাটা যাবে! কীভাবে বৃটিশ নীতিকে বানচাল করে জাতীয় বিপ্লবের পূর্ণার্জন সমাপ্তি হবে এবং তাকে কীভাবে সমাজবাদী বিপ্লবের পন্থায় এগিয়ে নিতে হবে সে সম্বন্ধে কোন নীতি নির্ধারণ হয়নি। অথচ ওই ছিল আর. এস. পির. ঘোষিত নীতি। রাজনীতির গতি প্রবাহের নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে পার্টি কোন অংশ গ্রহণ করতে পারেনি। ১৯০৫ সাল থেকে অনুশীলন সমিতি বাংলাদেশের এক বিরাট শক্তি। এই পার্টির স্বাধীনতা যজ্ঞে চরম অবদানের কথা সকলের জানা। কিন্তু যজ্ঞের এক চরম মুহূর্তে সে পার্টি (যা আর. এস. পিতে রূপান্তরিত) রঙ্গমঞ্চে নীরব দর্শক মাত্র।

উনিশ ঃ পুণ্য এ জন্মভূমি, করো প্রণিপাত

অস্তাচলের দিকে এগোই আর পূর্বাচলের দিকে তাকাই। পূর্বাচলের জন্যে কত না প্রাণের টান। কত না দৃশ্যপট একের পর এক এসে উপস্থিত হয়! শৈশব থেকে যা যা চিত্তে গভীর রেখাপাত করেছে তা ত আমার জীবনে সত্য। ঘটনার ছাপ, মহামানবের চরণ রেখা। তাদের চরণপাতে ধন্য আমি।

জীবন প্রবাহে আমার উপর কার রেখাপাত গভীর, বলা শক্ত। কালের স্রোতে রেখাপাত করেছে একের পর এক। Accidents এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার আলোচনায় প্রবেশ করতে মন নারাজ। কিন্তু Accident ত আমার জীবনে সত্য। ওই accident এর প্রভাব অস্বীকার করা অসম্ভব।

১৫ বছর বয়সে দশম শ্রেণীর ছাত্র। পৃথিবী সম্পর্কে কী বা জ্ঞান আমার! কিন্তু ওই সময় যে ঘটনা ঘটে তার বেড়াজাল থেকে বের হতে পারিনি কখনো। সে এক দুঃসাহসী অভিযান। দুহাত দিয়ে বিশ্বকে ছুঁতে চাইলাম, ঠিক শিশুর মতন হেসে। এক জন এসে বলেন বিপ্লবের কাণ্ডারী হতে, রাজী হলাম আনন্দে। আঁধার রাত্রে যাত্রা সুরু। বিপদসংকুল বন্ধুর পথ। বিপদ বরণ করায় কত না আনন্দ! স্নেহকাতর পিতামাতার আশ্রয় থেকে নীরবে যাত্রা আরম্ভ।

শৈশব থেকেই আমি আবেগধর্মী। কিছুটা কবিত্বপূর্ণ। গদ্যধর্মী হলে হয়ত বিপ্লবী দলে সভ্য হতে পারতাম না—বিপ্লবীরা অন্তরে কবি। কবি না হলে আপন হাতে ফাঁসীর দড়ি পড়তে পারে না আপন গলায়। কবি মনের দরুণ কবিতা লেখার প্রয়োজন হয়না—প্রয়োজন বোঝার, গভীরভাবে অনুধাবন করার।

বিপ্লবের দীক্ষাগুরু আনন্দমঠ পড়ে শোনালেন, কী দিতে হবে। প্রাণ তুচ্ছ, সকলেই দিতে পারে। দিতে হবে ভক্তি। তখন কথামৃত পড়তাম। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও বলতেন, শ্রদ্ধা ভক্তি দে। দেশমাতার বন্ধন মোচনের জন্যে দেশভক্তি। তখন আর সবই গৌণ।

পাঠ্যপুঁথি ছিল স্বামীজীর গ্রন্থ, গীতা ও বঙ্কিমের অনুশীলন তত্ত্ব। এ সকল পুঁথি ছিল জীবনবেদ। বিশ শতকের প্রথম দিকে বাঙালী কিশোর ও যুবকদের প্রাণের রাজা স্বামী বিবেকানন্দ। আর একটি উৎস ছিলেন

রবীন্দ্রনাথ—বিশেষ করে তাঁর দেশাত্মবোধক কবিতা ও গান।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও গণ্ডী টেনে দেন নেতারা। কোন বই পড়ব কী ধরণের কবিতা ও গান শুনব। প্রেমের গান শোনার সুযোগ হয়নি, পড়েছি।

'এসেছে সে এক দিন,
লক্ষ পরাণে শংকা না জানে, না রাখে কাহারো ঋণ।
জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনা হীন।'

কিন্তু প্রেমের কবিতা পড়া বা প্রেমের গান শোনার কোন নির্দেশ আসেনি কখনো। ব্রতী জীবন—বিক্ষিপ্ত হবে মন। বন্ধুরা কেউ কেউ গান জানত। "প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ চয়নে" এ গান তারা জানতনা। বিপ্লবীদের এক ধরণের ছক কাটা জীবন। ওই গান না শুনলেও নিঃশব্দ চয়ণে প্রেম আসে মানুষের জীবনে। এমনকি বিপ্লবী জীবনেও। প্রেমই মানুষের আদিম প্রবৃত্তি। প্রেমের গোপনতা আরো মধুর। বিবেকানন্দ যেমন আদর্শ, রবীন্দ্রনাথ তেমনি গর্বের বিষয়। গর্ব ছাড়া দেশপ্রেম গড়ে ওঠে না। আমার দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার জুড়ি নেই, একথা না ভাবলে দেশপ্রেমিক হওয়া যায় না। এটা revivalism নয়। এ এক ধরণের আবেগ এক ধরণের চেতনাবোধ। দেশ সম্পর্কে গর্ববোধ, এর ধূলিকণাটুকু পবিত্র, এ চেতনায় ভরপুর আমরা। যোগীন্দ্রনাথ বসুর কবিতা পড়তাম,

"দেখ বৎস সম্মুখেতে প্রসারিত ভারতের মানচিত্র
আমা সবাকার পুণ্য জন্মভূমি এই
তুমি কর প্রণিপাত, তুমি কর প্রণিপাত।

গর্ব ছিল ভারতের সুসন্তানদের সম্পর্কে—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, শ্রীমধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, পি· সি· রায়—সকলেই গৌরবের, সকলেই প্রণম্য। বাণী অনুরণিত হত আমাদের প্রাণে।

ইয়োরোপীয় ইতিহাসের প্রভাব ছিল খুবই। কিন্তু সে প্রভাবকে ভারতীয় শাশ্বত ধারার জারক রসে সিঞ্চিত করে গ্রহণ করেছি আমরা। রামায়ণ ও মহাভারত থেকে শক্তি সঞ্চয় করেছি, কালী সিংহের মহাভারতের শান্তিপর্ব ছিল অবশ্য পাঠ্য।

দলে প্রবেশ করে একজন মানুষের সান্নিধ্যে আসি। তার নাম যতীন্দ্র

রায় (ফেগু রায়) বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি। অকৃতদার। নিষ্ঠাবান মানুষ। সাধারণ মানুষের কাছে ফেগু ডাকাত বলে পরিচিত। তাঁর সম্বন্ধে অনেক legend আছে। কত শত মাইল এক নাগাড়ে হেঁটে গিয়েছেন—কত বড় নদী সাঁতার কেটে পার হয়েছেন, কত সংঘর্ষ করেছেন। অকুতোভয়। উচিত বক্তা। অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি কখনো। সেবাব্রতী যতীনদা যেন ঝক্‌ঝকে ইস্পাত।

গান্ধীজীর আন্দোলন যখন তুঙ্গে, বিপ্লবী দলের সভ্য হই তখন। বিপ্লবীরা হিংসায় বিশ্বাসী গান্ধী অহিংস ধর্মের প্রবক্তা। সম্পূর্ণ বিরোধী ধর্ম। তাহলে কি হবে! গান্ধীকে অস্বীকার করা অসম্ভব। সূর্যকে অস্বীকার করা যায়না। সশস্ত্র বিপ্লবের পূজারী হয়েও তাঁকে দেখতে গিয়েছি ২৫ মাইল পায়ে হেঁটে। প্রথম দেখি ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বরে। তাঁর প্রোগ্রাম খুব পরিষ্কার। বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। বিলেতী বর্জন। আমরা ছোটবেলা থেকে ম্যানেচেষ্টার ধুতি পরতাম। পরিধেয় সবই বিলেতী। সরকারের সঙ্গে পূর্ণ অসহযোগ। বিলেতি বস্ত্র যজ্ঞের প্রোগ্রাম পালন করেছি—ত্যাগ করেছি মিহি বিলেতি ধুতি। বিপ্লব ধর্মে দীক্ষিত কিন্তু গান্ধীর নির্দেশ অমান্য করিনি। এ এক দ্বৈত অবস্থা। এ বিচিত্র অবস্থাটির খবর না রাখলে বোঝা যাবেনা এ অধ্যায় বিপ্লবী জীবনের কথা।

ওই বস্ত্র যজ্ঞের প্রবল বিরোধিতা করেন রবীন্দ্রনাথ। প্রচণ্ড আঘাত পেলাম। এ কী কথা বলছেন আমায়ের প্রিয় কবি! বয়স কম। জ্ঞানের পরিধি আরো কম। কবির বক্তব্য বুঝতে পারিনি সেদিন। ভাবলাম, বদলে গেছেন আমাদের কবি। পরিণত বয়সে কবির ওই লেখা পড়েছি আমরা। এখনো যখন "কালান্তর" পড়ি তখন নিজেকে অপরাধী মনে হয়। কৈশরে—বিশেষ করে ১৯২১-২২ সালের উন্মত্ততার আবর্তে অপরিণত মানুষ ভুল বুঝেছেন কবিকে। রবীন্দ্র দর্শন হৃদয়ংগম করার ক্ষমতা ছিলনা সেদিন।

গান্ধীর কর্মযজ্ঞের পবিত্র পরিচ্ছন্নতা, তাঁর ঋজুগতি প্রাণ মাতানো ও মন ভোলানো। ইংরেজের বিরুদ্ধে তার নৈতিক বলিষ্ঠ আচরণ সর্বহারা মানুষের প্রাণে সাড়া জাগায়। তাদের ভেতরই তিনি পেতেছেন তার আসন, অচ্ছুৎ ভাঙ্গিদের ভেতর তাঁর আবাস।

যৌবনে পা দেয়ার আগে থেকে খাদি পরিধান করে পুত শুদ্ধ বোধ করি। স্বাধীনতা যজ্ঞের এ যেন আবশ্যকীয় উপাচার। শুদ্ধ ও সত্য আচরণই একমাত্র

পথ। বিপ্লব কাজের সঙ্গে গান্ধীর ব্যবহারিক নীতির কোন বিরোধ বুঝিনি। বিপ্লবের কাজের জন্য যখন পলাতক, তখনো খাদি পড়েছি। খাদি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে—পুলিশের ত নিশ্চয়ই। তবু ওই পোষাক বদল করিনি!

এ যেন এক নতুন সভ্যতা। ট্রামে, ট্রেনে মানুষ আসন ছেড়ে দিত খাদি পরিহিত কর্মীদের। খাদি স্বাধীনতা যজ্ঞের জয়ধ্বজা।

কর্মীদের ভেতর ধূমপানও করতেন না অনেকেই। কারণ আদর্শ দেশবন্ধু। দেশবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব নিয়ে কেবল বিরাট প্রাকটিশ ছাড়েননি—ছেড়েছেন সুরাপান। শেষ পর্যন্ত ছেড়েছিলেন ধূমপানও। এ সকল কংগ্রেস প্রোগ্রামের মধ্যে ছিল না। কিন্তু এ সকল ছাড়া পূজার আয়োজন অসম্পূর্ণ, এ ছিল মানুষের বিশ্বাস। কাউকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হত না। সকলেই এই সকল বাঁধন গ্রহণ করেছেন নীরব হয়ে, নম্র হয়ে।

এ সব কিছুরই পরিবর্তন হয় স্বাধীনতার অর্জনের পরে, এক ধরণের গুনাত্মক পরিবর্তন। স্বাধীনতা লাভের মুহূর্তে মানুষের মত আশায় ভরপুর। ত্যাগের জন্যে আত্মনিবেদনের জন্য মানুষ প্রস্তুত। এতদিন ধরে ইংরেজের অপসারণের জন্য ত্যাগ তিতিক্ষা ও বলিদান, তা যখন সার্থক হল তখন সাধারণ মানুষ সব কিছু করার জন্যে প্রস্তুত। সেদিন একদিকে ছিল ভয়, অন্যদিকে ভরসা। সাম্রাজ্যবাদী সমর্থকদের অন্তরে ভয়, আর স্বাধীনতার সৈনিকদের ভরসা। সেদিন একটি অঙ্গুলি হেলনে বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীদের মুছে ফেলে দিতে রাজী ছিল সাধারণ মানুষ। মানুষ চেয়েছে নির্দেশ। কিন্তু তা পায়নি।

মানুষ ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট আর ১৫ই আগষ্টের ভেতর কোন মৌল ব্যবধান বুঝতে পারেনি। সরকারী ভবনে পতাকা পরিবর্তন ও কিছু মন্ত্রী পরিবর্তন ছাড়া আর কিছু হয়নি। ক্ষমতা বদল ও পালা বদলের কোন আভাষ পায়নি সাধারণ মানুষ। তারা অবাক বিস্ময়ে ভেবেছে কোথায় স্বাধীনতা! দুর্গত মানুষ কী পেল? সর্বহারা কি পেল? যে যেমন ছিল—তেমনটি বহাল রয়েছে। যারা ভয়ে গর্তে লুকোবার কথা ভেবেছিল—তাদের আহ্বান করে বসানো হল উচ্চ থেকে উচ্চতর আসনে। যারা রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ঘরছাড়া তারা ঘরছাড়াই রইলো। যারা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দলন করেছে, ঘৃণা করেছে, সাধারণ মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার করেছে, তারাই আবার আসর জেঁকে বসল। গিরিজাশংকর

বাজপাই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এত বড় একটা দেশদ্রোহী বৃটিশের পা চাটা —যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সকল শক্তি নিয়োগ করেছে—তাকে সম্মানের আসনে বসালেন পণ্ডিত নেহেরু। ওই লোকটি পেল সবচেয়ে লোভনীয় পদ। সেক্রেটারী-জেনারেল। একই আচরণ সর্দার প্যাটেলেরও। ওরা নাকি দক্ষ কর্মচারী! ওদের ছাড়া চলবে না। যারা ভারত ছাড় আন্দোলনে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের হত্যা করেছে তারা পেল শিরোপা। সেই ইংরেজদের আমলাতন্ত্রের হাতেই শাসন ক্ষমতা সঁপে দিলেন প্যাটেল-নেহেরু। Indian Civil Service। ছোটবেলা থেকে শুনতাম যে ওরা ইণ্ডিয়ান নয়। সিভিলও নয়, আর সার্ভেণ্ট বা সেরকম নয়। সাম্রাজ্যিক শোষণের উচ্ছিষ্টের পাহাড়ে বসলেন নেহরু, প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাজা গোপাল আচারী।

জিন্না যে সাহস দেখিয়েছেন—সে হিম্মত তারা দেখাতে পারেনি। জিন্না মাউণ্টব্যাটেনকে গভর্ণর জেনারেল করতে রাজী হননি—কিন্তু নেহরু-প্যাটেল তাকে রেখেছেন তোষামোদ করে। যে লোকটি তার পত্নী ও কিছু ভারতীয় বড় অফিসারদের সাহায্যে ভারত বিভাগ পাশ করিয়ে নিল—সে লোকটি হল ভারতবন্ধু।

ভয় পেয়েছিলেন নেতৃবৃন্দ। মাউণ্টব্যাটেন না থাকলে সৈন্যবাহিনীর উপর কব্জা থাকবে না—রাজন্য নৃপতিরা ভারতবর্ষে আসবে না, আরো কতকি। রাজন্য নৃপতিরা কোথায় যেত? সাধারণ মানুষ তাদের আসন থেকে নামিয়ে দিত—ধুলায় লুটাত তাদের মুকুট। হায়দ্রাবাদের নিজামের ভারতবর্ষের বাইরে যাওয়া সাধ্য ছিল না। নিজাম কিছু অর্থ নিয়ে পালিয়ে যেতে পারত। কিন্তু হায়দ্রাবাদের মানুষ যেত না তার সঙ্গে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা ত আকাশ কুসুম নয়। বাস্তব জিনিষ—সম্পূর্ণ material। স্বাধীনতা এল, কিন্তু সম্পদের ন্যায্য বিভাজন হল না। Redistribution of Property ছাড়া স্বাধীনতার আস্বাদ অনুভব করা যায় না। সর্বহারা সব পেলেই স্বাধীনতার তাৎপর্য, কেবল পতাকা বদলে নয়।

ফল হল বিষময়। রাজাজী পেলেন বৃটিশ ভাইসরয়ের পরিত্যাক্ত বাড়ীটি, নেহেরু প্রবেশ করেন বৃটিশ প্রধান সেনাপতির পরিত্যাক্ত রাজভবনে, প্যাটেল, রাজেন্দ্রবাবু প্রভৃতি বৃটিশ রাজপুরুষদের প্রাসাদোপম বাংলোতে। গান্ধীর রাষ্ট্রপতি ভবনকে হাসপাতালে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার উপদেশ ভুলে গেলেন নেতৃবৃন্দ।

প্রায় একই সময়, দুবছরের কম ব্যবধানে রাষ্ট্রক্ষমতায় এসেছে চীনে মা-ও সে তুং চৌ-এন-লাই, নিজের জীবন দিয়ে যে নতুন সমাজের রচনা করার দায়িত্ব নিলেন—সে দায়িত্ব কোথায় নিলেন ভারতবর্ষের নেতারা।

এ ছিল নিবেদনের সময়, আত্মসমর্পণের পালা। নেতৃত্বের দোষে এসে গেল ভাগের পালা। সকলেই যেন কিছু পাওয়ার জন্য উদগ্র বাসনা। দেশ-প্রীতির স্থানে এল আত্মপ্রীতি। স্বার্থ। ফলে প্রচণ্ড অবমূল্যায়ন হলো মানুষের। চীনে তা হলো না। স্বাধীনোত্তর মানুষকে যেন আর চেনা যায় না। যত দিন যাচ্ছে, তীব্র হচ্ছে অবমূল্যায়নের গতি। নেতৃত্বের দেখাদেখি সবাই কিছু পাওয়ার নেশায় মাতাল।

গান্ধী তখন নিঃসঙ্গ। কেউ তার কথা শোনে না। তার সৃষ্টি ভক্তেরাও না। পাকিস্তানে গিয়ে বাস করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন কত না বেদনা-হত চিত্তে। প্যাটেলও প্রায় তাঁকে অপমান করতেন—জহরলাল তা করেননি কোনদিন। কিন্তু জওহরলালও কোনদিন পুরোপুরি গান্ধীদর্শনে বিশ্বাস করেননি। তিনি ছিলেন জাঁকজমকের রাজা।

নেহেরু একটি কালোবাজারীকেও নিকটবর্তী আলোকস্তম্ভে ঝোলাননি, একটি বস্তিরও সংস্কার করেননি, হরিজনের অবস্থার কোন পরিবর্তন করেননি। দিল্লীকে নিউইয়র্কে রূপান্তরিত করতে চেয়েছেন।

ত্যাগের বিভূতি পরে পরিচালিত হয়েছে স্বাধীনতার যুদ্ধ। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব নিয়ে এলেন ভোগের অরাজকতা। যার যা খুসী করতে পারে, আধুনিক হও। ফলে জাতীয় চরিত্র রচনা হল না। হল এক শংকর সভ্যতা—hybrid। একদিকে জওহরলালের ত্রিমূর্তি ভবনের বিলাস-জীবন, রাজপ্রাসাদ—অন্যদিকে পুতিগন্ধময় হরিজন বস্তী। একদিকে পাঁচতলা হোটেল—অন্যদিকে ফুটপাতে ডাস্টবীন থেকে খাদ্য সংগ্রহ।

গতানুগতিকতার পথিক নেতৃবৃন্দ রচনা করলেন এক Character বিবর্জিত জাতি। যার অনিবার্য ফলশ্রুতি বর্তমান ভারতবর্ষ। কেবল যুবকদের সমালোচনা করায় কী লাভ? ওরাও জওহরলালকে অনুকরণ করছে তাদের সীমিত পরিবেশে।

পরাধীন ভারতবর্ষ পরিচ্ছন্ন ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নীতিকে আশ্রয় করে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যিক শক্তির সঙ্গে লড়াই করে আপনার বিশিষ্ট ধারা তুলে ধরেছিল। সারা বিশ্বজগৎ অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছে আমাদের রণ-

কৌশল। রোমা রোঁলা, আইনষ্টাইন, রাসেল, অলডুস হাক্সলী প্রভৃতি চিন্তা-নায়করা ওই ধারাকে তুলে ধরেছিলেন হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর সামনে, নতুন পথের ইশারা দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী দর্শনের ভেতর। কিন্তু বিশ্বের দুয়ারে ভারতবর্ষের আজ কোন বাণী নেই—নেই কোন চিরন্তন অবদান—নিজস্ব ধারা হারিয়েছে এক বিষম মরুপথে।